প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৮ বৈশাখ ২৯

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : শিবনাথ পাল । প্রিণ্টেক
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশকের নিবেদন

পুরনো লেখা পরিমার্জনা না-ক'রে ছাপানোয় অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুবের আপত্তি ছিল। আবার অভাবও ছিল অতটা অবকাশের। কোনো-কোনো অনুরাগীর উপরোধে 'পথের শেষ কোথায়' বইতে কয়েকটি পুরনো রচনা পুনর্মুদ্রণে সম্মতি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরও অনেক লেখা র'য়ে গিয়েছিল, ক্রমেই যেগুলোর গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বেড়ে যাচ্ছে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। এমনই কিছু রচনা আর তিনটি নতুন প্রবন্ধ নিয়ে সংগ্রথিত হ'ল এই বই।

অধ্যাপিকা গৌরী আইয়ুব এবং অধ্যাপক স্বপন মজুমদারের সাহায্য না-পেলে এই বই আমরা প্রকাশ করতে পারতাম না। "পরিশিষ্টে"র আলোচনাটি মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ার জন্য অধ্যাপক বিকাশ চক্রবর্তীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

সূচি

কবিতা ও প্রেম

প্রাচীন গ্রীকদের অনুকারবাদ পরবর্তী গ্রীক দার্শনিকরাই মেনে নিতে পারেননি, কারণ তাঁরা লক্ষ করলেন যে শিল্পী নকল করলেও তাতে কিছু বদল ঘটান, প্রকৃতির নিখুঁত প্রতিকৃতি অসাধ্য বলে নয়, বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য চোখের সামনে রেখেই তাঁরা তাঁদের রূপায়িত প্রতিবিম্বকে বিম্বের অবিকল অনুবর্তী করতে অনিচ্ছুক। অনুকৃত মানবিক বা প্রাকৃতিক বিষয় যথেষ্ট সুন্দর নয়, সেইজন্য কি তার রূপায়ণে যোজন-বর্জন উনোক্তি-অত্যুক্তি করেন শিল্পী—যাতে তাঁর সৃষ্টি ভগবানের সৃষ্টিকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে মনোহারিতায়? কিন্তু উদ্দেশ্য যদি তাই হয় তবে কোনো-কিছুর অনুকরণ বা অনুরূপায়ণ নিতান্তই অনাবশ্যক; এমন-সব রঙ রেখা ও ধ্বনির সন্নিপাত তো শিল্পী ঘটাতেই পারেন যা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, বাহ্য কোনো বিষয় নির্দেশ না-করে, গভীর কোনো অর্থ উদ্‌ঘাটন না-করে, আপন উপরিতলের লালিত্যেই রসিকচিত্তকে মুগ্ধ করবে। ডেকরেটিভ আর্ট অবশ্য আর্টের পর্যায়েই পড়ে—যদিও নিম্নতম পর্যায়। কিন্তু আর্ট মাত্রকেই ডেকরেটিভ আর্টের সঙ্গে এক করে যাঁরা বলেন কাব্যংগ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ, তাঁদের অভাব ঘটেনি কোনো যুগে। অতুল গুপ্তের ভাষায় কাব্যবিচারে এঁরা দেহাত্মবাদী। মালার্মের বহু-উদ্ধৃত বাক্যটিতেও—**poetry is written with words, not ideas**—এই নান্দনিক দেহাত্মবাদের প্রতি পক্ষপাত আছে বলে মনে হতে পারে; কিন্তু মালার্মে আসলে ছিলেন সংগীতের সঙ্গে কাব্যের সমীকরণে বিশ্বাসী। এবং সংগীতে কোনো অর্থযুক্ত শব্দের ব্যবহার না-থাকলেও তার ধ্বনিপারম্পর্য কেবল শ্রুতিমধুর নয়, অর্থব্যঞ্জনাঘন। এলিয়ট একসময়ে বলেছিলেন যে, কাব্য-সমালোচনার গোড়ার কথা হলো: **poetry is excellent words in excellent arrangement and excellent metre**—যেন এই ললিত পদবিন্যাসের কোনো অর্থ না-থাকলেই ভালো হতো! হালের অনেক কবি যে অর্থপ্রকাশের চেয়ে অর্থগোপনেই অধিকতর পটু তা কে অস্বীকার করবে? এলিয়ট অবশ্য বলেছেন যে, কবিতার অর্থ একেবারে অবলুপ্ত না-করে বরং অল্পাধিক রেখে দেওয়াই বিধেয়, সেটা পাঠকের সামনে ফেলে দিয়ে তার মনকে ব্যাপৃত রেখে কবিতা আপন কাজে এগিয়ে যেতে পারে—অনেকটা যেমন

সিঁধকাটা চোর গৃহপালিত কুকুরের সামনে এক টুকরো মাংস ফেলে তার অভিসন্ধি পূর্ণ করে। কিন্তু পাঠকের মননশীলতাকে ভুলিয়ে কবিরা যে সহৃদয়ের হৃদয়কক্ষে সিঁধ কেটে ঢুকে পড়েন, সেটাকেও একপ্রকারের অর্থদ্যোতনা বললে 'অর্থ' শব্দের অভিধার উপর কি খুব বেশি জুলুম করা হয়? অর্থাৎ কবিতার কোনো সুনির্দিষ্ট আভিধানিক অর্থ থাক বা না-থাক, অন্য এক গূঢ়তর অর্থ বহন করবার শক্তি তার আছে যার জোরে সে বিশ্লেষণী মনের পাহারা এড়িয়ে হৃদয়ান্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার পায়। আমাদের দেশের আলংকারিকরা কাব্যের দুই প্রকার অর্থের কথা বলেছেন—এক তার বাচ্যার্থ, এলিয়টের mince-meat; অন্যটা তার ব্যঙ্গার্থ, তাঁদের পরিভাষায় যার নাম ধ্বনি। রসবাদীদের মতে এই অর্থদ্বৈধের মধ্যে প্রভেদ মৌলিক—এত মৌলিক যে প্রথমটিকে লৌকিক ও দ্বিতীয়টিকে অলৌকিক আখ্যা দিতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করেননি। কবিতার এই অলৌকিক ব্যঙ্গার্থ কী?

পশ্চিমী নন্দনশাস্ত্রকারদের মধ্যে রুসোই বোধ করি প্রথম যিনি কাব্যের রহস্য খুঁজলেন বহির্জগতে নয়, অন্তরের অন্তস্তলে, অসংকোচে ঘোষণা করলেন কবিতা প্রধানত কবির হৃদয়াবেগেরই বাহন। কিন্তু বিলাপও তো শোকার্তের অনুভূতি ব্যক্ত করে এবং শ্রোতার চিত্তে করুণা জাগায়; অথচ শোকের কান্নাকে শোকের কাব্য বলে অতি বড়ো মূর্খও ভুল করবে না। শিল্পের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে আমরা তলস্তয়ের শরণ নিয়ে বলতে পারি যে, শিল্পরচনা হচ্ছে অনুভূতির সংক্রামণ অর্থাৎ সেই প্রকাশ যা শ্রোতার চিত্তে অনুরূপ ভাব জাগায়, ভিন্ন জাতীয় কোনো আবেগের উদ্রেক করে না। শোকের কাব্যকে যদি বলি দুঃখের প্রকাশ, শোকার্তের বিলাপ হবে দুঃখের প্রদর্শন। আরো এবং গুরুতর পার্থক্য এই যে, শিল্পী যা প্রকাশ করেন তা কোনো দিনানুদৈনিক অনুভূতি নয়, কারণ—উদাহরণত, শোকের বিক্ষোভ, বিলোড়ন, প্রাবল্য, চাঞ্চল্য, ক্রিয়াকারিত্ব, তার মধ্যে কিছুই নেই; যত বিপুল, যত গভীর শোকই হোক, কাব্যে তার রূপটি বড়ো শান্ত, বড়ো স্নিগ্ধ-মধুর। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছিলেন: Poetry is emotion recollected in tranquillity। ট্র্যাঙ্কুইল্‌ তো বটেই, কিন্তু মনে-পড়ে-যাওয়ার সুদূরতা, বিগততা কিংবা আবছায়া ভাব তো কাব্যাধেয় নয়, কাব্যে যা প্রকট তা একান্তই উপস্থিত, স্ব-ক্ষেত্রে স্ব-ভাবে খুবই উজ্জ্বল। অথচ হৃদয়াবেগের পর্যায়ে তাকে ফেলা যায় না, প্রাত্যহিক জীবনের চেতনাপ্রবাহে তার দোসর খুঁজে মেলা ভার। আলংকারিকেরা মনে করতেন যে, আমাদের হৃদয়ে যে মূল ভাবগুলি রয়েছে কবিকর্মে তার বিশেষ এক রূপান্তর সাধিত হয়ে তারা পরিণত হয় রসে। আটপৌরে জীবনের ভাবগুলি যখন কোনো

ব্যক্তির হৃদয়কে বিক্ষুব্ধ করে তোলে তখন অত্যন্ত নির্ভুলভাবে সেগুলি তারই। কাব্যের রস তাদের তুলনায় অনেক বেশি নৈর্ব্যক্তিক ও সাধারণীকৃত; 'আমার বলে মনে হয় অথচ ঠিক যেন আমার নয়, পরের কিন্তু সম্পূর্ণ পরের-ও তাকে বলা যায় না।' (সাহিত্যদর্পণ।) ব্যবহারিক জীবনের অনুভূতি যখন কাব্যবর্ণিত রসে পরিণত হয় তখন আমরা সেই অনুভূতিগুলির দ্বারা অভিভূত না হয়ে যেন কোনো এক ঊর্ধ্বস্তর থেকে তাদের ধ্যানস্নিগ্ধ রূপ অবলোকন করি প্রশান্ত সমাহিতির মধ্যে—উপনিষদ-কথিত সেই পরমসাক্ষীর ন্যায়ই যিনি শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ মনসো মনঃ। If in real life we had to endure all those emotions through which we live in Sophocles' Oedipus or in Shakespeare's King Lear we should scarecly survive the shock and strain. But art turns all these pains and outrages, these cruelties and atrocities, into a means of self-liberation, thus giving us an inner freedom which can not be attained in any other way. (Cassirer, ***An Essay on Man***, p. 149.) তাই তো আলংকারিকেরা রসলোককে বলেছেন অলৌকিক, রসাস্বাদকে মনে করতেন পরব্রহ্মস্বাদসচিবঃ। ধ্বনিবাদের মূল বক্তব্যকে একটিমাত্র সমাসবদ্ধ পদে সন্নিবদ্ধ করে গেছেন অভিনবগুপ্ত, বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায়—রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্বিতের আস্বাদনরূপ একটি ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথও এই কথারই প্রতিধ্বনি করে এক জায়গায় বলেছেন, 'রসমাত্রেই, অর্থাৎ সকলরকম হৃদয়বোধেই আমরা বিশেষভাবে আপনাকেই জানি, সেই জানাতেই বিশেষ আনন্দ।' (সাহিত্যের পথে, পৃ. ৫০।)

কিন্তু আমাদের সম্বিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাশ্রয়ী ব্যাপার নয়। মার্কস-এঙ্গেলসের ভাষায় তাকে জড়জগতের মুকুর-বিম্ব বলা অবশ্য সোঽহংবাদেরই উল্টোপিঠ এবং ভ্রান্তিবিলাসে দুই-ই তুল্যমূল্য। তবু এ-কথা তো মানতেই হবে যে আমাদের চিন্ময় সত্তার প্রত্যেকটি ব্যাপার—তা সে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই হোক, আর এষণা-বাসনা বা সুখ-দুঃখবোধই হোক—সমস্তই আপনাকে ছাড়িয়ে বাইরের কোনো বিষয়, জড়বস্তু কিংবা নির্বস্তুক তত্ত্ব, প্রিয়ার মুখ কিংবা পরমেশ্বরের চরণের দিকে নির্দেশ বহন করে থাকে। সম্বিত বিষয়ীধর্মী, তার মানে কোনো-না-কোনো বিষয়-সাপেক্ষ তার সত্তা। উদাহরণত, দুঃখ বলে কোনো স্ব-তন্ত্র মনোব্যাপার নেই, সন্তানের মৃত্যু-সংবাদের শ্রুতি-প্রত্যক্ষচেতনার একটি বিশেষ বর্ণপ্রলেপকেই দুঃখ বলা হয়; তেমনি সুখ হচ্ছে প্রিয়তমার প্রসন্নবদনোপলব্ধির একটি দীপ্তিচ্ছটা।

সুতরাং কাব্যকে হৃদয়াবেগের প্রকাশ বলে ক্ষান্ত হলে চলবে না, সে-আবেগ যে বিষয় থেকে সঞ্জাত, যে-পরিস্থিতির উপর আশ্রিত, তার কথাও সঙ্গে-সঙ্গে এসে পড়ে।

এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, যে-বিষয়কে লক্ষ করে আমাদের হৃদয়াবেগ দানা বাঁধে, সে-বিষয় মনগড়াও তো হতে পারে, বাস্তব জগতে তার কোনো স্থান থাকতেই হবে এমন কী কথা আছে? এটা সম্ভব, এবং রূপকথা, ছেলেভুলানো ছড়া, ননসেন্স ভার্স প্রভৃতির রস এমনিতর রসিকচিত্ত-বিশ্রান্ত, বহির্জগতের কোনো অর্থব্যঞ্জনা না-থাকলেও তার লাঘব ঘটে না। লাঘব ঘটে না, কারণ শিল্পের মূল্যায়নে ওজন তার হালকাই। কিন্তু কোনো গুরুভার রসঘন কলাসৃষ্টিকে বহির্বিশ্ব থেকে এমন সম্পর্ক ছিন্ন করে চিত্তৈকধর্মীরূপে ভাবা যায় না। স্বয়ং অভিনবগুপ্তও শেষ পর্যন্ত তা ভাবতে পারেননি। 'অভিনবগুপ্ত যদিও কাব্যের একান্ত তাৎপর্য রসের মধ্যেই ইহা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন তথাপি এই রসের মধ্য দিয়া সমগ্র বিশ্বের যে একটি অন্তর্দৃষ্টি ফুটিয়া ওঠে এবং কবি যে তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্বভুবনের সত্যকে নিত্যনবোন্মেষিণী বুদ্ধি দ্বারা রসসিক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির ন্যায় চরমানন্দ লাভ করেন, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন।' (সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কাব্যবিচার, পৃ. ১৩৪।) পাশ্চত্য কলাকৈবল্য-বাদীদের (art-for-art-sakist) মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন চিত্রসমালোচক ক্লাইভ বেল এবং কাব্যবিচারক ব্র্যাডলী। বেল প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন শিল্পের— অন্তত দৃশ্যশিল্পের—তাৎপর্যকে একান্তভাবে শিল্পবস্তুর মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে, জীবনের এবং চিত্র-বহির্ভূত সমগ্র বস্তুজগতের স্থূলহস্তাবলেপন থেকে সযত্নে রক্ষা করে তার রঙ ও রেখার একটি বিশেষ সংযোজনাকেই চরম জ্ঞান করতে—যার নাম দিয়েছেন তিনি **significant form**। 'সিগনিফিক্যান্ট' শব্দটা একটু গোল বাধায়, কারণ তার মধ্যে ব্যঞ্জক ও ব্যঞ্জিতের দ্বৈত বর্তমান। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কিসের ব্যঞ্জনায় শিল্পরূপ সার্থকতার পর্যায়ে উন্নীত হয়? 'রঙ ও রেখার কোনো-কোনো বিন্যাস আমাদের মনকে এমন গভীরভাবে নাড়া দেয় কেন—আমি নিজেকে এই প্রশ্ন করেছি। তার উত্তর হয়তো এই যে সার্থক শিল্পীরা রঙ ও রেখার বিশেষ সন্নিপাতে পরমসত্তারই অনুভব জাগাতে পারেন আমাদের মনে। জানি না এ-উত্তর গ্রাহ্য কিনা, যদি হয় তবে বুঝতে হবে যে সিগনিফিক্যান্ট ফর্ম-এর অর্থ সেই ফর্ম যার অন্তরালে আমরা পরমসত্তার আভাস দেখতে পাই।' (ক্লাইভ বেল, হোয়াট ইজ আর্ট, পৃ. ৫৪।) এবং শেষ পর্যন্ত ক্লাইভ বেল নিজের এই প্রস্তাবে সায় না-দিয়ে পারেননি। ব্র্যাডলীও কাব্যেতর কোনো মূল্যের ছোঁয়াচ যাতে কাব্যে না-লাগে

সেজন্য একান্ত তৎপর। স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করেছেন সেইসব মতবাদের যাতে কবিতাকে ধর্মনীতি প্রচারের কিংবা দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশের বাহনরূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। অথচ উপসংহারে তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে উত্তম কাব্যের গভীরতম তাৎপর্য কোনো গহ্বরেষ্ঠ মহাসত্যের দিকে নিয়ে যায় রসিকচিত্তকে।

About the best poetry, and not only the best, there floats an atmosphere of infinite suggestion. Its meaning seems to beckon away beyond itself, or rather to expand into something boundless which is only focussed in it ; something also, which we feel would satisfy not only the imagination but also the whole of us... Poetry has in this suggestion, this 'meaning', a great part of its value. (*Oxford Lecture on Poetry*, p. 26.)

শিল্পীর হৃদয়ান্তঃপুরের অলিগলি ঘুরে আবার আমাদের আসতে হলো সেই বাইরের জগতেই। প্রত্যাবর্তনের পথটা কিন্তু বৃত্তাকার নয় স্পাইর‍্যাল, কারণ শিল্পীর কাজ বহির্জগতের অনুকরণ এই প্রাচীন গ্রীক মতবাদে আমরা ফিরে আসছি না অবশ্য। বহির্জগতের উপরিতলবর্তী বাস্তবতার রূপায়ণ নয়, তার কোনো গভীর গুহাহিত সাধনদুর্লভ সত্যকে আমাদের হ্লাদৈকময়ী ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়ে তোলেন শিল্পী। হেগেল মনে করতেন যে বিশ্বসত্তার যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে এক পরমতত্ত্ব, সব ক্ষুদ্র খণ্ডিত সত্যের বিচ্ছেদ ও দ্বন্দ্ব যেখানে ঘুচে গিয়ে পরিপূর্ণ সাযুজ্য—কাজেই পরিপূর্ণ বাস্তবতা—লাভ করেছে। এই পারমার্থিক পারমাত্মিক সত্তার (Absolute Spirit) পূর্ণ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন দার্শনিকেরই সাধ্য ; আর্টের পক্ষে তার আংশিক আভাসটুকু দেওয়াই সম্ভব। তাই তিনি রসোপলব্ধিকে পরাবিদ্যার প্রাথমিক ও অধস্তন স্তরমাত্র বলতে কুণ্ঠিত হননি। শিল্পসৃষ্টির একটি বৈশিষ্ট্যের কথা অবশ্য তিনি উল্লেখ করেছিলেন ; দার্শনিক যেখানে পরমসত্তাকে মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা একটি মহাতত্ত্বরূপেই উপলব্ধি করতে প্রয়াস পান, শিল্পী সেখানে তাকে রূপে রঙে রেখায় ধ্বনিতে মূর্ত ও প্রাণস্পন্দিত করে তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ স্থাপন করতে সক্ষম হন। প্রতীয়মান ও বাস্তবসত্তার প্রভেদ মার্ক্স্‌-ও স্বীকার করেছিলেন ; এবং তাঁর মতে সত্তাভাসের উপরিতল থেকে তার অন্তর্নিহিত বাস্তবিকতায় পৌঁছবার প্রকৃষ্ট বাহন ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌, সেই সত্তার যথার্থ স্বরূপ আমরা জানতে পারি মার্ক্সীয় বিজ্ঞানে, দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক জড়বাদে। কিন্তু আর্ট-ও সেই একই বাস্তবসত্তাকে তার নিজস্ব মাধ্যমে প্রতিফলিত করে সহৃদয়ের কাছে

উপস্থাপিত করে। হেগেল ও মার্কস্ উভয়ের ফলিত বিষয়েও ভেদ রয়েছে। অর্থাৎ দুয়ের পার্থক্য কেবল আধারগত নয়, অথবা আধারগত পার্থক্য আছে বলেই, তাদের আধেয়-ও এক নয়। বৈজ্ঞানিক সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন নিজের ব্যক্তি-পুরুষকে, নিজের ভাবনাবেদনা, ভালোলাগা মন্দলাগাকে তাঁর সত্যান্বেষণ থেকে সরিয়ে রাখতে, তিনি সন্ধান করেন এমন বস্তুসত্তা যা বিষয়ধর্মী, সুতরাং বিষয়ীর অনুভব সাপেক্ষিক নয়, অভিজ্ঞেয় কিন্তু অভিজ্ঞতা-নির্ভর নয়। পক্ষান্তরে, শিল্পীর জগৎ তাঁর হৃদয়ানুরঞ্জিত, তাঁর আনন্দ-বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষার স্পর্শে পরিস্পন্দিত, তাঁর অন্তর্লোকের সঙ্গে তাঁর বহির্বিশ্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, দ্বৈতাদ্বৈত। কবির ভাষায় বলব, 'মানুষ সমস্ত জগৎকে হৃদয়রসের যোগে আপন মানবিকতায় অধিকার করছে—তার সাহিত্য ঘটছে সর্বত্রই। মানুষেরা সর্বমেবাবিশন্তি।' এটা ঠিক যে বিজ্ঞানও চায় মিথ্যার আবরণ ছিন্ন করে সত্যকে পেতে, শিল্পীর সাধনাও তাই ; উভয়ই প্রতীয়মান বস্তু থেকে বাস্তবসত্তার দিকে অভিযাত্রী। কিন্তু এঁদের সাধনার মার্গ এতই বিভিন্ন, দিক্‌নির্ণয়ের যন্ত্রপাতি, সত্যনিরূপণের প্রতিমান এমনি বি-সদৃশ যে শেষ পর্যন্ত তাঁরা একই সত্যে গিয়ে পৌঁছান এ-কথা কেবল গায়ের জোরেই বলা যায়, কোনো যুক্তি-প্রমাণের উপর তার ভিত্তি নেই। বিজ্ঞানের সত্য সার্বিক, নিরপেক্ষ এবং সেই কারণে নির্বস্তুক (abstract) ; শিল্পীর সত্য ততটা সার্বজনীনতার দাবি রাখে না, কিন্তু অধিকতর বাস্তবিক, কারণ তা অধিকতর মানবিক। অর্থাৎ আমি অনেকান্তবাদে বিশ্বাসী। অবশ্য এই অনেকান্ত সত্যগুলি সকল বিরোধ ও বিচ্ছেদের শেষে হয়তো কোনো এক মহাসত্যে গিয়ে মিলে যায়। কিন্তু সে তো ধর্মবিশ্বাসের কথা, যোগজ প্রত্যক্ষের ব্যাপার। আমাদের মুখে সে-কথা শোভা পায় না—কোনো ডায়ালেক্‌টিক্ জড়বাদীর মুখে তো নয়ই। কাব্যের রসাস্বাদে আমরা বিজ্ঞানের পরিমাণগত সত্যকে উপলব্ধি করি না, বিজ্ঞানের নিয়মতন্ত্রজালে কাব্যের পরিমাণ-বহির্ভূত সত্য ধরা দেয় না। এবং তৃতীয় কোনো নয়নের অধিকারী তো আমরা নই।

আজকের দিনে আমরা মানুষের বাইরে কোনো পরমতত্ত্ব বা চরমমূল্যের সন্ধান করতে একান্তই অনিচ্ছুক। পশ্চিমী চিত্তজাগরণের পর থেকে ইউরোপে এবং ফলত অন্যান্য দেশেও যেসব দার্শনিক মতবাদ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের চল হয়েছে—**Humanism, Positivism, Utilitarianism, Marxism, Pragmatism** প্রভৃতি—সর্বত্রই শোনা যায় মানুষের জয়জয়াকার, সমস্ত বিশ্বভুবনের মধ্যে একমাত্র মানুষকেই সর্বোচ্চ মূল্যের আধার বলে ঘোষণা। কিন্তু সে কোন্ মানুষ? চোখ

চাইলে চার দিকে এবং নিজেদের মধ্যে যে-মানুষকে দেখি তার চরণে তো আমাদের হৃদয়মনের অর্ঘ্যদান করতে পারি না। দেবত্ব তার মধ্যে আছে কিন্তু পশুত্বও রয়েছে সেই পরিমাণে বা ততোধিক, তার মহিমা অবশ্যস্বীকার্য কিন্তু তার বিবিধ প্রকারের ক্ষুদ্রতা ও নীচতার দিকেই বা চোখ বন্ধ করে থাকি কেমন করে? ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যুগযুগান্তের পটভূমিকায় বিচার করলে অবশ্য দেখা যায় মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্র থেকে মহতের দিকে, পাশব বৃত্তি থেকে ঐশী প্রেরণার একটি অনন্তযাত্রার পথ রেখান্বিত—যদিও সে-পথ সর্বত্র ঊর্ধ্বগ নয়, কোথাও কোথাও অধোগামী, কোথাও-বা গভীর অরণ্যে দিশাহারা। অর্থাৎ বিগত বা বর্তমান নয়, কোনো এক অনির্দিষ্ট দুর্নিরীক্ষ্য ভবিষ্যতের মানুষকেই আমরা পরম মূল্যের আধার বলে বন্দনা করছি। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা তো ভবিতব্যই জানেন, উপস্থিত মুহূর্তে তার চিন্তা অনেকাংশে কল্পনাবিলাস নয় কি? অথবা বর্তমান মানুষের মধ্যে সেই অনাগত পুরুষোত্তমের যে গাণিতিক সম্ভাবনামাত্র দেখতে পাচ্ছি তাতেই আমাদের সমস্ত শ্রেয়বোধের তৃপ্তিসাধন সম্ভবপর? তবে সন্দেহ হয় আমাদের ইদানীন্তন অত্যন্ত ব্যবহারিক ও বস্তুনিষ্ঠ মেজাজের সঙ্গে এই সংখ্যাগাণিতিক বিমূর্ত তত্ত্বের প্রতি এতখানি আস্থা বা উচ্ছ্বাস খাপ খাবে কি?

কিন্তু বর্তমান কালকে কালের অনন্ত ধারা থেকে, মানুষকে সৌরমণ্ডল এবং আরো বৃহত্তর যে নাক্ষত্রিক পরিমণ্ডলের সে বাসিন্দা তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার তো কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষের ইতিহাসে যে অশেষ দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের কথা জড়বাদী মার্কস্ এবং infinite progress and infinite perfectibility of man সম্পর্কে যে-কথা ভাববাদী ক্রোচে বলেছেন, তা জড়-প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের আওতায়েই ঘটিত ও ঘটিতব্য। পদার্থবিজ্ঞান যতই বলুক যে প্রাকৃত জগতের সার্বিক গতি বিশৃঙ্খলার দিকে, তাপমৃত্যু নামক জাগতিক অবক্ষয়ের অভিমুখে, এবং প্রাণীলোকের ও মানবেতিহাসের বিবর্তন একটি অপ্রকাশিত আপতিক ঘটনা (chance event), ভৌতিক নিয়মের ব্যতিক্রম এমনকি প্রতিক্রম, তবু থার্মোডাইনামিক্সের এই সিদ্ধান্তকে আমিও এডিংটনের অনুগামী হয়ে বৈজ্ঞানিক গোঁজামিল ছাড়া আর-কিছু ভাবতে পারি না। এ-প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক না হলেও অসংগত হবে। কৌতূহলী পাঠক এডিংটন প্রণীত 'নিউ পাথওয়েজ অব সায়েন্স' গ্রন্থ থেকে "দি এণ্ড অব দি ওয়ার্লড্"-শীর্ষক অধ্যায়টি পড়ে দেখতে পারেন।

মার্কস্‌বাদীদের মতো আমিও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটি ডায়লেক্‌টিক্ বিবর্তন-বর্ত্মের

অভিযাত্রী বলে জানি। তাঁদের সঙ্গে একমত হয়ে অবশ্য আমি মনে করি না যে এই বিশ্বাসের যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। হয়তো ভবিষ্যতের কোনো হোয়াইট্‌হেড্ বা কোনো সোভিয়েৎ মহাবিজ্ঞানী এমন এক নতুন পদার্থবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হবেন যার সিদ্ধান্ত বিশ্বপ্রগতির অনুকূলে যাবে; কিন্তু এখন পর্যন্ত উক্ত মতবিশ্বাসের সমর্থন খুঁজতে হয় দার্শনিক অনুসন্ধিৎসায়, বিশেষত মূল্যদর্শনের গবেষণায়—থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয়-বিধান-বিড়ম্বিত পদার্থবিজ্ঞানে নয়। মার্কসীয় দর্শনের অনুপ্রেরণায় সাম্প্রতিক পদার্থবিজ্ঞানের উল্টোমত গ্রহণ করতে আমি বাধ্য হয়েছি, তার কারণ এই বা এর কাছাকাছি কোনো মতবাদ ব্যতিরেকে আমাদের শাশ্বত মূল্যবোধের কোনোই দৃঢ় ভিত্তিভূমি আমি খুঁজে পাই না। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে বলব না, কিন্তু অন্য পথ হচ্ছে **logical positivist**-দের মতো শ্রেয় ও সুন্দরকে ব্যক্তিগত খামখেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়া; অথবা পূর্ববর্তী **naturalist**-দের মতো সমস্ত চরম মূল্যের ব্যাখ্যা খুঁজতে হয় আমাদের জৈব বৃত্তিগুলিরই সুপরিকল্পিত তৃপ্তিবিধানে।

মানুষ এমনি আশ্চর্য জীব যে যদিও সে জীবমাত্রের মতোই দেহ ও বংশরক্ষায় উদ্যোগী, তবু কেবল প্রাণধারণে তার তৃপ্তি নেই; বরঞ্চ তাতে সে গ্লানিই বোধ করে। এবং অন্তত আজকের দিনে জৈববৃত্তির পূর্ণতম চরিতার্থতাকেও সে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাথমিক স্তরমাত্র জ্ঞান করতে শিখেছে। বলা যেতে পারে যে জীবনের পূর্ণতা জৈববৃত্তির তর্পণে মেলে না, মেলে মানবিক বৃত্তির সার্থক বিকাশে। সে-কথা ঠিক এবং শিল্প, জ্ঞান, ব্যক্তিক ও সর্বমানবিক প্রেম—এগুলিকেই আমরা বিশিষ্টরূপে মানবিক বৃত্তির সার্থকতালাভের ক্ষেত্র বলে জানি। পূর্বোক্ত দুই প্রকার (জৈবনিক ও মানবিক) বৃত্তির মধ্যে একটি মৌল প্রভেদ লক্ষ করবার বিষয়। জৈববৃত্তি অন্ধভাবে নিজের তৃপ্তি অর্থাৎ বাধামুক্ত স্ফুরণ খোঁজে, কিসে তার তৃপ্তি, সে-বস্তুটির প্রকৃতিই বা কী, স্বকীয় মর্যাদাই বা কতখানি, এসবে তার কিছু যায় আসে না। মোটের উপর যা তাকে অধিকতর তৃপ্তি দেবে তার দিকেই তার অধিকতর টান। কিন্তু মানবিক বৃত্তিগুলির সার্থকতা আপনাতে আপনিই সম্পূর্ণ নয়, তার জন্য সে চায় নিজের বাইরে এমন কোনো সত্তার উপলব্ধি যা স্বকীয় মূল্যে ও মহিমায় সমৃদ্ধ বলে তার কাছে প্রতিভাত। জ্ঞেয় বিষয়ের, অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের, পরমমূল্য যদি আমরা মনে-মনে স্বীকার না-করি তবে শুদ্ধ জ্ঞানপিপাসার কোনো অর্থ খুঁজে পাই না। এ-কথার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নিশ্চয়ই নেই যে, ফলিতবিজ্ঞান আমাদের জ্ঞানান্বেষণের ক্ষুদ্র অঙ্গমাত্র। তেমনি শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা যে বহির্বিশ্বকে

উপলব্ধি করি তাও আমাদের কাছে অন্যপ্রকার (নান্দনিক বা **aesthetic**) পরম-মূল্যের দাবি নিয়ে আসে। এ-ক্ষেত্রেও পুনরুল্লেখ বাহুল্য যে, শিল্পসাহিত্যে আমরা—শিল্পী ও রসগ্রাহী—আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করি বটে, কিন্তু সে-অনুভূতি একটি নিরালম্ব নিজস্ব ব্যাপার নয়। বাস্তবপলায়নী দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদী কলাতত্ত্বের সবচেয়ে বড়ো অধিবক্তা ক্রোচে-ও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, **Feeling is not a particular content, but the whole universe sub specie intuitionis.** (*Essence of Aesthetics*, **p. 40.**)

মোটকথা, ঠিক 'মিরর-ইমেজ' না-বললেও আমি মার্কস্‌বাদীদের সঙ্গে একমত যে, দর্শন-বিজ্ঞান যেমন, শিল্প-সাহিত্যও তেমনি কোনো-না-কোনো বাস্তব সত্তারই উপলব্ধি থেকে সঞ্জাত। এবং তারই উপর ভিত্তি করে আমি বলতে চাই যে, শিল্প ও জ্ঞানকে আমরা জীবনে যে মহৎ মূল্য দিয়ে থাকি তার দ্বারা বাস্তবসত্তার প্রতিই আমাদের পরমমূল্য-বোধ অভিব্যক্ত হয়। বিজ্ঞান টেক্‌নলজির মারফৎ আমাদের উদ্‌বর্তনের সহায়তা করে—সেটা তার ব্যবহারিক মূল্য ; কিন্তু তার চরমমূল্য পাই যখন সে চরমমূল্যের আধার বিশ্বসত্তার সঙ্গে আমাদের পরিচয়সাধন করে। তেমনি সাহিত্য সমাজ-বিপ্লব ঘটাতে পারে, শ্রেণীহীন সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমাদের সাহায্য করতে পারে—সেটা তার ব্যবহারিক মূল্য। কিন্তু তার প্রকৃত সার্থকতা সেখানেই যেখানে সে মনের সঙ্গে বিশ্বের সাহিত্য ঘটায়, বিশ্বের যে পরম-মূল্যঘন রূপ নৈমিত্তিক জীবনের স্থূল দৃষ্টিতে অনুদ্‌ঘাটিত রসাভিষিক্ত চিত্তের সম্মুখে তার আবরণ উন্মোচন করে।

মার্কস্‌বাদী হয়তো বলবেন যে, জ্ঞানী এবং শিল্পী যে-বাস্তবসত্তাকে উপলব্ধি করে তাঁদের পরমমূল্য-বোধের সার্থকতা খোঁজেন তা সমাজ। অন্তত সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন কথাই তাঁরা বলে থাকেন। ব্যক্তিমানুষের সম্যক স্ফূরণ অবশ্য সমাজ-মুখিন এবং সমাজ-নির্ভর ; কিন্তু ব্যক্তির মনকে ছাড়িয়ে তো সমাজের মন বলে কিছু নেই, ব্যক্তিসমূহের সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দের অতিরিক্ত কোনো সামাজিক মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা আমরা ভাবতে পারি না। তাই মার্কস্‌বাদীকেও এ-কথা মানতে হবে—স্বয়ং মার্কস্ তো মানতেনই—যে ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তির জীবনে **values**-এর আবির্ভাব (মার্কসের ভাষায় **free development of each**) না-ঘটলে সমগ্র সমাজেও তা ঘটবে না। তাছাড়া আগেই বলেছি যে, মনুষ্যসমাজ বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, সমাজের মধ্যে যদি পরমমূল্যের উন্মেষ ঘটে থাকে তবে জাগতিক নিয়মেই ঘটেছে ; সর্বদেশকালে ব্যাপ্ত যে বৃহত্তর মূল্য সামাজিক মূল্য তারই একটি ঘনীভূত

প্রকাশ। এ-কথাও বলা হয়েছে যে ব্যক্তিই হোক আর সমাজই হোক, তার বর্তমান অস্তিত্বকে আমরা চরমমূল্যের আধার বলে গ্রহণ করতে পারি না, ভবিষ্যতের পূর্ণতর মূল্যবিকাশের সম্ভাবনারূপেই তার আজকের খণ্ডিত ও বিকৃত সত্তা আমাদের কাছে মূল্যবান। এবং ক্ষণকালের দৃষ্টিতে যা সম্ভাবনা মাত্র, মহাকালের দৃষ্টিতে তাই বাস্তব। মহাকাল (eternity) কথাটাকে ভাববাদী দর্শনের বাক্যচ্ছটা বলে উড়িয়ে দিলে আমরা আমাদের জীবনের একটি মহৎ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করব। মানুষের মন হচ্ছে সেই অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি যা একাধারে ক্ষণকালের তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ এবং শাশ্বত-কালের প্রশান্তিতে অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্। উপস্থিত মুহূর্ত ও মহাকালের এই দ্বন্দ্বময় সাযুজ্য দার্শনিক চিন্তায় কেবল নয়, সার্থক কাব্যানুভূতির মধ্যেও স্থান পেয়েছে।

At the still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless;
Neither from, nor towards; at the still point, there the dance is.
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity,
Where past and future are gathered.

(T. S. Eliot, *Four Quartets*, p. 9.)

মহাকালের এই স্থিতপ্রজ্ঞ দৃষ্টি কখনো চলতি কালের বহমান অভিজ্ঞতাকে খণ্ডিত করে না, তাকে পরিব্যাপ্তি ও পূর্ণতাই দান করে। যদি কোনো শঙ্করবেদান্তিন্ মহাকালের উপলব্ধিতে বিভোর হয়ে চলতি কালের জগৎকে মায়ার সৃষ্টি বলে উড়িয়ে দিয়ে কর্মসন্ন্যাস গ্রহণ করবার কথা বলেন, তবে তাঁর কথা তেমনি অগ্রাহ্য হবে যেমন সেইসব ক্ষণকালবাদীদের কথা যাঁরা ধ্যানী ও জ্ঞানীর প্রতি কটাক্ষ হেনে কেবল কর্মমার্গের উপস্থিত-কালনিবদ্ধ সাধনার মন্ত্রই জপে গেছেন: **philosophers have so far interpreted the world, the point is to change it**। চিরন্তনের দৃষ্টিতে জাগতিক পরমমূল্য যেমন পরিব্যক্ত, চলমানতার পর্যবেক্ষণে তেমনি তার মূল্যহানি, অপূর্ণতা ও অসিদ্ধি সুপ্রত্যক্ষ। কিন্তু কুৎসিতের মধ্যেও সুন্দরকে দেখা, অপূর্ণের মাঝখানেও পূর্ণতার ধ্যান, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অসিদ্ধির সম্মুখেও মহতের সাধনার দীপশিখাকে নিভতে না-দেওয়া—এই তো মহাশিল্পীর মৌল প্রেরণা। **We begin to live only when we have conceived life as a tragedy**—অন্তত কবির জীবনে ইয়েট্স্-এর উক্তি আক্ষরিক অর্থে সত্য। ট্র্যাজেডির মানে অবশ্য মূল্যের সার্বিক বিনাশ নয়; সাহিত্যে ও জীবনে যাঁরা সিনিক বিক্ষোভে জর্জরিত এবং যাঁরা ট্র্যাজিক উপলব্ধির দ্বারা পরিস্নিগ্ধ, তাঁদের মধ্যে পার্থক্য অপরিমেয়। যে-কবির চিত্ত পরমমূল্যের সাক্ষাৎচেতনায় সমুন্নীত

তাঁর চোখেই সে-মূল্যের আংশিক ও ক্ষণিক বিলোপ ট্র্যাজেডিরূপে দেখা দেয়। শেক্সপীয়রীয় নাটকের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে মিডল্‌টন্‌ মারী লিখেছেন: **when Shakespeare has pronounced that life 'is a tale told by an idiot, full of sound and fury signifying nothing', he is not left, as other men would be, naked to the cold wind of eternity.**

ব্যক্তিত্বের অনন্তবিকাশ, এবং শাশ্বত সত্য ও সুন্দরের উপলব্ধির সাধনায় ব্যক্তির আত্মোৎসর্গ এই দুয়ের মধ্যে যে-বিরোধ চোখে পড়ে সেটা উপরিতলের; অভিজ্ঞতার আরো গভীরে তলিয়ে দেখলে তাদের আশ্চর্য সংগতি অনুভব করা যায়। প্রেমিক যেমন নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই নিজেকে খুঁজে পায়, প্রেমাস্পদের ব্যক্তিসত্তার মূল্য যখন তার কাছে চরম এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ তখনই সে নিজের ব্যক্তিত্বের গভীরতম মূল্য সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে—এ-ও তেমনি। কবির সঙ্গে প্রেমিকের যে-সমীকরণের কথা শেক্সপীয়র বলে গেছেন তার সার্থকতা বোধ করি এখানেই। উভয়ের অভিজ্ঞতার মূলে আছে একটি দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্ক, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার বিস্ময়। কাব্যের অনুভূতি ও প্রেমের অনুভূতির মধ্যে খুব বড়ো একটি পার্থক্যের কথাও অবশ্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন: প্রেমের বেলা ঔচিত্যের (appropriateness) কোনো প্রশ্ন ওঠে না; অর্থাৎ কারো গভীরতম, পূর্ণতম ভালোবাসা যদি এমন একজন লোকের উপর ন্যস্ত হয় যাকে আমরা—ইতরে জনাঃ—গুণলেশহীন ও নানা দোষে দুষ্ট দেখি, তবু আমরা বলতে পারি না যে এমনটি হওয়া উচিত ছিল না, অথবা সে-ভালোবাসাকে নিছক ভ্রান্তি মনে করে তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখি না। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু ঔচিত্যের বিচার অনিবার্যতই এসে পড়ে। অধম কাব্যকে (ধরুন বটতলা-সাহিত্য আখ্যাপ্রাপ্ত কোনো রোমাঞ্চ নাট্যকে) উত্তম জ্ঞানে যদি কারো রসানুভূতি উদ্‌বেল হয়ে ওঠে তবে কি আমরা বলব না যে এই রসবোধ এখানে ভ্রান্ত ও অনুচিত, সুতরাং নিন্দনীয়? যে-কোনো সার্থক শিল্পসৃষ্টির রসগ্রহণ সম্পর্কে সার্বজনিনতার একটি অনুচ্চারিত দাবি থাকে শিল্পী ও রসিক চিত্তে; সে-দাবি প্রতিপন্ন করা যায় না, সর্বত্র স্বীকৃতও হয় না, তবু তার উপস্থিতি লক্ষণীয়। কিন্তু কোনো প্রেমিক—তার প্রিয়ার অপরিমেয় মূল্য সম্বন্ধে যত দ্বিধাহীন হোক তার নিজের মূল্যায়ন—মনের গোপন কোণেও এমন দাবি পোষণ করে না যে অন্যের মূল্যবিচারে তার সমর্থন পাওয়া যাবেই। তবে এর থেকে যদি এই অনুমান করা হয় যে কাব্যানুভূতি সর্বৈব বিষয়নিষ্ঠ, তার সত্যমিথ্যা একটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মতো সুস্পষ্ট

সীমারেখার দ্বারা বিভক্ত, এবং প্রেম নিতান্ত বিষয়ীগত ও ব্যক্তিগত ব্যাপার, অবাস্তব ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র, তার মধ্যে কোনো যাথার্থ্যের অঙ্গীকার নেই, তাহলে খুবই ভুল করা হবে। আগেই বলা হয়েছে যে, কবির জগৎ তার মনগড়া জগৎ নয় বটে, কিন্তু তা কবির ও সহৃদয়ের চিত্তনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বস্তুসত্তারূপে পরিগণ্যও নয়; বাইরের বিশ্ব ও মনের ভাবনা-বেদনা তাতে একাকার হয়ে মিশেছে। দার্শনিক পরিভাষায় তাকে বিষয়-বিষয়ীগত বলা যেতে পারে—যদিও এমন কোনো শাস্ত্রীয় প্রয়োগ আমার জানা নেই। আমার বিবেচনায় শিল্পবস্তুর আরো সমুপযুক্ত আখ্যা হবে শঙ্করবেদান্তের (ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত) 'সত্যানৃতেমিথুনীকৃত'। এই সত্য ও অনৃত অবশ্য দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক বিচারসম্মত, নইলে কাব্যানুভূতির স্বক্ষেত্রে কবিতাটি সম্পূর্ণই সত্য। প্রেমও এমনি একটি সত্যমিথ্যার জোড়া-মেলানো ব্যাপার।

প্রেমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একজন মার্কিন দার্শনিক লিখছেন, **Love may be defined as any activity which finds its end and value in the maintenance and increase of value in another mind. (Parker, *Human Values*, p. 177.)** সংজ্ঞাটিতে মার্কিনী কর্মপটু ও কর্মপ্রিয় মনের ছাপ খুবই স্পষ্ট; তা না-হলে প্রেমের একটি প্রধান দিক যে অক্রিয়, ধ্যানদৃষ্টি-নির্ভর **(contemplative)**, যাতে প্রেমাস্পদের জীবনে মূল্যের সংবর্ধন বা সংরক্ষণ নয়, তার ব্যক্তিত্বের স্বকীয় মূল্যকে উপলব্ধি ও সম্ভোগ করাই বড়ো কথা—সেদিকটা পার্কারের সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে যাবে কেন? কোনো বিষয়ের মূল্যকে মূল্যগ্রাহী চেতনার ব্যাপারমাত্র জ্ঞান করা আমার মতে ভুল; কিন্তু এ-কথাও অনস্বীকার্য যে, তথ্যবস্তুর মতো তা একান্তরূপে বিষয়গত নয়, বিষয়ে অবস্থান করলেও বিষয়ীর অনুভবসাপেক্ষ। অর্থাৎ মূল্য আছে অথচ কোনো চেতনায় তার উপলব্ধি ঘটেনি, কোনো রসিকচিত্ত তাকে আপন অনুভবে গ্রহণ করেনি, এমন ভাবা যায় না। ব্যক্তিস্বরূপের মূল্য কিন্তু সেই ব্যক্তিরই উপলব্ধির বিষয় হতে পারে না, তার সমস্ত মূল্যবোধ বহির্মুখী, অন্য বিষয়, ঘটনা বা ব্যক্তির দিকে নির্দেশিত। আপন ব্যক্তি-সত্তার মূল্য সম্পর্কে যে-ব্যক্তি আপনিই অবহিত ও রসাভিষিক্ত সে আত্মকেন্দ্রিক এবং অহংপূর্ণ হয়ে পড়ে, ফলে তার ব্যক্তিত্বের অবনতি, ব্যক্তিসত্তার মূল্যের অবক্ষয় অনিবার্য। যাকে আমরা বলি মানবপ্রেম বা সৌভ্রাত্রবোধ তাতে অন্য সকল ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি এবং মূল্যগ্রহণ আছে বটে, কিন্তু বিশেষ ব্যক্তির বিশিষ্ট ব্যক্তি-সত্তার যে-মূল্য, তার যথার্থ উপলব্ধি তাতে নেই। মানবপ্রেমের ভাবখানা অনেকটা এই: তুমি, অর্থাৎ যে-কোনো লোক, তোমার ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ যাই থাক,

তাতে আমার কাজ নেই, কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্ব-বিকাশে—যদি তা অন্যের ব্যক্তিত্ব-বিকাশকে অবরুদ্ধ না-করে—আমি সাধ্যমতো তোমার সহায়তা করব।

আমরা যে-ভাব ও এষণাকে প্রেম আখ্যা দিয়ে থাকি (মানবপ্রেমের প্রতি-তুলনায় যার নাম দেওয়া যেতে পারে ব্যক্তিগত প্রেম) তাতেই আছে কোনো বিশেষ একজন লোকের ব্যক্তিস্বরূপের বৈশিষ্ট্যের এবং তার স্বকীয় মূল্যের পূর্ণ উপলব্ধি ও রসাস্বাদন। 'যে-কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যাই হোক' ভাব নয়; অনন্য; অতুলনীয় :

তুমি যে তুমিই, ওগো
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।

প্রেমাস্পদের ব্যক্তিস্বরূপের অন্তর্নিহিত মূল্য ও তার বিকাশের বিশিষ্ট পথের অনুসন্ধানই আনন্দ।

প্রশ্ন উঠতে পারে প্রেমিক কি প্রেমাস্পদের ব্যক্তিসত্তার কোনো গভীরতর, অন্যের অগোচর অন্তঃস্বরূপ আবিষ্কার করে, না কি সমস্তই তার মোহমুগ্ধ মনের সৃষ্টি—'আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা'? আর্টে যেমন, প্রেমেও তেমনি, কতটুকু আমরা বাইরে থেকে পাই এবং কতখানি অন্তর থেকে জোগাই, তা নিয়ে বিতর্ক চলে না। কলিংউড আর্টের আলোচনায় যা বলেছেন প্রেমের ক্ষেত্রেও অবিকল তাই সত্য : The distinction between what we find and what we bring is altogether too naive. (*Principles of Art*, p. 150.) এখানে একটি গভীর দার্শনিক তত্ত্বকথা এসে পড়ে। অহম্ এবং ইদম্; আমার সত্তা এবং বহির্জগতের সত্তার মাঝখানে কোনো নিরপেক্ষ অপরিবর্তনীয় সীমারেখা টানা নেই। যাকে 'আমি' বলে চিহ্নিত করি তার সীমানা বিশেষ-বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সংকুচিত বা সম্প্রসারিত হতে থাকে। একজন নিষ্ঠাবান নিবেদিতপ্রাণ কমিউনিস্টের 'আমি' আমিত্বের অনেকগুলি বেড়া ভেঙে পার্টির বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। পারিবারিক স্নেহে মমতায় ও মর্যাদাবোধে আপ্লুত যে-চিত্ত তার তুলনায় একান্ত নিজের সুখ-দুঃখের ভাবনায় ভরা মনের আত্মচেতনা অধিকতর আকুঞ্চিত। প্রেমিকের 'আমি' তার প্রিয়াকে বাদ দিয়ে নয়। আবার সম্পূর্ণ অভিন্নও নয়। তার প্রেমের মধ্যে প্রেমাস্পদের সঙ্গে যেমন একাত্মবোধ তেমনি দ্বৈতবোধও পরিলক্ষ্য। স্পষ্টতই সে জানে যে যাকে সে তার হৃদয়ের পদ্মাসনে স্থান দিয়েছে সেই তুলনাহীনার ব্যক্তিসত্তা তার নিজের অপেক্ষা অনেক

সুন্দর ও সম্পূর্ণ, অত্যধিক মহৎ মূল্যের আধার। হয়তো সে ভাবে তার প্রিয়াই সব কিছু, সে কিছু নয়। কিন্তু কিছু নয় বোধ করবার জন্যও তো বোদ্ধার কিছু-একটা অস্তিত্ব এবং সে-অস্তিত্বের জ্ঞান থাকা চাই। আবার এ-ও ঠিক যে তার প্রিয়ার সুখেই তার সুখ, তার দুঃখেই তার দুঃখ, তার মানেই সে সম্মানিত। এই অদ্ভুত অবিশ্লেষণীয় দ্বৈতাদ্বৈত প্রেমানুভূতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই এখানে বিষয়-চেতনা ও বিষয়ী-চেতনা, দৃষ্টি ও সৃষ্টির মধ্যে ভেদজ্ঞান এমন মায়াবৎ। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মানবাত্মা সবচেয়ে আকুঞ্চিত, বিজ্ঞানের আলোচ্য একান্তই বহির্ভূত, অনাত্মীয়, নিরপেক্ষ জগৎ-ব্যাপার। কাব্যে ও প্রেমে মানবাত্মা সবচেয়ে উদ্‌বেলিত, এখানে অন্তর ও বাহিরের মধ্যবর্তী প্রাচীর ছায়ার মতো অলক্ষ্য ও সঞ্চলমান। নেই বলা যায় না, অথচ কোথায় সেটা নির্দেশ করাও কঠিন।

শিল্পবস্তু কেবল শিল্পীমনেরই প্রতিচ্ছায়া নয়—সমগ্র বিশ্বভুবনের একটি সত্যরূপ আমরা দেখতে পাই তাতে—পূর্ববর্তী আলোচনার এই সিদ্ধান্তটি সর্ববাদীসম্মত না-হলেও অনেকের কাছে অগ্রাহ্য হবে না বোধ করি। শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি বা বোধির অন্তত আংশিক সত্যতা যাঁরা মেনে নিতে প্রস্তুত তাঁরাও কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রেমিককে অনুরূপ সম্মানে বিভূষিত করতে অনিচ্ছুক। এই অনিচ্ছার মধ্যে একটু অবিচার কি প্রচ্ছন্ন নেই? আমরা নিজের প্রেম ও পরের প্রেমকে ঠিক একই চোখে দেখতে অভ্যস্ত নই। অন্যের প্রেম যখন বিচার্য তখনই আমরা প্রেমাস্পদের যে-রূপটি প্রেমিকের শারীর ও মনশ্চক্ষে উদ্‌ভাসিত, তাকে একজন মোহাবিষ্ট ব্যক্তির খামখেয়াল বা স্বপ্নরচনা বলে উড়িয়ে দিতে আগ্রহশীল। নিজের প্রেমের বেলা অনুরূপ বিচার ও সিদ্ধান্ত সম্ভব হয় না; যদি সম্ভব হয় তবে তা প্রেমের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকেই খানিকটা খণ্ডিত করবে। প্রিয়ার অত্যাশ্চর্য শরীর-মনের রূপ আপনারই মনের মাধুরী দিয়ে রচনা করেছেন আপনি, প্রকৃত প্রস্তাবে সে লক্ষজনের মধ্যে অতি সামান্য একজন, রূপে-গুণে তুচ্ছাতিতুচ্ছ তার সত্তা—এ-কথার শুধু মৌখিক নয়, আন্তরিক স্বীকৃতি আপনার ভালোবাসার মাত্রাগত এবং খুব সম্ভব গুণগত পরিবর্তন ঘটাবে বলেই আমার বিশ্বাস। এমনতরো মোহমুক্তির পর—যদি একে মোহমুক্তি বলতে চান—তাকে দিয়ে আপনার শারীরিক বাসনা তৃপ্ত হতে পারে, সাংসারিক প্রয়োজন মিটতে পারে, সে আপনার সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ও সচিব হতে পারে, কিন্তু তার প্রতি আপনার হৃদয়াবেগের ভাববিন্যাসে সেই স্বর্গীয় সুষমা আর থাকবে না যা ঐ-হৃদয়াবেগকে অন্য সকল অনুভূতি থেকে উন্নীত করে প্রেমের বিশিষ্টতা দান করে।

বলা বাহুল্য আমি সে জাতীয় কোনো মতবাদ আদৌ স্বীকার করি না যাতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দোহাই পেড়ে প্রেমের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাকে রিরংসা বা বলৈষণার (will to power) প্রকারভেদে পর্যবসিত করা হয়। প্রেমের সঙ্গে কোনো এক বা একাধিক জৈববৃত্তির সমীকরণ হয় অপবিজ্ঞান নয় অতিবিজ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞানীর পক্ষে অনধিকার চর্চা। এবং শেষ পর্যন্ত অন্তত নিজের প্রেমের ক্ষেত্রে এমন কোনো সর্বনাশা তত্ত্ববিলাসে আমাদের মন সায় দেয় না। তার মানে প্রেমিকের অন্তর্দৃষ্টির অন্তত আংশিক সত্যতা আমরা প্রকারান্তরে স্বীকার করে থাকি, সম্পূর্ণ প্রাতিভাসিক বলে তাকে উড়িয়ে দিতে পারি না; মেনে নিই যে প্রেম একাধারে অন্ধ এবং তৃতীয়নয়ন-বিশিষ্ট। কিন্তু এই পর্যন্ত। প্রেমাস্পদের সমস্ত দোষ সম্বন্ধে অন্ধতা, বা তার ব্যক্তিত্বে পৃথিবীর যাবতীয় মহৎ গুণের আরোপ প্রেমের পক্ষে কখনোই আবশ্যক নয়; বস্তুত সেটা প্রেমের নাবালকত্বই প্রমাণ করে। যা অত্যাবশ্যক তা এই যে, সব দোষ ত্রুটি অভাব ও বিকারের অন্তরালে প্রিয়ার রূপ ও ব্যক্তিস্বরূপের গভীর তলে এমন এক পূর্ণতার আবিষ্কার যা অনন্যভাবে তারই, যা অন্যের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও প্রেমিকের দৃষ্টিবিভ্রম নয়—বরঞ্চ একমাত্র তারই প্রেমপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির কাছে উদ্‌ঘাটিতব্য, যার হয়তো সবটা বর্তমান নয়, কতকাংশ ভবিষ্যতের ইঙ্গিতরূপে পরিলক্ষ্য—ভালোবাসার প্রদীপশিখাই যে ভাবী পূর্ণতার বিকাশের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তাকে। শিল্পীও তেমনি যখন তার ধ্যানদৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখেন তখন সুন্দরকেই দেখেন যদিও তাঁর আশপাশে মানুষে এবং প্রকৃতিতেও যা-কিছু কুৎসিত, গর্হিত ও নিন্দার্হ তাকে অস্বীকার করবার তাঁর প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ মহাকবি আমরা তাঁকেই বলি যাঁর অন্তরে ধ্বনিত হয়েছে—বেদাহমেতম্ পুরুষম্ মহান্তম্ আদিত্যবর্ণম্ তমসঃ পরস্তাৎ। শুধু পরস্তাৎ নয়, তমসার মাঝখানেও।

আর একদিক দিয়ে প্রেমিক শিল্পীর অথবা শিল্পী প্রেমিকের সগোত্র। আমরা যা-কিছু করি নিজের সুখের জন্য করি, আমাদের মহত্তম কর্মেরও চূড়ান্ত অভিপ্রায় আত্মতুষ্টি—এমন একটি চিত্তাকর্ষক মতবাদ গত শতাব্দীর শেষার্ধে পাশ্চাত্য চরিত্র-দর্শনে খুবই প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। দর্শন থেকে অনেক পরিমাণে বিচ্যুত হলেও এর প্রভাব দর্শনের পরিধি ছাপিয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের লেখায় এখনো বেশ লক্ষ করবার বিষয়। চারিত্রনীতির এই সুখবাদী অপব্যাখ্যায় কলাসৃষ্টির মতো অপেক্ষাকৃত শৌখীনতর কর্মও যে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কী। দুশো বছর আগে ড্রাইডেন যে-কথা বলেছিলেন—**Delight is the chief, if not the only,**

end of poetry—নানা কণ্ঠে আজও তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এঁদের পক্ষে স্বভাবতই একটি বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় রুদ্র বা করুণরসাত্মক সাহিত্য, ***King Lear, Crime and Punishment***, 'শ্যামা' প্রভৃতির মূল্যায়ন। এ-সব রচনাপাঠে আমাদের চিত্ত পুলকিত হয় এমন কথা মোটেই বলা যায় না, অথচ সর্বসম্মতিক্রমে কাব্যের মূল্যবিচারে তাঁদের স্থান খুবই উঁচু পর্যায়ে। অগত্যা এঁরা স্বীকার করেন যে পুলক-সঞ্চারিতা নয়, মহাকাব্যের আছে হ্লাদিনী শক্তি; এবং এই হ্লাদ বা রসানন্দ ও অন্য জাতীয় সুখের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানতে বাধ্য হন। আমার বিবেচনায় সোজাসুজি বলাই ভালো রসের অনুভূতির জাত আলাদা, সুখদুঃখের ভাবগ্রামে তার স্থান নেই। প্রেম সম্বন্ধেও কি ঠিক তাই সত্য নয়? প্রেমিকমাত্রেই জানেন প্রেমের আঘাতের মধ্যেও তীব্র আনন্দ এবং আনন্দের মধ্যেও মর্মান্তিক বেদনা ওতপ্রোতভাবে জড়ানো রয়েছে। প্রেমানুভূতিও প্রকৃত-পক্ষে সুখদুঃখ হর্ষবিষাদাদির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য বা বোধগম্য নয়, অন্য পর্যায়ের অনুভূতি সে। তাই তো প্রেমের বর্ণালীকে সঠিক বর্ণনা করবার ভাষা খুঁজে পাই না আমরা, মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর পরিভাষাও তার উপলব্ধ ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতে গিয়ে দিশা হারায়। কোনো অবুঝ সখীর কৌতূহলী প্রশ্ন যদি নিতান্তই নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে তবে এ ছাড়া কীই-বা বলবার থাকে:

সখী, কী পুছসি অনুভব মোয়।
সেই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।

সমালোচনার উত্তর*

এ-সংকলনের ('পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা'র) কাব্য-নির্বাচন শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বসুর কাছে 'সুরুচির পরিচায়ক' এবং 'মোটের ওপর প্রশংসনীয়' মনে হয়েছে—এটা সংকলনের সৌভাগ্য, সংকলনকর্তারও। ছটি কবিতা সম্পর্কে অবশ্য তিনি আপত্তি জানিয়েছেন। সবচেয়ে 'বড়ো আপত্তি' রবীন্দ্রনাথের "ভক্ত" নামক কবিতার নির্বাচনে, কারণ এর বিষয়বস্তু প্রেম নয় এবং 'প্রেম বলতে জগতের অধিকসংখ্যক মানুষ বুঝেছেন নরনারীর যৌন আকর্ষণ'। বসুমহাশয়ের এই পরিসংখ্যান যদি যথার্থ হয় তা হলে আমি জগতের সংখ্যান্যূন দলে পড়ি। কিন্তু এ-সম্পর্কে পাঠককে কোনো নোটিস দিইনি, তাঁর এ-অভিযোগ অহেতুক। ভূমিকার দ্বিতীয় অংশে সাত পৃষ্ঠা জুড়ে যা লিখলাম সেটা ঠিক এই জাতীয় নোটিস—এমন-কি নোটিসের বাড়াবাড়ি নয় কি? প্রেম বলতে আমি বুঝি উপলব্ধি, আবেগ ও এষণার একটি বিশেষ প্যাটার্ন যার প্রকৃতি আমার প্রবন্ধে বোঝাবার কিছু চেষ্টা করেছি, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এবং ঠিকমতো যা বোঝানো অসম্ভব। এসব বিষয়ে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে অভিজ্ঞতার সমতা না-থাকলে বক্তব্য ধোঁয়াটে ঠেকবেই। এই হৃদয়াবেগটি সাধারণত নরনারীর যৌন আকর্ষণ থেকে সঞ্জাত হলেও সেই আকর্ষণের পরিধি ছেড়ে চলে যায় অনেক দূরে। বসুমহাশয় নিজেই তাঁর পূর্বোদ্ধৃত স্ট্যাটিস্টিক্যাল সংজ্ঞাটিকে প্রায় উল্‌টে দিয়ে অন্যত্র লিখছেন, 'যৌনলিপ্সার কারাগার থেকে মুক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসকেই বলে প্রেম নামক সভ্য চিত্তবৃত্তি'। তিনি মানবেন কিনা জানি না যে এই সভ্য চিত্তবৃত্তির বিকাশ এমন-সব ক্ষেত্রেও দেখা যায় যেখানে আদৌ কোনো যৌন আকর্ষণ নেই, থাকার হেতুও অবর্তমান। ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুভূতিকে অবিকল নারীর প্রতি পুরুষের কিংবা পুরুষের প্রতি নারীর অনুভূতির রূপকল্পে ভাবা হয়েছে সব দেশেই—আমাদের দেশে বোধ করি

* 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' অমলেন্দু বসু সমালোচনা করেন 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায়, ১৩৬৩ মাঘ সংখ্যায়। নিবন্ধটি পরে সংকলিত হয় লেখকের 'সাহিত্যচিন্তা' গ্রন্থে (কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ১৩৭৯, পৃ. ১৮৯-৯৮)। সেই সমালোচনারই উত্তর এই প্রবন্ধ।

সবচেয়ে বেশি। শুধু-যে অন্যেরা ভেবেছেন তা নয়, ভক্ত নিজেই ভগবানকে প্রিয়া বা প্রণয়ীরূপে উপলব্ধি করেন, অনুভব করেন। কোনো-এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি বিদ্যাপতির 'হরি হে হমর দুখ ক নহি ওর' গীতিকবিতাটিকে ভক্তিকাব্যের নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছিলাম। বাংলাসাহিত্য বিভাগের একজন কৃতী ছাত্র আপত্তি জানালেন যে ওটি প্রেমের কবিতা, ভক্তির নয়। পাঠক কি নিশ্চয় করে বলতে পারেন কবিতাটি ভক্তিরসের না আদিরসের? শুনেছি রবীন্দ্রনাথ এই গানে স্থর দেবার সময় 'কামদারুণ' কথাটাকে পাল্‌টে 'বিরহদারুণ' করেছিলেন। আমার বিশ্বাস তাতে এর ভাবৈশ্বর্য খানিকটা খর্ব হলো।

শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।—

ভক্তিকাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, প্রেমকাব্যেরও,—কারণ ভক্তির ভাববিন্যাসকে এখানে প্রেমের ভাববিন্যাসের ছকে ফেলা হয়েছে। এমন-একটি কবিতা আলোচ্য সংকলনে অনায়াসে স্থান পেতে পারত। তবে প্রেম ও ভক্তিরসের এই অত্যন্ত নিকট-আত্মীয়তা অতিপরিচিত বলে বিশেষ করে এই জাতের কবিতা নির্বাচন করতে আমি খুব আগ্রহী হতাম না। প্রকৃতি সম্বন্ধে ঠিক এই ধাঁচের হৃদয়াবেগের প্রকাশ কোনো কবিতায় দেখেছি বলে মনে পড়ে না, যদিও ওয়ার্ডস্বার্থ, শেলী এবং রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা এর খুব কাছ ঘেঁষে যায়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানে অবশ্য প্রকৃতিপ্রেম মানুষীপ্রেমের রূপ নিয়েছে ('কেন পান্থ এ চঞ্চলতা'— ইত্যাদি), অনেক গানে প্রকৃতিপ্রেম ও মানুষীপ্রেম একাকার না-হয়েও ওতপ্রোত-ভাবে মিশেছে, পরস্পরের পটভূমিকারূপে কাজ করেছে। এইসব গানের তুলনা নেই কোথাও। সাম্প্রতিক সাম্যবাদী কাব্যে দেশপ্রেম ও সমাজপ্রেমের ভাববিন্যাসও নরনারীর প্রেমের অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে, অনেক সময়ে ধোঁকা লাগে কবিতাটির উদ্দিষ্ট সমাজ না প্রিয়া। তবে এর চেয়ে সার্থকতর আমার মনে হলো সেইসব বামপন্থী কবিতা যেখানে প্রেমানুভূতি অদ্ব্যর্থ অথচ সমাজবোধের মধ্যে বিধৃত ও তার দ্বারা ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

এসবে তবু আমরা অভ্যস্ত হয়ে আসছি। চমক লাগালো প্রভুর প্রতি কুকুরের হৃদয়াবেগকেও এমন সমুজ্জ্বল মানুষীপ্রেমের অনুভূতির ছকে ফেলা যায় দেখে। "ভক্ত" কবিতাটির নায়ক যে কুকুর সেটা তো প্রথম ছত্রেই বলা আছে। কিন্তু কবিতায় ব্যক্ত অনুভূতির প্যাটার্নটা মানবিক এবং মানুষী প্রেমের। 'ভালোমন্দ সব ভেদ করি দেখেছে সম্পূর্ণ মানুষেরে'—এ কি ভক্ত কুকুরের মনের কথা না

প্রেমিক মানুষের ? 'যারে ঢেলে দেওয়া যায় অহেতুক প্রেম, অসীম চৈতন্যালোকে পথ দেখাইয়া দেয় যাহার চেতনা'—একে কুকুরের হৃদয়ানুভূতি বলে ঠাহর করতে হলে কষ্টকল্পনার প্রয়োজন, মানুষের প্রেমের প্রকাশ না-ভাবাই শক্ত। নরনারীর প্রেমের যে-রূপকল্প রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল সেটি তিনি কুকুরের চেতনায় আরোপ করেছেন। মনোবৈজ্ঞানিকের পক্ষে তা প্রমাদ, কিন্তু কবির সে অধিকার দেবদত্ত। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে তা সত্ত্বেও (অথবা তার জন্যই) কবিতাটি অতীব রসোত্তীর্ণ। এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মধ্যে প্রেমানুভূতির এমন সুন্দর অভি-ব্যক্তিকে আমি অবহেলা করতে পারিনি।

সোজাসুজি এবং নির্ভেজাল প্রেমের প্রকাশ গত দু-হাজার বছরে এত প্রচুর পরিমাণে এত উৎকৃষ্টরূপে হয়ে গেছে যে ঠিক সেইরকম প্রকাশ কোনো সমকালীন কবির রচনায় দেখলে আমাদের ঈষৎক্লান্ত সংবেদনশক্তি সম্পূর্ণ সাড়া দিতে চায় না। যেসব কবিতায় অন্যজাতীয় চেতনার মধ্যে প্রেমের অনুভূতির একটু স্পর্শ বা অনুরণন মাত্র পাওয়া যায়, বা অন্য কথা বলতে গিয়ে প্রেমের কথা যেখানে হঠাৎ এসে পড়েছে, এসেও সমস্ত জায়গা জুড়ে বসতে সাহস পাচ্ছে না, সসংকোচে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে—আমার ব্যক্তিগত রুচিতে তেমন কবিতাই আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতারূপে প্রতিভাত হয়। এমন কয়েকটি কবিতার নির্বাচনে বসুমহাশয় এবং অন্য কোনো-কোনো সমালোচক খুশি হননি, কিন্তু আমি তাতে দুঃখিত নই। বরঞ্চ আমার দুঃখ এই যে এইধরনের কবিতা সংখ্যায় এত কম, পাঠকের রুচির খাতির করতে গিয়ে আমি নিজের রুচিকে কতকটা খর্ব করলাম।

বসুমহাশয় যে আমার 'ভূমিকাস্বরূপ প্রবন্ধটি'র (ভূমিকার ভূমিকা বললেই ভালো হতো) উপর চোখ বুলিয়েই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন সেটা খুবই স্পষ্ট। এর কারণ নিশ্চয়ই আছে, কারণ বিনা তো আর কার্য হয় না। কিন্তু সেই কারণ অথবা কারণ-সমুদয় যে কী তা তাঁর লেখায় স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ঠিক বোঝা গেল না নিম্নলিখিত সম্ভাব্য কারণ-সমুদয়ের মধ্যে কোনটি বা কোনগুলি তাঁর মনে অসন্তোষ জাগিয়েছে।

(১) প্রবন্ধের বিষয়টি তাঁর পছন্দ হয়নি।

(২) বিষয়টি ভালো, কিন্তু এ-বইয়ের ভূমিকারূপে ঐ-বিষয়ের অবতারণা অনুচিত হয়েছে।

(৩) বিষয়ও ভালো, এখানে তার আলোচনাও চলত, কিন্তু আমি যা-লিখেছি সেটা বাজে।

(৪) আমার মতামত বা সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে অগ্রাহ্য ঠেকেছে।

(১) এ নিয়ে কোনো তর্ক চলে না, অথবা বলা উচিত যে বহুদেশকাল জুড়ে এ-তর্ক চলে আসছে, আজও তার মীমাংসা হয়নি। এক পক্ষের মত—সাধারণভাবে দার্শনিক গবেষণার এবং বিশেষভাবে কাব্যতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার কোনোই মূল্য নেই; বিপক্ষ বলেন (খুব সম্ভব এঁরা সংখ্যালঘু) এসব জিনিসের মূল্য অত্যধিক। বসু-মহাশয় যদি প্রথম দলে পড়েন, আমি দ্বিতীয় দলে পড়ি। অতঃপর নমস্কারান্তে আমরা যে-যার পথে এগুতে পারি। 'নিষ্ফলা', 'নিঃসিদ্ধান্ত', 'অবয়বহীন' বিশেষণ-গুলি তিনি সাধারণভাবে কাব্যজিজ্ঞাসা সম্বন্ধে প্রয়োগ করেছেন, নাকি বিশেষ করে আমারই রচনার উদ্দেশ্য—সেটা অদ্ব্যর্থসূচক ভাষায় বলা হয়নি। খুব সম্ভব দ্বিতীয়টাই। প্রথমটা হলে তার সপক্ষে কোনো যুক্তি পেলাম না তাঁর সুদীর্ঘ সমালোচনায়।

(২) কাব্যস্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা না-করে 'বাংলায় প্রেমকাব্যের ঐতিহ্য, কাব্যে প্রতিফলিত বঙ্গীয় প্রেমের বৈশিষ্ট্য, সাম্প্রতিক কাব্যে প্রেমের শিল্পরূপ, এ-ধরনের কয়েকটি বিষয়ে' আমি মনোনিবেশ করিনি বলে বসুমহাশয় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সমালোচ্য পুস্তকের ভূমিকাতে ঐসব বিষয়ের একটি সুযোগ্য আলোচনা থাকলে যে ভালো হতো সে-কথা আমিও স্বীকার করি, কিন্তু তেমন লেখা লিখতে তো আমি অধিকারী নই। 'পরধর্ম ভয়াবহ' জেনেই সে-চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলাম। 'খাঁটি সাহিত্যিক আলোচনা' আমার ক্ষমতার অতীত এবং চিত্তধর্মের প্রায় বিপরীত। আমার চোখের সামনে ***Oxford Book of Christian Verse***-এর ভূমিকার সদ্দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন বসুমহাশয়, কিন্তু বৃথাই। ইংরাজি প্রবাদবাক্যে মাঝদরিয়ায় ঘোড়া বদল করতে নিষেধ আছে; মাঝবয়সে পৌঁছে পূর্বসাধনায় স্থির থাকাই ভালো। যৌবনকালেই মানুষ ভাবে সে সব্যসাচী। প্রৌঢ় বয়সের আশাভঙ্গ তাকে জানিয়ে দেয় কোনো-একটি বিষয়ে সামান্য একটু সিদ্ধিও কত দুর্লভ। বসুমহাশয় স্বয়ং কষ্ট করে আস্ত একটি বিকল্প ভূমিকাই লিখে দিয়েছেন। আমি যা লিখতে পারতাম না তিনি তা লিখে দিয়ে ভালোই করেছেন; এসব ব্যাপারে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা তার গুণাগুণ বিচার করবেন, এবং ভাবী সংকলনের প্রকাশকরা সেদিকে মনোযোগী হবেন। কিন্তু এ-জাতীয় লেখায় পাণ্ডিত্য-প্রকাশের সুযোগ নেই অথবা কম, তাঁর এই উক্তিটা মানতে পারলাম না। সুযোগ বরঞ্চ বেশী। এর যথেষ্ট প্রমাণ বসুমহাশয় নিজেই দিয়েছেন (দেশী-বিদেশী, বিদেশীই অধিক, প্রায় তিরিশটি নামের উল্লেখ আছে তাঁর সমালোচনার এই অংশে)। আরো প্রমাণ দিতে চাইলে বিষয়ের দিক থেকে কোনো বাধা পেতেন না। সমালোচক লিখছেন,

'ক্ষোভের বিষয়, কেননা বর্তমান সম্পাদনাকার্যে এমন কোনো প্রমাণ পেলাম না যাতে বলতে পারি যে-পরিমাণে সম্পাদকের রুচি প্রশংসনীয় তাঁর সমালোচনা-কুশলতা সেই পরিমাণে আদরণীয়।' শূন্য থেকে কোনো কিছুর প্রমাণ পাওয়া দুঃসাধ্য বটে। আমার 'সম্পাদকীয় রচনায়' কাব্যজিজ্ঞাসা আছে, কাব্যসমালোচনা একেবারে অনুপস্থিত। সেই অনুপস্থিত সমালোচনার কুশলতা বসুমহাশয়ের কাছে আদরণীয় ঠেকেনি এটা খুব আশ্চর্য নয়।

কাব্যসমালোচনায় যদি আমি অপারগ কাজেই পরাঙ্মুখ হই তবে কোনো ভূমিকা না-লিখলেই তো হতো। আমারও ইচ্ছা তাই ছিল, কিন্তু প্রকাশক মহাশয় কিছুতেই মানলেন না। বললেন আমার কাছ থেকে একটি ভূমিকা তাঁর চাই-ই, সাহিত্যিক না-হয়ে দার্শনিক হলেও আপত্তি নেই। আমার তরফে যা বলার আছে তা দুটি প্রশ্নের আকারেই বলি। প্রেমের কবিতা যাঁরা পড়েন, প্রেম ও কবিতার স্বরূপ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই কি তাঁদের মনে কখনো জাগে না? ঐ-বিষয়ে দার্শনিক আলোচনায় যোগ দেওয়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে একটু কষ্টসাধ্য হতে পারে, কিন্তু সেরকম আলোচনা একেবারে অপাঙ্‌ক্তেয় হবে কি? আর একটি কথা। কবিতার সাহিত্যিক বিচার ভালো মন্দ মাঝারি অনেকে অনেকরকম করেছেন; তার স্বরূপ-জিজ্ঞাসা, আর-কিছু না-হোক, বিরল তো বটেই। বাংলা প্রবন্ধে সর্বত্র ইতিহাসের ছড়াছড়ি দেখে আমি বড়ো হতাশ বোধ করি। দু-এক শতাব্দী বা সহস্রাব্দী পেছনে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আর কতকাল পথ চলব আমরা?

(৩) সাধারণভাবে যদি বসুমহাশয় বলেন যে আমার লেখাটি নিকৃষ্ট হয়েছে, তবে তাঁর তিরস্কার আমি নীরবে মেনে নেব। বিশেষভাবে তিনি কয়েকটি দোষ এবং 'দুর্বলসূত্র' দেখিয়েছেন; তার উত্তরে আমার বক্তব্য জানাচ্ছি।

বসুমহাশয় বলেছেন আমার এ-লেখার কোনো-কোনো অংশে অপ্রাসঙ্গিকতা-দোষ ঘটেছে। ঠিক কোন অংশগুলি তাঁর মতে অপ্রাসঙ্গিক তা তিনি জানাননি। জানালে আমি দেখাতে চেষ্টা করতাম ঐ-অংশগুলি কোন সূত্রে অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত, সমগ্র প্রবন্ধে তাদের স্থান ও প্রয়োজন কোথায়। প্র্যাগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্, পজিটিভিজ্‌ম্ প্রভৃতির অবতারণায় তাঁর আপত্তি আছে বোঝা গেল, কিন্তু ঐ-সব বিষয়ে আমি কোনো আলোচনাই করিনি। উল্লেখমাত্র করেছিলাম চল্‌তি মতের হাওয়া কোন দিকে বইছে সেইটা শুধু নির্দেশ করবার জন্যে। এই হাওয়ার প্রতিকূলে কিছু বলা আবশ্যক ছিল, কারণ কাব্যবিষয়ে আমার বক্তব্য ঐ-হাওয়াতে টিঁকতে পারে না।

বসুমহাশয়ের আর একটি অভিযোগ এই যে এ-প্রবন্ধে উল্লিখিত নাম ও উদ্ধৃত

বাক্যের বাহুল্য দেখা যায়। কিছু বাহুল্য সত্যিই ঘটেছে—নিছক আলস্যের ফলে। সেটা দোষের। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার জন্য দায়ী দার্শনিক বিচারের একটি সাধারণ অসুবিধা এবং সেইসঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত অক্ষমতা। আমার বক্তব্য যদি খুবই অভিনব হতো, অন্তত আহরিত অংশের পরিমাণ অত্যল্প থাকত—অর্থাৎ আমি যদি একজন দার্শনিক প্রতিভা হতাম (কোনো শতাব্দীতেই তাঁদের সংখ্যা দু-চার জনের বেশি নয়) তা হলে অন্য-সব মতকে অগ্রাহ্য করে আমি সোজাসুজি নিজের মতটাই ব্যক্ত করে যেতাম। কিন্তু এ-পথে আমি একজন সামান্য পদাতিক, কোনো অর্থে মহারথী নই। আমার মতের অধিকাংশ খণ্ড-অংশ অন্যের কাছ থেকে পাওয়া, কেবল সমগ্রের বিন্যাসটাই আমার স্বকীয়। তাই প্রত্যেকের কাছে না-হোক অন্তত প্রধান উত্তমর্ণ যাঁরা তাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করবার নৈতিক দায়িত্ব আমার আছে এবং যাঁদের আমি খুব নিকটবর্তী তাঁদের সঙ্গে আমার মতের যেটুকু প্রভেদ সেটা নির্দেশ করবার স্বাভাবিক প্রয়োজন। তা ছাড়া দার্শনিক কোনো বিচারই সরাসরি সিদ্ধ বা পুরোপুরি অসিদ্ধ নয়; সর্বত্রই কিছু সত্য কিছু ভ্রান্তি, কিছু যুক্তি, কিছু খেয়ালের মিশেল পাওয়া যায়। মাত্রাভেদ অবশ্য আছে। এবং একজন দার্শনিক কোন মতটিকে বরণ বা গঠন করবেন সেটা শেষ পর্যন্ত অনেকাংশে নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের উপর, তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির উপর। এ-দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার মনে হয় দার্শনিক বিচার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এবং শিল্পসৃষ্টির মধ্যবর্তী। তাই কোনো দার্শনিকের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী মতামতের কতটুকু গ্রাহ্য এবং কতটুকু খণ্ডনীয় ও বর্জনীয় তার নির্দেশ দার্শনিক বিচারপদ্ধতিরই অঙ্গীভূত। চূড়ান্ত প্রমাণ যেখানে মরীচিকা, সেখানে তুলনামূলক বিচার এবং বিতর্কই পথ। কাজেই বহু নাম ও মতের উল্লেখ অনিবার্য। ছিদ্রান্বেষী বলতে পারেন এটা পাণ্ডিত্য প্রকাশ; জ্ঞানান্বেষী তার অন্যবিধ প্রয়োজন অনুভব করবেন।

রইল উদ্ধৃতি। বসুমহাশয় বলেছেন যে যেসব কথা আমি নিজের দায়িত্বে বলতে পারতাম কিন্তু বলতে সাহসী হইনি সেসবের জন্য পরের সমর্থন ভিক্ষে করেছি। উক্তিটা অকরুণ, কিন্তু তাতে আপত্তি নেই। আপত্তি এই যে এখানেও তাঁর উক্তিতে যাথার্থ্যের অভাব ঘটেছে। আমার অধিকাংশ উদ্ধৃতি সাহিত্যের সেইসব দুলাল বাক্যের যার সমর্থন অন্যেরা খোঁজেন কিন্তু আমি যেগুলিকে খণ্ডন, সংশোধন বা চল্‌তি অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। মালার্মে, এলিয়ট, ওয়ার্ডস্বার্থ, অভিনবগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, মার্কস্‌, হেগেল, পার্কার, ড্রাইডেন এই পর্যায়ভুক্ত। কয়েকটি উদ্ধৃতি আছে এমনসব বাক্যের যার দ্বারা ভিন্নমতাবলম্বী পূর্বাচার্যরা নিজের

বিঘোষিত মত নিজেই খণ্ডন করেছেন—যথা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের জবানীতে অভিনবগুপ্ত, ক্লাইভ্ বেল, এ. সি. ব্রাডলী, ক্রোচে। এসব বাদ দিলে মাত্র চার-পাঁচটি উদ্ধৃতি থেকে যায় যা আমার স্বপক্ষের—তার মধ্যে দুটি পদ্য। এই উদ্ধৃতি-গুলি সুন্দর এবং লাগসই বলেই আমার পক্ষে লোভনীয় হয়েছিল, নইলে আমার বক্তব্যের সমর্থনে তাদের টেনে আনার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বাদ দিলেও সে-বক্তব্য মোটেই দুর্বল হয় না।

বসুমহাশয় প্রবন্ধের মধ্যে 'অনেকগুলি দুর্বলসূত্র' খুঁজে পেয়েছেন। সে-বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

(ক) 'প্রাচীন গ্রীকদের অনুকারবাদ পরবর্তী গ্রীক দার্শনিকরাই মেনে নিতে পারেননি'—আমার এই উক্তিতে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আপত্তি আছে। তিনি বলছেন যে এ্যারিস্টট্‌ল্-পরবর্তীরা 'অনুকরণবাদ অস্বীকার করেননি, অনুকরণবাদের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিয়েছেন'। আমি তো বলিনি যে পরবর্তীরা অনুকারবাদ ('অনুকরণবাদ') অস্বীকার করেছিলেন, আমি লিখেছিলাম তাঁরা '**প্রাচীন গ্রীকদের** অনুকারবাদ মানতে পারেননি।' এই বড়ো অক্ষরের বিশেষণ পদটিকে বিলুপ্ত করে দিয়ে বসুমহাশয় অনর্থক ছায়ার সঙ্গে ঝগড়া করতে উদ্যত হয়েছেন। প্রাচীন গ্রীক অনুকারবাদ বলতে আমি কী বুঝি, 'প্রকৃতির নিখুঁত প্রতিকৃতি', 'প্রতিবিম্বকে বিম্বের অবিকল অনুবর্তী করা', প্রভৃতি বাক্যাংশের মধ্যে কি সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়নি? বসুমহাশয় নিশ্চয়ই জানেন যে ঠিক এইধরনের অনুকারবাদ স্বয়ং এ্যারিস্টট্‌ল্ মানেননি; আরো পরবর্তীরা তো এর থেকে আরো দূরে সরে গিয়েছিলেন। প্লটাইনাসের লেখার সঙ্গে আমি পরিচিত নই, তাঁর সম্বন্ধে ক্রোচের মন্তব্য উদ্ধৃত করছি: 'The mystical view, which considers art as a special mode of self-beatification, of entering into relation with the Absolute, with the Summum Bonum, with the ultimate root of things, appeared only in late antiquity, almost at the entrance to the Middle Ages. Its representative is the founder of the neo-Platonic school, Plotinus." (*Aesthetic*, p. 162।) এটা কোনো অর্থে প্রত্যক্ষ-বস্তুর অনুকরণমূলক শিল্পব্যাখ্যা নয়। 'অনুকারবাদ' সংজ্ঞাটি অবশ্য বহু শতাব্দী ধরে প্রচলিত ছিল—বলতে গেলে সংজ্ঞিতের খোল-নল্‌চে দুই-ই পাল্‌টে দিয়ে। ইতিহাস থেকে কাব্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে এ্যারিস্টট্‌ল্ বলেছিলেন, ইতিহাসের কারবার 'বিশেষ' অর্থাৎ particular-কে নিয়ে, কাব্যের আধেয়

'সামান্য' (universal)। কিন্তু বিজ্ঞানের অন্বিষ্টও সেই 'সামান্য'ই; তবে দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? এ্যারিস্টট্‌ল্‌ এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি। অনুকার-বাদকে বিশেষ বস্তু থেকে সামান্য ভাবের (idea) দিকে নিয়ে গিয়ে এ্যারিস্টট্‌ল্‌ দুটি ভুল করলেন। প্রথমত, সামান্যের অনুকরণ বলতে স্পষ্ট কিছু বোঝায় না; দ্বিতীয়ত, কোনো সোজা অর্থে 'সামান্য' কাব্যের বিষয় নয়, যেমন কিনা তা বিজ্ঞানের বিষয়। কিন্তু এইসব তর্ক তুলে পরিস্থিতি আবার জটিল করে ফেলতে চাই না।

(খ) মার্কস্‌-এঙ্গেল্‌সের ভাষায় মানবচিত্তকে জড়জগতের মুকুর-বিম্ব বলা সোহং-বাদের উল্টোপিঠ এবং ভ্রান্তিবিলাসে দুই-ই তুল্যমূল্য—আমার এই উক্তিতে বসু-মহাশয় বিষম চটেছেন। তিনি যদি মার্কস্‌বাদের প্রত্যেকটি সূত্রকে বেদবাক্য জ্ঞান করেন কিংবা সলিপ্‌সিস্ট মতাবলম্বী হন তবে চটবার কারণ তাঁর আছে। কিন্তু পৃথিবীর কোনো মতবাদের কোনো-একটি খণ্ডাংশকে ভ্রান্ত বলার আগে সেই মতবাদ সম্বন্ধে বক্তা কতখানি বিদ্যা অর্জন করেছেন দলিল-দস্তাবেজ সহ তার প্রমাণ বসুমহাশয়ের নিকট উপস্থাপিত করতে হবে—এ-দাবিটা বাড়াবাড়ি। একটু ধৈর্যের সঙ্গে প্রবন্ধ পাঠ করলে বসুমহাশয় লক্ষ করতেন যে কয়েক পৃষ্ঠা পরেই আমি মার্কস্‌বাদের একটি মূল প্রত্যয়ের (বিশ্বজগতের ডায়লেক্‌টিক্‌ বিকাশের) প্রতি সবিস্তারে আমার আন্তরিক আস্থা জ্ঞাপন করেছি। এখানে অবশ্য আমার একটি ত্রুটি স্বীকার করা কর্তব্য। 'সোহংবাদ' শব্দটা যে আমি solipsism-এর বাংলা পারিভাষিক প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করেছিলাম (আমার উদ্ভাবন নয়, শব্দটি কোনো পূর্বসূরীর লেখা থেকে সংগৃহীত—খুব সম্ভব সুধীন্দ্রনাথ দত্তের), এটা সুস্পষ্ট-রূপে পাঠককে জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল বিশেষ করে এইজন্য যে সোহংবাদের আর একটি প্রচলিত অর্থ বেদান্ত। এবং বেদান্তের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই, বেদান্ত সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। শুনেছি বৈদান্তিক অনেকগুলি মতের মধ্যে একটি মত দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ নামে পরিচিত, এবং সেটি সলিপ্‌সিজমের খুবই কাছাকাছি। কিন্তু অন্য কোনো বৈদান্তিক মতকে বা এই মতের solipsist epistemology ছাড়া অন্য কোনো অঙ্গকে আমার বক্তব্য স্পর্শ করে না।

(গ) 'অবশ্য ও হয়তো-র মধ্যে মর্মান্তিক গোলযোগ' বাধে যদি 'অবশ্য' শব্দটি 'নিশ্চয়ই' অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বাংলায় ও-দুটি শব্দ সর্বদা সমার্থবাচক নয়। 'অবশ্য' অনেক ক্ষেত্রে বাক্যটির উপর একটু জোর দিয়েই আপন কর্তব্য সমাধা করে, বিবক্ষিত ব্যাপারের সম্ভাব্যতার মাত্রা ষোল আনা কি তার চেয়ে অনেক কম সেটা

নির্দেশ করবার দায়িত্ব নেয় না। ইংরেজিতে **certainly** আর **of course**-এর পার্থক্য এর সঙ্গে তুলনীয়। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক: 'আমাদের দলের অনেকেই সভায় উপস্থিত থাকবেন, অবশ্য আমি ঠিক সময়ে হয়তো পৌঁছুতে পারব না।' অবশ্য-এর প্রয়োগ কি এখানে ব্যবহার-সিদ্ধ নয়? আমি জোর করে কিছু বলতে চাই না, কিন্তু প্রশ্নটা ইডিয়মের, লজিকের নয়।

মনিজ্‌ম্‌ও যে মেটাফিজিক্সের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে তাতে আর সন্দেহ কী, বি. এ. ক্লাসের পাঠ্যপুস্তকই তার প্রমাণ। কিন্তু প্লুরালিস্টরা বরাবরই বলে এসেছেন যে মনিজ্‌ম্‌-এর মূল কথাটা যুক্তিনির্ভর নয়, যোগজ প্রত্যক্ষের ব্যাপার, মিস্টিক্যাল। জেম্‌স্‌ এক জায়গায় লিখেছেন: **'To interpret absolute monism worthily, be a mystic'**, রাসেলের অভিমতও তাই (**"Mysticism and Logic"** প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)। এ-বিষয়ে আমি মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করেছি মাত্র, কোনো মৌলিক মূর্খতার পরিচয় দিইনি।

বসুমহাশয় বলেছেন, এসব তর্ক বাদ দিয়েও আমার যে-উক্তিটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন তার বক্তব্যে খুব একটা যুক্তিবিরোধ আছে। কোথায়? কাব্যের সত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সত্যকে আমরা মেলাতে পারি না। যোগী যদি বলেন যে তিনি পারেন তবে তাঁর কথা যথার্থ হতেও পারে, কিন্তু তাঁর সেই অদ্বৈত মহাসত্যটি আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনধিগম্য। সুতরাং আমরা তা মানব কেন? আমাদের অভিজ্ঞতার সীমানায় অনেকান্ত সত্যগুলিই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে পরম, 'তাহার উপরে নাই'। —এর মধ্যে যুক্তিবিরোধ আবিষ্কার করা 'বিস্ময়ের বিষয়' বটেই।

(ঘ) আর্টের সুখবাদী ব্যাখ্যার একটি সংক্ষিপ্ত নিদর্শন হিসেবেই ড্রাইডেনের উক্তিটি ব্যবহার করেছিলাম, এই ব্যাখ্যার ইতিহাসে ড্রাইডেনের স্থান নির্দেশ করা আমার অনভিপ্রেত এবং আমার রচনার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক ছিল। স্মরণশক্তি ক্ষীণ বলে ইতিহাস নামক বস্তুটাকে আমি বড়ো ডরাই। তবু এটুকু জানি যে উক্ত মত গ্রীক আমলেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু আসল কথায় আসা যাক। শিল্পের সুখবাদী ব্যাখ্যাকর্তাদের পক্ষে 'স্বভাবতঃই একটি বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় কিং লীয়র, শ্যামা প্রভৃতি ট্র্যাজেডির মূল্যায়ন'—আমার এই মন্তব্য পড়ে বসুমহাশয় এমন 'আশ্চর্য আশ্চর্য' হয়ে উঠলেন কেন? পৃথিবীতে এত বিচিত্র বস্তু থাকতে একজন সামান্য লেখকের একটি নিরীহ উক্তিতে এতখানি বিস্ময়বোধ খরচ করে ফেলা ভালো নয়। শব্দপ্রয়োগ ব্যাপারে বসুমহাশয় আবার তাঁর অভ্যস্ত অনবধানতা এবং **precision**-এর অভাবের পরিচয় দিয়েছেন। সুখবাদী ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমি একটি মন্তব্য

করলাম, বসুমহাশয় প্রচণ্ড আপত্তি তুলে বললেন যে আনন্দবাদী ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সে-মন্তব্য খাটে না! এখানে 'সুখে'র জায়গায় 'আনন্দ' শব্দটা বসিয়ে দিলে যে মূল উক্তি একেবারে অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। সাদাসিধে অর্থে সুখ জাগানোই আর্টের উদ্দেশ্য—এমন কথা বললে ট্রাজেডির কোনো সৎ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। অধিক মাত্রায় সুখ, অবিমিশ্র সুখ, স্থায়ী সুখ ইত্যাদি বললেও সম্ভব হয় না। অগত্যা 'সুখ' কথাটা সম্পূর্ণ বর্জন করে রসানন্দ, হ্লাদ প্রভৃতি ভিন্নার্থবাচক শব্দ, কাজেই ভিন্ন পর্যায়ের অনুভূতির মধ্যে আর্টের তাৎপর্য খুঁজতে হয়। রসের অনুভূতি যেমন সাধারণ সুখ-দুঃখের ভাবগ্রামের বাইরে পড়ে, প্রেমের অনুভূতিও তেমনি। এই তো ছিল আমার মোটা বক্তব্য। এতে পরম বিস্ময়েরই বা কী দেখলেন বসুমহাশয়, এবং 'ধোঁয়াটে উচ্ছ্বাস'ই বা কোথায় পেলেন?

(৪) এক জায়গায় বসুমহাশয় বলছেন আমার এই প্রবন্ধ 'নিঃসিদ্ধান্ত', অন্যত্র লিখছেন যে এতে 'কাব্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে যেটুকু সুষ্ঠু আলোচনা আছে সেটুকু আইয়ুব-মহাশয়ের পূর্বতন সংকলনের ভূমিকাতেও পাওয়া যায়।' হয়তো সময়াভাবে দুটোর কোনো প্রবন্ধই তিনি আগাগোড়া পড়েননি, খুব সম্ভব কোনোটার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক বোধ করেননি। নইলে ওরকম দুটি অযথার্থ মন্তব্য তিনি করতেন না। আগের সংকলনের ভূমিকার প্রথম অংশে (যেখানে কাব্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে) আমি কবিতার সংজ্ঞা, সৎকাব্যের প্রতিমানাদি বিষয়ে তিনটি প্রতিভূ মতের উল্লেখ করেছিলাম—শুধু এইটুকু দেখাবার জন্য যে এ-ব্যাপারে কত গভীর মতানৈক্য বিদ্যমান, এবং কোনো ঐকমত্যে পৌঁছবার সম্ভাবনা কত সুদূর-পরাহত। অথচ 'কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অংশত কোনো মতস্থৈর্য না-ঘটলে কবিতার ভালোমন্দ যাচাই করা নিতান্ত ব্যক্তিগত খামখেয়াল, তাতে সর্বসম্মতির দাবি হয় মূঢ়তা নয় অহংকার।' ('আধুনিক বাংলা কবিতা', পৃ. ॥০।) বর্তমান সংকলনের ভূমিকাতে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি খুব প্রাথমিক এবং সাদামাটা মত (প্রাচীন গ্রীকদের অনুকারবাদ) থেকে আরম্ভ করে ডায়লেকটিকের ঘোরা সিঁড়ি বেয়ে এমন মতে উপনীত হয়েছি যাকে আমি নিজে সমর্থন করতে পারি। সে-মতটাই এ-প্রবন্ধের প্রথম অংশের সিদ্ধান্ত। সেটার অস্তিত্বমাত্র যখন বসুমহাশয়ের চোখে পড়েনি তখন সংক্ষেপে তার পুনরুল্লেখ এখানে অমার্জনীয় হবে না আশা করি—যদিও আমার মূল প্রবন্ধটাই যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত, এবং তার স্বল্প পরিসরের মধ্যে অনেকগুলি কথা সন্নিবিষ্ট করবার চেষ্টার ফলেই প্রসাদগুণবঞ্চিত হয়েছে।

কাব্য বহির্জগতের অনুকরণ না-হলেও সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একটি অখণ্ড

বোধের মধ্যে গ্রহণ করে যে, মূল্যবোধের দ্বারা অভিষিক্ত হয় কবিচিত্ত, কবিতার মূল্য সেই পরমমূল্যেরই প্রতিচ্ছায়া। গ্রীকদের সম্পূর্ণ বিষয়গত মিমেটিক্ মতবাদের এ্যান্টিথিসিসরূপে উল্লেখ করেছিলাম একটি বিষয়ীগত মতবাদের—আধুনিক কালের প্রসাদ-লালিত (যদিও আমাদের দেশের পক্ষে প্রাচীন) এক্স্‌প্রেশনিস্ট্ থিয়োরির। উক্ত দুই মতের সংগতিরূপে যে তৃতীয় মতটি আপনি দানা বাঁধে তার মূল কথা হলো এই যে, কাব্য বহির্জগতের প্রতিবিম্ব বটে, কিন্তু তার উপরিতলবর্তী দিনানুদৈনিক খণ্ডরূপের নয়; তার গভীরতর ও সমগ্রতর রূপই কবিচিত্তে উপলব্ধ হয়ে তাঁর কাব্যে অভিব্যক্ত হয়। আবার এ-ও সত্যি যে কাব্য কবির অন্তরের প্রকাশ, কিন্তু সে-অন্তর্চেতনা শূন্যে দোদুল্যমান, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ কিছু নয়। বস্তুকে নিয়েই চেতনা। তবে বস্তু ও চেতনা একেবারে অসম্পৃক্তও হতে পারে না, একেবারে অভিন্নও নয়। বিজ্ঞান চেষ্টা করে যতদূর সম্ভব বস্তুসত্তাকে আমাদের ভাবনা-বেদনা থেকে পৃথক করে স্বাধীন করে দেখতে; কবির মন চায় বাইরের জগতের সঙ্গে নিবিড় সাহিত্য। এই দ্বৈতাদ্বৈত সম্পর্ক কাব্যানুভূতির বৈশিষ্ট্য, প্রেমেরও। প্রেমিকের উপলব্ধিতে তার প্রেমাস্পদের স্বরূপও তেমনি—সত্য কিন্তু সর্বজনীন নয়, বিষয়গত অথচ বিষয়ীর অনুভবসাপেক্ষ। এটাই প্রবন্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের মধ্যে যোগসূত্র। আগের প্রবন্ধে আমি যে-কাজটা সযত্নে এড়িয়ে গেছি, এখানে (বর্তমান প্রবন্ধের প্রথম অংশে) সেই দুরূহ কাজে প্রযত্নবান হয়েছি—অর্থাৎ কাব্যের মূল্য সম্বন্ধে একটি মত দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি। এই বিষয়ে আমার কোনো সিদ্ধান্ত নেই না-বলে, আমার সিদ্ধান্তটি বসুমহাশয় গ্রহণ করেননি বললেই তাঁর উক্তি যথার্থ হতো। কিন্তু তা হলে আমার যুক্তি ও উক্তির বিরুদ্ধে (এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়, কতক পরিমাণে তা পাঠকের সমদৃষ্টি ও সমানুভূতি উদ্রেকের উপর নির্ভরশীল) তাঁর কী বলবার আছে, কাব্যজিজ্ঞাসায় কোন বিকল্প সিদ্ধান্তটি তাঁর মনে গ্রাহ্য—সেসব কথা জানাবার দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারতেন না।

পুনঃ: সম্প্রতি শ্রীমান সুরজিৎ দাশগুপ্তের সমালোচনায় ('উত্তরসূরী', শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৩) একইরকম ভুল দেখে আশ্চর্য হলাম। তিনিও ধরে নিয়েছেন যে আমি যতগুলি মতের উল্লেখ করেছি সব আমারই মত, এবং যতগুলি উদ্ধৃতি দিয়েছি সব আমারই বক্তব্যের সমর্থনে। অতঃপর তিনি ঐগুলির মধ্যে পরস্পর-বিরোধ, কিংবা উল্লিখিত মত বা উদ্ধৃত বাক্যের সঙ্গে আমার বক্তব্যের বিরোধ আবিষ্কার

করে খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। শিল্পে কোনো গূঢ় অর্থের ইঙ্গিত নেই, তার রূপ রেখা ও ধ্বনির মাধুর্যেই তার মূল্য—এমন শিল্পব্যাখ্যাকে আমি বলেছিলাম কাব্যবিচারে দেহাত্মবাদ। এই মতটি স্পষ্টতই আমার নয়, এবং ডেকরেটিভ আর্ট ছাড়া অন্য কোনো আর্টের বেলায় খাটে না। উচ্চাঙ্গের শিল্পরচনার আঙ্গিক আমার মতে (এবং আরো অনেকের মতে) 'অর্থব্যঞ্জনাঘন'। সেই অর্থ-জিজ্ঞাসায় তার পর আমি এগিয়েছি। শ্রীমান দাশগুপ্তের মতো কাব্যপাঠকের পক্ষে এইটুকু বোঝা সম্ভব হয়নি কেন?

ওয়ার্ডস্বার্থের উদ্ধৃত বাক্যে (poetry is emotion recollected in tranquillity) আমি দুটি ভুল দেখিয়েছিলাম। প্রথমত কাব্যে যা ব্যক্ত হয় তা recollected কিছু নয়, 'একান্তই উপস্থিত'। দ্বিতীয়ত, 'প্রাত্যহিক জীবনের হৃদয়াবেগের পর্যায়ে তাকে ফেলা যায় না', তা মনের অন্য কক্ষের ব্যাপার, নৈর্ব্যক্তিক, সাধারণীকৃত, ইত্যাদি। এই শেষের কথাগুলির প্যারাফ্রেজ করে স্বরজিৎ লিখছেন 'তা যদি হলো তা হলে কাব্যকে emotion recollected in tranquillity বলা যায় কেমন করে।' শ্রীমানের পক্ষে কেমন করে ভুলে যাওয়া সম্ভব হলো যে: —১. উক্তিটি আমার নয় ওয়ার্ডস্বার্থের; এবং ২. তিনি আমার বিরুদ্ধে যে-আপত্তি তুলেছেন ওয়ার্ডস্বার্থের বিরুদ্ধে আমার আপত্তির একাংশ অবিকল তাই।

স্বরজিৎ ঠিকই বুঝেছেন যে 'প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে সম্পাদকের ধারণা স্বচ্ছ নয়'। প্রেম সম্বন্ধেও না, কবিতা সম্বন্ধেও না। আশা করেছিলাম, তিনি আরো বুঝবেন যে ঐসব বিষয়ে ধারণা স্বচ্ছ করতে আমার আগ্রহ আন্তরিক, এবং সাধনা শ্রমবিমুখ নয়। সিদ্ধি অবশ্য এখনো সুদূর। প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে কাদের ধারণা যে স্বচ্ছ তা আমি জানি না, আমার সমালোচকদের যে নেই সেটুকু বলতে পারি। পূর্বোক্ত দুজন সমালোচকের কথাই ধরা যাক—এঁদের সমালোচনা নিয়েই কথা হচ্ছে যখন। দেখছি রবীন্দ্রনাথের "ভক্ত" কবিতা বিষয়ে এঁরা একমত: সেটা প্রেমের কবিতা নয়। এই কবিতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পূর্বে জানিয়েছি। বসুমহাশয়ের মতে বিষ্ণু দে-র "আলেখ্য" প্রেমের কবিতা নয়, কিন্তু তাঁর "ঘোড়সওয়ার" প্রেমের কবিতা। দাশগুপ্তমহাশয়ের মত ঠিক উল্টো। বসুমহাশয়ের মতে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নির্বাচিত সব কবিতাই প্রেমের কবিতা; দাশগুপ্তমহাশয়ের মতে তাঁর "নান্দীমুখ" প্রেমের কবিতা নয়। তিনি কি ঠিক জানেন যে ঐ-কবির "শর্বরী" তাঁর স্বকীয় সংজ্ঞা-অনুযায়ী প্রেমের কবিতাই, 'প্রেম তত্ত্ব নিয়ে রচিত' নয়? এই সমালোচকের মতে বুদ্ধদেব বসুর "কবিমশাই"ও প্রেমের কবিতা নয়; বসুমহাশয়ের

ঐ-কবিতাকে প্রেমের কবিতা বলতে কোনো আপত্তি নেই। জীবনানন্দ দাশের 'ধান কাটা হয়ে গেছে'-কে দুজনই বাদ দিতে চান, কিন্তু ভিন্ন কারণে। বসু-মহাশয়ের মতে কবিতাটি ভালোই, কিন্তু প্রেমের কবিতা নয় ; দাশগুপ্তমহাশয়ের মতে কবিতাটি বাজে, তাতে কবির সুনাম বিপন্ন হয়।

রুচিভেদ স্বাভাবিক, পররুচি-সহিষ্ণুতা বিরল, কিন্তু একেবারে তথ্যাতথ্য-জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মতো অধৈর্য বিস্ময়কর। কিরণশংকর সেনগুপ্তের কোনো কবিতা নির্বাচিত হয়নি বলে শ্রীমান সুরজিৎ দাশগুপ্ত উষ্মা প্রকাশ করেছেন, অথচ সংকলনের সূচিপত্রে এই কবির নাম আছে, ১৬৩-১৬৪ পৃষ্ঠায় তাঁর কবিতা রয়েছে। অজিত দত্তের 'আর সব রচনা বাদ দিয়ে "নষ্টচাঁদ" নেওয়া হয়েছে'—এই উক্তিও তথ্যের ধার ধারে না, কারণ অজিত দত্তের আরো দুটি কবিতা এই সংকলনে বর্তমান।

কবিতা সরল ও নির্ভার হবে, 'সর্বত্রগামী' হবে ; এবং গদ্যেই থাকবে নানা দুরূহ জটিল ও জ্ঞানগুরু বিষয়ের আলোচনা, বিষয়-অনুযায়ী অধিকারভেদ কতক পরিমাণে মেনে নেবে গদ্য—এটাই স্বাভাবিক নয় কি? কিন্তু এ এক অদ্ভুত যুগে আমরা বাস করছি যখন কবিরা দাবি করেন (এবং সে-দাবি সমালোচকরা সোৎসাহে সমর্থন করেন) যে প্রত্যেকটি কবিতা পাঁচবার করে পড়তে হবে এবং প্রত্যেকটি ছত্রের শেষে পাঁচ মিনিট ধরে ভাবতে হবে, নইলে কবিতা হবে হেঁয়ালি ; তীক্ষ্ণ ও সজাগ বুদ্ধি এবং প্রভূত জ্ঞানভাণ্ডার না-থাকলে কবিতা-পাঠে অধিকার জন্মাবে না কারো। অথচ গদ্যে পৃথিবীর গভীরতম সমস্যার আলোচনা করতে গেলেও সে-গদ্য চোখ বুলিয়েই বুঝে ফেলা যাবে, পাঠকপক্ষে বিন্দুমাত্র শ্রবণ-মনন না-থাকলেও যদি কোনো পাঠক কোথাও কিছু বুঝতে এতটুকু অসুবিধা বোধ করেন তবে যত দোষ সব প্রবন্ধকারের। কবির কোনো প্রসাদগুণ থাকা অনাবশ্যক, পাঠক-কেই নিজগুণে বা বিশ্বকোষ ঘেঁটে কবিতার মর্মোদ্‌ঘাটন করতে হবে। মনে হয় এঁরা যেন ধরেই নিচ্ছেন যে পদ্যরচনা পড়বার বেলায় পাঠক হয়ে উঠবেন বিশিষ্ট এবং সর্ববিদ্যাবিশারদ, আর গদ্যরচনা পড়বার বেলায় হয়ে যাবেন সাধারণ অর্থাৎ যে-কোনো 'দুরূহ' বিষয়ে প্রবেশাধিকারের অযোগ্য। তেমন সাধারণ পাঠককে যদি গদ্য-প্রবন্ধকার তাঁর প্রসাদগুণেই প্রসন্ন করতে না-পারেন তা হলে সেই লেখকের 'শির লে আও'। প্রাক্তন কাব্যের অনুরাগীরা এ-দাবি করলে তবু তাঁদের দাবিতে একটা সামঞ্জস্য থাকে, বলা যায় তাঁরা সর্বত্রই সহজিয়াপন্থী, সরল রেখায় চলতে অভ্যস্ত। কিন্তু আধুনিক কবি ও কাব্যানুরাগীদের মুখে এ হেন দাবি বড়ো অদ্ভুত শোনায়।

সাম্য ও স্বাধীনতা

রাজদণ্ডের হাতবদল কিংবা শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদ যদি আকস্মিকভাবে ঘটে এবং কিছুটা রক্তপাত ঘটায় তা হলে তাকে আমরা বিপ্লব আখ্যা দিয়ে থাকি। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফী বছর এমন দুটো-চারটে বিপ্লবের খবর সংবাদপত্রের শিরোনামায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—অথবা তাও করে না। তাই রুশ বিপ্লবকে শুধু বিপ্লব বললে মনে হয় যেন তাকে বড়ো ছোটো করে দেখা হলো। পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ জুড়ে ১৮ কোটি মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি স্তরকে ঢেলে সাজাবার যে অসাধ্যসাধনব্রতী চেষ্টায় লেনিনের দল প্রাণ পণ করেছিলেন তা নিশ্চয়ই বিপ্লবাদপি গরীয়সী, মহাপ্রলয় ও মহাসৃষ্টির এক অপূর্ব সংগম। এর সুগভীর এবং সুদূরপ্রসারী সাফল্য দেখে আমরা যদি ভেবে থাকি যে, সে-সাফল্য অসীম, তাতে কোথাও কোনো অসংগতি বা অসম্পূর্ণতা নেই, যদি সোভিয়েট ভূমিকে মর্তের স্বর্গ জ্ঞান করে আমাদের সমস্ত আদর্শ ও অভিলাষকে তারই সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে থাকি, তা হলে দোষ দেওয়া যায় না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমিও এতে কোনো দোষ দেখিনি।

ধর্মতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সভ্যতা থেকে আমাদের দৃষ্টি ফিরে এসে নিবদ্ধ হয়েছে শ্রমতান্ত্রিক সভ্যতার উপর, যে-সভ্যতা ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনায় আজ রত্নগর্ভা। ঐ-সভ্যতাকে আমরা যে-চোখে দেখব তাতে আবেগ এবং শ্রদ্ধা থাকা যেমন স্বাভাবিক, তীক্ষ্ণ সমালোচনার আমেজও তেমনি অত্যাবশ্যক। কারণ সেটা আত্ম-সমালোচনা, আমাদেরই পথের সন্ধান। অগ্রগামী ইতিহাস যে-পথকে পরিত্যাগ করে আগাছায় ঢেকে ভিন্ন দিকে চলে গিয়েছে তার সম্বন্ধে আমাদের বিচারশক্তি অলস হলেও কিছু এসে যায় না। কিন্তু যে-পথ বিশেষ করে আমাদেরই যাত্রার পথ, কোথায় তা উপলবন্ধুর কোথায়-বা কণ্টকাকীর্ণ, কোনোখানে গন্তব্যের দিকে সোজা না-এগিয়ে ডাইনে বাঁয়ে অযথা দিশাহারা হয়েছে কিনা—এইসব তত্ত্বের সন্ধানে যাঁরা একটু বেশী তৎপর তাঁদেরকে এর-ওর দালাল বলে গালিগালাজ করেন যাঁরা, তাঁরা কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে, গতি আর প্রগতির মধ্যে তফাত শুধু একটি অক্ষরের নয়? সাম্যতন্ত্রী নব সভ্যতা যে-রূপে প্রতিভাত হয়েছে

তার মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে কি না সেটাই আজ আমাদের বিচার্য; জরাজীর্ণ পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যিকতার নোঙরামির লম্বা ফর্দ নিয়ে মালা জপবার দিন নিশ্চয়ই গিয়েছে।

ইতিহাসের অক্ষয় কীর্তিভাণ্ডারে রুশ বিপ্লবের স্থান হবে কি না যাচাই করবার জন্য লাস্কি* কতগুলো শর্তের উল্লেখ করেছিলেন: যদি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নূতন সমাজ-সংগঠনের সফল চেষ্টার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উৎপাদনযন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানা তুলে দিলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অচল হয়ে যায় না, বরঞ্চ তার গতি হয় আরো স্বচ্ছন্দ ও মসৃণ; প্রমাণিত হয় যে বেকার-সমস্যার সম্যক্ এবং স্থায়ী সমাধান একমাত্র শ্রেণীহীন রাষ্ট্রেই সম্ভবপর, সুতরাং মুনাফার লোভ সমাজ-সংস্থানে কেবল বাহুল্য নয়, রীতিমত অন্তরায়; প্রমাণিত হয় যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফসল আপামর সাধারণের ভোগেও আসতে পারে; প্রমাণিত হয় যে ফলিত বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কার শ্রমিক শ্রেণীর ভীতির কারণ নয়, ভরসার স্থল; যদি প্রমাণিত হয়…। কিন্তু সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এসমস্ত প্রমাণই দিয়েছে, বরঞ্চ পরীক্ষকের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে বহুদূর। এ-যাবৎ অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার মূল প্রেরণা ছিল লোভ, শেষ লক্ষ্য ছিল লাভ। সোভিয়েট সাম্যবাদ এই অসুরদ্বয়কে বধ করে অর্থনীতির সঙ্গে চরিত্রনীতিকে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করেছে। পরার্থপরতার যে সহজাত বৃত্তিগুলি ধনিকচালিত দেশে অবদমিত থাকে কিংবা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত দান-খয়রাতের নালা-ডোবায় সামান্য একটু ছাড়া পায়, তাকে রাষ্ট্রের বিশাল সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গায়িত করে তুলে মানবজাতির অভাবনীয় উৎকর্ষের দ্বার খুলে দিয়েছে রুশ বিপ্লব।

ওয়েব-দম্পতির ভাষায় বলতে গেলে সোভিয়েট সাম্যবাদ সম্পূর্ণ এক নূতন সভ্যতা। অতীত ও বর্তমানের সমস্ত সভ্যতা থেকে এই সভ্যতার কয়েকটি মৌলিক প্রভেদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁরা: ১. লোভের নাগপাশ থেকে সমাজ-জীবনকে মুক্ত করা; ২. একমাত্র জনগণের অভাব-মোচনকেই পণ্যোৎপাদনের চরম লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা; ৩. সোভিয়েট ব্যবস্থা, অর্থাৎ রাজনীতি-ক্ষেত্রে এক অভিনব নির্বাচন-পদ্ধতির আবিষ্কার; ৪. রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এমন-একটি সংঘের উদ্ভব যার প্রত্যেক সদস্য জনগণের কল্যাণকেই তাঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত করেছেন; ৫. বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে সামাজিক উন্নতির ঘনিষ্ঠ

* ***Reflections on the Revolutions of Our Time*, p. 76.**

সংযোগ স্থাপন ; ৬. পারত্রিক মঙ্গলের ভরসায় ঐহিক জীবনকে পঙ্গু করে রাখার বিরুদ্ধে দেশজোড়া প্রচেষ্টা ; ৭. প্রত্যেক নাগরিকের মনে এক নূতন তীব্র সামাজিক চেতনা ও বিবেকের উদ্‌বোধন যাতে সে উপলব্ধি করতে পারে যে সমাজের কাছে সে কতখানি ঋণী, এবং এই ঋণশোধের দায়মোচনের জন্য সে যদি তার সমস্ত শ্রম ও শক্তি নিয়ে এগিয়ে না-আসে তবে সে মানুষ বলে গণ্য হবার যোগ্য নয় ; ৮. বর্ণগরিমা, বংশমর্যাদা, ধনমান বা পদগৌরব—এসমস্ত ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।

অর্থাৎ, সংক্ষেপে বলতে গেলে, সামাজিক পরোৎকর্ষের দুই মহান আদর্শ—সাম্য ও সৌভ্রাত্র, ফরাসী বিপ্লব যাকে কল্পনার দিগন্তে বিলীয়মান একটুখানি হাতছানির আকারেই রেখে দিয়ে গিয়েছিল, তাকে রুশ বিপ্লব মর্ত্যভূমিতে নামিয়ে রক্তমাংসের রূপ দিতে অনেক পরিমাণে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু স্বাতন্ত্র্য, আত্মবিকাশ ও প্রকাশের স্বাধীনতা?

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে লিবার্টির স্থান কী, সেটা জানতে হলে প্রথমেই সিডনী ও বীয়েট্রিস্ ওয়েবের শরণ নেওয়া দরকার। সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার কাজে এঁদের পরিশ্রম ও প্রতিভার তুলনা নেই। সোভিয়েট সভ্যতার এঁরা একাধারে সকলের চেয়ে দরদী, এমন-কি উচ্ছ্বসিত ভাষ্যকার। সেই ১২০০ পৃষ্ঠাব্যাপী উচ্ছ্বাসের স্বর কেটেছে কেবল একটি জায়গায়, স্বাধীনতার প্রসঙ্গে :

'Far more serious, in its possible danger to future progress in social evolution, is the continuance in the USSR of the deliberate discouragement and even repression, not of criticism of the administration, which is, we think, more persistent and more actively encouraged than in any other country, but of independent thinking on fundamental social issues, about possible new ways of organising men in society, new forms of social activity, and new developments of the socially established code of conduct. It is upon the power to think new thoughts, and to formulate even the most unexpected fresh ideas, that the future progress of mankind depends. ...The fatal feature of this disease of orthodoxy is that it is highly infectious. It spreads rapidly to men and women of all occupations, to teachers and students

of all types of culture, injuring their intellectual integrity and cramping their creative powers, not only in the social sciences, but also in music and drama in literature and architecture. (*Soviet Communism.*, vol. II, p. 1212.)

পরবর্তী প্যারাগ্রাফে ওয়েবরা দুঃখ করে বলেছেন যে, স্বাতন্ত্র্য-স্থাপনের যেটুকু আশা সম্প্রতি দেখা গিয়েছিল তা আপাতত ব্যাহত হয়েছে কারণ নাৎসী শক্তি দ্রুত প্রসার্যমান, রাষ্ট্র বিপন্ন। তার পরে যুদ্ধ বাধল এবং থামল। সোভিয়েটের জয়কে আমরা স্বাধীনতার জয় বলেই মানলাম। কিন্তু আজও ব্রাত্য শিল্পী, সাহিত্যিক, ভাবুকের কণ্ঠ রুদ্ধ, বরঞ্চ আরো কঠিনভাবে রুদ্ধ—ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক কর্মীর তো কথাই নেই। কারণ তৃতীয় মহাযুদ্ধ সমাসন্ন। অতঃপর চতুর্থ মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা যথাসময়ে দেখা দেবে, কিংবা রাষ্ট্রবিপ্লব, কিংবা ঐরকম গুরুতর কিছু, এবং স্বাধীনতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী শূন্যচারিণীই থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট সাম্যবাদের একজন অকুণ্ঠ গুণগ্রাহী ছিলেন। অন্যসব বিষয়ে তাঁর চিঠিগুলি সোভিয়েট সাধনার গুণব্যাখ্যানে কাব্যানুরঞ্জিত, কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নিরোধ দেখে তিনিও ব্যথিত হয়ে 'রাশিয়ার চিঠি'র উপসংহারে লিখলেন: 'দেহে দেহে পৃথক বলেই মানুষ কাড়াকাড়ি হানাহানি করে থাকে, কিন্তু সব মানুষকে এক দড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সমস্ত পৃথিবীতে একটিমাত্র বিপুল কলেবর ঘটিয়ে তোলবার প্রস্তাব বলগর্বিত অর্থতাত্ত্বিক কোনো জার-এর মুখেই শোভা পায়। বিধাতার বিধিকে একেবারে সমূলে অতিদিষ্ট করবার চেষ্টায় যে পরিমাণে সাহস তার চেয়ে অধিক পরিমাণে মূঢ়তা দরকার করে।··· অসম্ভব নয় যে, বর্তমান রুগ্‌ণ যুগে বল্‌শেভিক নীতিই চিকিৎসা, কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে সেইদিনই রোগীর শুভদিন।' ('রাশিয়ার চিঠি', পৃ. ১৭০, ১৭৫।) এটা লেখা হয়েছিল ১৯৩০ সালে। তার পরে উনিশ বছর কেটে গেল, ইতিমধ্যে ডাক্তারি শাসন আরো কড়া হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে যে সে-শাসন শিথিল হবে বা ডাক্তার বদল হবে তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

সোভিয়েট সভ্যতার সমর্থন ও সুখ্যাতি করে দুখানা বই লিখেছেন লাস্কি, নিজের পার্টির পররাষ্ট্র-নীতিতে সোভিয়েট-বিরোধিতার তীব্র সমালোচনা করেছেন বহুবার। ইংরেজ সরকারের অপপ্রচারক বলে তাঁর মতামত উপেক্ষা করা বাতুলতা। সোভিয়েট রাষ্ট্রে স্বাধীনতা প্রসঙ্গে লাস্কির অভিমত এই: 'বিপ্লবের তিরিশ বৎসর

পরেও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পুরোদস্তুর ডিক্টেটরিই রয়ে গেছে। এটা সমস্ত পৃথিবীর স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রের গভীর বেদনা ও আশাভঙ্গের কারণ হয়েছে।··· শাসকমণ্ডলীর আপ্তবাক্য ও মৌল বিশ্বাসের কোনোরূপ সমালোচনা করবার স্বাধীনতা সেখানে নেই। অন্য কোনো পার্টি গঠন করে কমিউনিস্ট পার্টিকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থেকে অপসারিত করবার স্বাধীনতা সেখানে নেই। ডিক্টেটরদের বিবেচনায় যাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হবার আশঙ্কা আছে এমন-কোনো মতামত প্রচার করবার জন্য কোনো পত্রিকা বা পুস্তক ছাপবার বা সভা-সমিতি ডাকবার অধিকার কারো নেই। কোনো সোভিয়েট নাগরিক যদি মার্কসের দর্শনকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেন, কিংবা তাঁর প্রতিপাদ্য হয় যে লেনিনের কর্মনীতির প্রকৃত উত্তরাধিকারী ত্রৎস্কি ছিলেন, স্তালিন নয়, তা হলে খুব দ্রুত পদক্ষেপে সে-নাগরিককে নির্বাসন বা কারাগারের দিকে এগুতে হবে। চিত্র, নাট্য, সংগীত, সিনেমা প্রভৃতিকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রচারের যন্ত্র বানিয়েছেন; তার ফল কোথাও হাস্যকর হয়েছে, কোথা-ও-বা মর্মন্তুদ।' ('স্বাধীনতা ও আধুনিক রাষ্ট্র', ১৯৪৮ সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. ৪১।)

এম. এম. লুইস্ একজন নিরপেক্ষ সমাজতাত্ত্বিক, বরঞ্চ সোভিয়েট সাম্যবাদের গুণগ্রাহী ও পক্ষপাতী বলেই পরিচিত। তিনি লিখছেন: 'রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে হৃদয়ঙ্গম করে সে-উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নিজের সমস্ত শক্তি ও উদ্যম ঢেলে দেবার স্বাধীনতা সোভিয়েট নাগরিকের আছে, কিন্তু তার বিরোধিতা করবার অধিকার তার নেই।··· একটি ছক-কাটা সামাজিক পরিকল্পনার গণ্ডির মধ্যে কাজ করবার স্বাধীনতা তার আছে, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির বাইরে কোনো দল গঠন করবার কিংবা পার্টির মতামতের সঙ্গে খাপ খায় না এমন-কোনো মত প্রকাশ করবার স্বাধীনতা তার নেই।' ('সমাজে ভাষার স্থান', পৃ. ১৫৪।)

পৃথিবীর আর একজন সেরা সাহিত্যিক ছিলেন সর্বান্তঃকরণে সোভিয়েটভক্ত—আঁদ্রে জীদ্। কিন্তু সোভিয়েট সভ্যতার প্রকৃত রূপ সরেজমিন দেখতে গিয়ে তাঁর ভক্তি হুঁচোট খেল, ফিরে এসে দ্ব্যর্থসূচক নাম দিয়ে তিনি যে ছোটো বইখানা লিখলেন—'সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যাবর্তন', সেটা যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই লক্ষ করে থাকবেন কত উদ্‌বেলিত শ্রদ্ধা ও উৎসাহ নিয়ে জীদ্ সোভিয়েট রাষ্ট্রে গিয়েছিলেন এবং কী বেদনার্ত হতাশা তাঁকে লিখতে বাধ্য করল:

'I doubt whether in any country in the world, even Hitler's Germany, thought be less free, more bowed down, more fearful (terrorised), more vassalised.'* (*Back from the* USSR, p. 62.)

সিডনী ও বিয়েট্রিস ওয়েব, রবীন্দ্রনাথ, লাস্কি, জীদ্ এবং লুইস্—এঁরা সবাই ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের বা পুঁজিপতিদের টাকা খেয়ে কিংবা নিজেদের সম্পত্তিরক্ষার নিগূঢ় বাসনার বশীভূত হয়ে পূর্বোক্ত কথাগুলি বলেছেন, এ-কথা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া যে-কালে কোনো ব্যক্তিতে বা সমাজে দেবত্ব আরোপ করতে আমি অপারগ, তখন আপাতত এ-বিশ্বাসটাই যুক্তিসংগত ঠেকে যে সোভিয়েট ব্যবস্থাও অপাপবিদ্ধমস্নাবির নয়, এবং তার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে ব্যক্তিস্বাধীনতার অপহরণ।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা আদৌ সংকুচিত নয়, বরঞ্চ আরো পরিপূর্ণ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ; অথবা সংকুচিত হলেও অত্যন্ত সংগত কারণেই হয়েছে—এই উভয়-বিধ কথা আজকাল খুব জোর গলায় বলা হয়। যাঁরা বলেন তাঁরা সাধারণত যুক্তি-তর্কের ধার দিয়ে যান না। তবু যে-যুক্তিগুলি তাঁদের পক্ষ থেকে উঠেছে বা উঠতে পারে তার আলোচনা হওয়া আবশ্যক :

১ সমষ্টিবাদ

স্বাধীনতার জন্য ছটফট করাটা বুর্জোয়া মনের বিকার। বুর্জোয়ারা হাড়ে-হাড়ে আত্মকেন্দ্রিক। জানে না যে জীবনের পরম সার্থকতা ব্যক্তিস্বরূপের বিকাশে নয়, ব্যক্তিকতার বাঁধ ভেঙে নিজেকে বিপুল জনসমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়াতে। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে'—এটা হলো দেউলে সভ্যতার আত্মাভিমানী কবির বাণী। নূতন কালের সমাজ-প্রাণ কবি লিখবেন, 'তোমার ডাক শুনে জনগণ আসবে এ-চেষ্টা শ্রেণীস্বার্থ-প্রণোদিত। জনগণের ডাক শুনেই তোমাকে চলতে হবে ; জনবহুল পথই তোমার পথ। জনতার অনাহারক্লিষ্ট, অশিক্ষা-ভীরু কণ্ঠের আহ্বান যদি তোমার কানে এসে না-পৌঁছয় তবে মিছিলের পুরো-ভাগে আছে পার্টি। তার কণ্ঠ ক্ষীণ নয়, ডাকে কোনো দ্বিধা নেই। পার্টির নির্দেশই চরম, কর্মক্ষেত্রে যেমন সৃষ্টিক্ষেত্রেও তেমনি।'

কর্মক্ষেত্রে হয়তো চরম, কিন্তু সৃষ্টিক্ষেত্রে স্রষ্টার অন্তরে বাইরের কোনো অবান্তর নির্দেশ চরম হতে পারে না। হেগেলই প্রথম বলেছিলেন যে, ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশ রাষ্ট্রের প্রতি অধীনতার পূর্ণ স্বীকৃতিতে ; স্বাধীনতা ও অধীনতা ব্যষ্টি ও

* (আমার মনে হয় না যে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে, এমনকি নাৎসী জার্মানিতেও, চিন্তা এত পরাধীন, এত নতজানু, এত পদানত, এত ভয়ার্ত।)

সমষ্টি—এসমস্ত সম্পর্ক ডায়ালেক্‌টিক্‌ধর্মী, বিরোধের মধ্যেও তারা এক। কিন্তু এই একীকরণটা ছিল একতরফা, কারণ হেগেলীয় (এবং মার্কসীয়) সমাজ-দর্শনে ব্যক্তির চেয়ে সমাজ অধিকতর সত্য, পূর্ণতর মূল্যের আধার; ব্যক্তিকে সত্য বলে মানা যায় সেই পরিমাণে যে-পরিমাণে সে সামাজিক সত্তার প্রতিবিম্ব বা প্রতিভূ। আদর্শের ক্ষেত্রে মার্কস্ যদিও এর প্রতিবাদ করে ঘোষণা করলেন যে সাম্যবাদের লক্ষ্য 'এমন এক মানব-সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা যেখানে প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন বিকাশের উপরই নির্ভর করবে মানব-সমষ্টির স্বাধীন বিকাশ', কিন্তু সে-আদর্শ রইল কোনো-এক সুদূর স্বপ্নময় ভবিষ্যতের গর্ভে। আপাতত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে, এবং সোভিয়েট ভক্তদের মধ্যে ('রাশিয়ার চিঠি'র ভাষায়) 'সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ব্যষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব' নির্বিবাদে মেনে নেওয়া হয়েছে।

ব্যষ্টির স্বৈরাচার সমষ্টির পক্ষে, ফলত ব্যষ্টির পক্ষে, কল্যাণকর হতে পারে না। কিন্তু স্বাধীনতা মানে তো স্বৈরাচার নয়। স্বাধীনতার একটা সুনির্দিষ্ট সীমানা বুর্জোয়া উদারপন্থীরাও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছিলেন। আমার স্বাধীনতার দাবি যেখানে আর-দশজনের কিংবা আর-একজনের স্বাধীনতার দাবিকে লঙ্ঘন করে সেইখানে তার পাকা সরহদ্দ। এই সরহদ্দের মধ্যেও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বহুবিচিত্র প্রকাশ সম্ভবপর। ব্যক্তিস্বরূপের সবচেয়ে গভীর এবং মূল্যবান অভিব্যক্তি মানুষের সৃষ্টিক্ষেত্রে, শিল্পে সাহিত্যে দর্শনে বিজ্ঞানে। কোনো স্পর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ যদি এই সৃষ্টিক্ষেত্রের উপর পরিকল্পনার ছক কেটে বিধিনিষেধের বেড়া তুলতে শুরু করেন* তবে তাঁরা ধীরে-ধীরে কিন্তু দুর্নিবার বেগে সৃষ্টিক্ষেত্রকে মরুক্ষেত্রে পরিণত করবেন। দস্তয়েফস্কি থেকে আরম্ভ করে জোশ্চেন্‌কো, শস্তাকভিচ্, আলেক্‌জানদ্রভ,

* নিখিল বিশ্ব সাম্যবাদী শিল্পী ও লেখক সম্মেলন, খারকভ অধিবেশন, ১৯৩০-এ গৃহীত প্রস্তাবাবলী :

1. Art is a class weapon.

2. Artists are to abandon individualism and the fear of strict discipline as petty bourgeois attitude.

3. Artistic production is to be systematised, organised, collectivised and carried out according to the plans of a central staff like any other soldierly work.

4. This is to be done under the careful and yet firm guidance of the Communist Party. ইত্যাদি।

ভার্গা, ভার্ভিলভ্ প্রভৃতি প্রতিভাবান স্বদেশী শিল্পী ও বিজ্ঞানীর উপর যে-রাজদণ্ড উদ্যত হয়েছে (এলিয়ট, ডস্ প্যাসস্ ইত্যাদি বিদেশী মহৎ সংস্কৃতি-কর্মীদের অশ্লীল লাঞ্ছনার কথা না-হয় বাদই দিলাম) সেটা মরুযাত্রার উদ্যোগপর্ব।

'যা নূতন, সম্ভাবনা-গর্ভ, প্রথা-বহির্ভূত, অভ্যাস-ভঙ্গকারী, তা কখনো অধিকাংশের অনুমোদন লাভ করতে পারে না—সে অধিকাংশের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি থাকলেও। তাঁরা সন্তুষ্ট হন তাতেই যেটা তাঁদের সুপরিচিত, অর্থাৎ যা মামুলি। মনে রাখা দরকার যে ঠিক যেমন বুর্জোয়াগন্ধী মামুলিত্বের রেওয়াজ ছিল এককালে, আজ তেমনি বিপ্লবগন্ধী মামুলিত্বের দিন এসেছে। এ-কথা ভুললে চলবে না যে, আর্টের সবচেয়ে বড়ো গুণ (যে-গুণ থাকলে আর্ট শাশ্বতকালের বরমাল্য পায়) কোনো-একটি চল্‌তি মতবিশ্বাসের অন্ধ আনুগত্য নয়—সে-মতবিশ্বাস যত ন্যায্য এবং গ্রাহ্যই হোক-না কেন। সে-গুণ নির্ভর করে এমন-সব প্রশ্ন উত্থাপনের উপর যা ভবিষ্যতের প্রশ্নোত্তরের পথ-নির্দেশক—সেই প্রশ্ন যা এখনো সাধারণের মনে জাগেনি, এবং সেই উত্তর যার বহিঃরেখা এখনো কারো চোখে স্পষ্ট নয়। আর্ট যদি স্বাধীন না-হয় তবে তার কোনো সার্থকতা নেই, কোনো মূল্য নেই।' (আঁদ্রে জীদ্)

প্রায় সমস্ত প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ও জ্ঞানানুসন্ধানী নিজের দেশকালপাত্রের মধ্যে খানিকটা খাপছাড়া, কারণ তাঁরা বৃহত্তর দেশকালপাত্রের মানুষ। অনিবার্যরূপে তাঁদের মধ্যে অনেককে পাঠক সমালোচক ও রাজপুরুষদের উপেক্ষা, এমনকি সক্রিয় প্রতিকূলতার মধ্যে বাস করতে হয়েছে, অনেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবমাননাই কুড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু অন্তত গেল দুশো বছরের মধ্যে কোনো অখণ্ড প্রতাপশালী শাসনযন্ত্র রাষ্ট্র ও সমাজের প্রত্যেকটি কক্ষে অনুপ্রবিষ্ট তার শক্তির জগদ্দল পাথরের তলায় ব্রাত্য (non-conformist) শিল্পী ও বিজ্ঞানীদের পিষে ফেলবার জন্য উদ্যোগী হয়নি। যদি হতো তা হলে আমাদের শিল্পসাহিত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারে আজ কতটুকু সঞ্চয় থাকত? সমাজ-হিতৈষীদের হাতে যদি ডিক্টেটরী ক্ষমতা দেওয়া হতো তা হলে কি ডারউইন, মার্কস্, শেলী, কীট্‌স্, মোপাসাঁ কিংবা রবীন্দ্রনাথ (আরো অসংখ্য নাম করা যেতে পারে) পরবর্তী কালের কাছে এসে পৌঁছতে পারতেন? উত্তরে বলা হয় যে, ভার্গা, জোশ্চেন্‌কো, শস্তাকভিচ্ প্রভৃতি এখনো বহাল তবিয়েতে আছেন, এবং তাঁদের সৃষ্টিকার্যের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। এতে সান্ত্বনা পাইনে, কারণ এঁদের ব্রাত্যতার পরিমাণ কতটুকু? এঁরা তো পনেরো আনাই সোভিয়েট রাষ্ট্রের চল্‌তি মত ও পথের অনুগামী; যত লাঞ্ছনা সে কেবল

বাকি এক আনার জন্যই। কোনো দুঃসাহসিক সোভিয়েট দার্শনিক বা শিল্পী যদি সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিকে আরো মৌলিকভাবে প্রত্যাখ্যান করে সম্পূর্ণ নূতন কোনো জীবনদর্শনের উপর তাঁদের চিন্তা ও শিল্পরচনার ভিত গাড়তেন (মার্কস্ কি বোদ্-লেয়ারের মতো, কিংবা বর্তমান কালের আরাগঁ কি ফ্রয়েডের মতো) তবে আজ তাঁদের নামও সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভিতরে বা বাইরে কেউ জানত না।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাবিস্তার ও সংস্কৃতিচর্চা বিপুল উদ্যমে চলছে, শুনে সংস্কৃতি-অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রই গভীর আনন্দ ও আশার মধ্যে এই নূতন সভ্যতাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমেই দেখা যাচ্ছে—বিশেষত ১৯৪৮ সাল থেকে যে, সংস্কৃতির উপর সরকারি দপ্তরের ছাপ গভীরভাবে চিহ্নিত, এবং 'শিক্ষা-বিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে—কিন্তু ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না।' ('রাশিয়ার চিঠি')

২ স্বাধীনতার ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক শর্ত

'শুধু প্রাণধারণের গ্লানি'র গুরুভারে যাদের মেরুদণ্ড ভেঙেছে, আইনের বইতে তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবি যত মোটা অক্ষরেই স্বীকৃত হোক, সেটা তাদের কাছে সূক্ষ্ম পরিহাস ছাড়া আর-কিছু নয়। সোভিয়েট শাসনতন্ত্র নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকের জীবিকানির্বাহের স্থায়ী নিরাপত্তা, কর্মজীবনান্তে পেন্সন, সন্তান-পালন, আরোগ্য-বিধান, অবসর-বিনোদন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—জীবনের যাবতীয় স্তরকে সরকারি পরিকল্পনা-সঞ্জাত অতি উত্তম ব্যবস্থার মধ্যে এনে সমাজের এই বিরাট নিঃসহায় অংশকে প্রকৃত স্বাধীনতার আস্বাদ দিয়েছে।

সত্য কথা, কিন্তু আংশিক সত্য। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ যা করেছেন সেটা খুব মহৎ কাজ, একেবারে অপরিহার্য কাজ; কিন্তু তাই স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা-সম্ভোগের দুটি মূল শর্ত আছে—একটি ভাবাত্মক এবং অপরটি অভাবাত্মক। ভাবাত্মক শর্তটি হলো অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, সাধারণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, এবং সর্বোপরি, জীবিকা-উপার্জনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা। যতদূর জানা যায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত অধিবাসীর পক্ষে এই শর্তগুলি অনেক পরিমাণে পরিপূরিত হয়েছে, ত্রুটি যা আছে তার সংশোধনের জন্য শাসনব্যবস্থা যথেষ্ট তৎপর। এ-শর্তগুলি স্বাধীনতালাভের পক্ষে অত্যাবশ্যক, কিন্তু পর্যাপ্ত নয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের নাগরিকরা অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার দিক থেকে যতই এগিয়ে যান, শুধু তার ফলে তাঁরা স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন না, হননি। কারণ স্বাধীনতার অপর শর্তটি সেখানে খুব ঘটা করেই

নাকচ করা হয়েছে। সে-শর্তটি হলো মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পথ থেকে সমস্ত অন্যায় বিধিনিষেধের সম্পূর্ণ তিরোভাব। 'অন্যায়' বলতে এখানে সেইসব বিধি-নিষেধকে বোঝায় যা অপরের স্বাধীনতারক্ষার জন্য একান্ত এবং স্পষ্টত আবশ্যক নয়। ভাব ও রসের জগতে সমস্ত বিধিনিষেধ এই 'অন্যায়' পর্যায়ভুক্ত।

তুলনায় ইংলণ্ড বা সুইডেনের কথা ধরা যাক। সেখানকার চাষী-মজদুরের আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য, অব্যবস্থা এবং অনিশ্চয়তা তাদের পক্ষে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা-সম্ভোগের অন্তরায়। কিন্তু বাকি যারা—এদের সংখ্যা আমাদের দেশের মতো অত্যল্প নয়, ধনিক উচ্চমধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত নিয়ে এরা সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ—তাদের বেলা স্বাধীনতার ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক উভয়বিধ শর্তই অনেক দূর পর্যন্ত পালিত হচ্ছে। সত্য ও সুন্দরের নিত্যনবরূপের সন্ধান তারা একটি-মাত্র পাকা সরকারি সড়কে করতে বাধ্য নয়, তাদের মনের সামনে জিজ্ঞাসা ও নিরসনের সমস্ত রাস্তাই খোলা আছে। নীডহ্যাম, হল্ডেন, জোলিওকুরী, লাঁজ্‌ভ্যাঁ, পিকাসো প্রভৃতি সরকারি মতের অন্তিম বিরোধীরাও উচ্চতম সম্মানে বিভূষিত। এ-কথা ঠিক যে পাশ্চাত্যের শ্বেত জাতিগুলি নিজেদের দেশে স্বাধীনতারক্ষায় যেমন উদ্যমশীল, অ-শ্বেত জাতির স্বাধীনতা-সংহরণে তেমনি রক্তাক্ত। এবং তাদের দেশেও মূঢ় রাজশক্তি যে মাঝে-মাঝে ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশকে পদদলিত করে না তা নয়। ইদানীং হওয়ার্ড ফাস্টের মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিককে মার্কিন সরকার বিনা বিচারে বন্দী করে রেখেছেন ; প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাসেলের মতো দুর্লভ প্রতিভাকে শান্তি-প্রচেষ্টার জন্য কারাবরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু চিত্তের এই নিরোধকে সেখানকার সমস্ত সংস্কৃতিবান ও বিবেকশীল ব্যক্তি ধিক্কৃত করেন, বাহবা দেন না। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতার অপহরণ এর চেয়ে অনেক ব্যাপক, অনেক নির্দয়। লেশমাত্র ব্রাত্যতা সেখানে সহ্য হয় না। অথচ এই বলদৃপ্ত চিত্তের অনুদারতাকে ধিক্কার দেবার মতো সাহস সেখানে কারো নেই।

পাশ্চাত্যের মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে-স্বাধীনতার অধিকারী, সাম্যবাদী দেশের সমুন্নত সমাজব্যবস্থার দরুণ সে-স্বাধীনতা সেখানকার প্রত্যেক অধিবাসীর অধিগম্য হবে এই আমাদের প্রত্যাশা—ন্যূনতম প্রত্যাশা। সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠার ৩২ বৎসর পরেও যদি এই প্রত্যাশাকে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের বনান্তরালে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রাখতে হয় তবে নিশ্চয়ই বুঝব যে সে-শাসনব্যবস্থায় গলদ আছে।

৩ সত্যের একচেটিয়া মালিকানা

সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ মতপ্রকাশের কোনো ন্যায্য অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেন-নি। যে-অধিকারকে তাঁরা প্রত্যাহরণ করেছেন সেটা হলো প্রলাপ বক্‌বার, মানুষকে ভুল পথে চালিত করবার অধিকার। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা এ-কথা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, মার্কসীয় দর্শন এবং দৃষ্টিভঙ্গিই একমাত্র সত্য। যে-সমস্ত মতবাদ তার সঙ্গে বেখাপ তা শুধু ভ্রান্ত নয়, মিথ্যা; পাকেপ্রকারে বুর্জোয়া স্বার্থকে সংরক্ষিত বা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার চালবাজী। মার্কস্‌-লেনিনবাদে অনাস্থা আছে যাঁদের এমন শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের লেখনী কিংবা রসনাকে স্বাধীনতা দেওয়া শ্রেণীহীন সমাজের পক্ষে আত্মঘাতের শামিল হবে। সত্যপ্রকাশের, অর্থাৎ মার্কসীয় মত প্রকাশের স্বাধীনতাই হলো প্রকৃত স্বাধীনতা। সে-স্বাধীনতা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে চরমে পৌঁচেছে।

একচেটিয়া মালিকানার মোহ বড়ো দুর্মর, বস্তুর জগৎ থেকে বিতাড়িত হলে ভাবের জগতে গিয়ে আশ্রয় খোঁজে, আস্তানা গাড়ে। সত্যের উপর একচেটিয়া মালিকানার দাবি কিন্তু ইতিহাসে এই প্রথম নয়। যখনই যেখানেই কোনো ধর্মমত আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এই দাবি ছিল তার প্রধান অবলম্বন। সমাজের যে-স্তরে অবমাননা ও নির্যাতন পুঞ্জীভূত হয়ে মানুষের সহনশক্তির সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছে, সেই স্তর থেকে বারংবার নূতন ধর্মের অভ্যুদয় হয়েছে নূতন সত্য ও ন্যায়পরতার রশ্মিরেখা বিকীরণ করে। সেইসব ধর্ম পুরাতন সমাজের প্রবল পক্ষের স্বার্থরক্ষী বিধিবিধানকে ধূলিসাৎ করে তার ভিত্তির উপর অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ক্রমোন্নতির, নূতন পথের সন্ধানের, কোনো ফাঁক রেখে যায়নি, কারণ স্বাধীন বুদ্ধি ও যুক্তির যথোপযুক্ত সম্মান ধর্মের মধ্যে ছিল না। যে-বিশ্ব-নিরীক্ষা নিয়ে তার উদ্‌ভব, বহু দীর্ঘ শতাব্দীর জন্য মানুষের নিরুদ্ধ চিত্তের মরুভূমিতে তারই পিরামিড রচনা করে গেল ধর্ম।

মুসলমানদের বিশ্বাস যে হজরৎ মুহম্মদ ছিলেন খাতেমুন্নবিয়ীন—সর্বশেষ নবী। ইকবাল এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে তখন পর্যন্ত মানুষের বুদ্ধির এতটা উন্মেষ ঘটেনি যে কেবল বুদ্ধির জোরেই মানুষ তার সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত। অতএব যুগে-যুগে প্রয়োজন হয়েছিল এমন-সব মহাপুরুষের যাঁরা ঐশী জ্ঞানের আলোয় মানুষকে সত্য পথ দেখাবেন। কিন্তু ইসলামের অভ্যুথানের সঙ্গে-সঙ্গে সভ্যতার শৈশবকাল গেল কেটে, মানুষের চিত্তবৃত্তি সাবালক হলো। তাই ইসলাম ঘোষণা করল যে হজরৎ মুহম্মদের পর আর কোনো নবী অবতীর্ণ হবেন না,

এখন থেকে মানুষ তার সাবালক মুক্ত বুদ্ধির আলোতেই নিজের উন্নতির পথ খুঁজে নেবে। সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে পাশ্চাত্য ইয়োরোপে চার্চের প্রভাবমুক্ত বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্য দেখে আমাদের আর সন্দেহ রইল না যে অপৌরুষেয় অলৌকিক জ্ঞানের যুগ গিয়েছে, এখন থেকে শুরু হলো যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অপ্রতিহত জয়যাত্রা। বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে আবার সেই ডগ্‌মার পিরামিড-রচনা, জিজ্ঞাসার নিরোধ, বুদ্ধির দাসত্ব! এই পিরামিড ভাঙতে আবার কত শতাব্দী লাগবে, কত শত সহস্র মানুষের রক্তক্ষয় হবে?

মার্কস্‌বাদ অবশ্য দৈববাণীরূপে অবতীর্ণ হয়নি, নিজেকে বিজ্ঞান বলেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। মার্কসের জীবদ্দশায় তাকে বিজ্ঞান বলার সংগত কারণ ছিল। কিন্তু মার্কস্ স্বয়ং চারিদিকে গোঁড়ামির প্রাচীর উঠছে দেখে অধৈর্য হয়ে বলেছিলেন 'দোহাই তোমাদের, আমি মার্ক্সিস্ট নই'। গোঁড়ামির সমুচ্চ প্রাচীর তবু গাঁথা হলো। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র আজ অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তিতে দুর্ধর্ষ, অচিরে সেরা স্থান অধিকার করবে বলে আশা করা যায়। মার্কস্‌বাদ, অর্থাৎ মার্কসীয় দর্শন, মার্কসীয় সমাজতত্ত্ব, মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র, মার্কসীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মার্কসীয় সাহিত্য ও শিল্পনীতি সোভিয়েট সরকারের রাষ্ট্রধর্ম (state religion)। এই বহুবিস্তৃত, প্রায় সর্বগ্রাসী ধর্মমতের কোথাও এতটুকু ফাঁক বা ফাটল সইবে না, সুতরাং বিন্দুমাত্র সন্দেহ জিজ্ঞাসা বা প্রতিবাদ আজ রাষ্ট্রদ্রোহ।

মার্কস্‌বাদ নিয়ে বিস্তর আলোচনা সেখানে অবশ্য চলে, কিন্তু সে-আলোচনা আশ্রমিক (soholastic), বৈজ্ঞানিক নয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্যে মৌলিকতম জিজ্ঞাসার পথও সর্বদা উন্মুক্ত এবং প্রতিবাদ ও প্রগতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যে-তথ্য ও যুক্তি আপাতত পর্যাপ্ত বলে ঠেকে তার উপর নির্ভর করে বিজ্ঞান অনেক সিদ্ধান্তই মেনে নেয়, কিন্তু খোলা মনে, ভুল-ভ্রান্তি অসম্পূর্ণতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব দুই শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও গণনা এবং সূক্ষ্মতম পর্যবেক্ষণের দ্বারা সপ্রমাণিত হয়েছিল—মার্কস্‌বাদের তথাকথিত প্রয়োগ-সিদ্ধির দাবির সঙ্গে তার তুলনা হয় না। কিন্তু কোনো মূঢ় রাজশক্তি যদি ঘোষণা করত যে নিউটনী পদার্থবিজ্ঞানের ছিদ্রান্বেষীরা মতলববাজ, মানুষের সুস্থ বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দেবার যে অবাধ অধিকার তারা দাবি করছে সেটা তাদের কিছুতেই দেওয়া যায় না, তা হলে আইনস্টাইন আজ কারাগারে বসে বেহালা বাজাতেন এবং বিজ্ঞান-জগৎ এ-যুগের শ্রেষ্ঠ উদ্‌ভাবনা থেকে বঞ্চিত থাকত।

'Complete liberty in contradicting and disproving our opinion

is the very condition which justifies us in assuming its truth for purposes of action : and on no other terms can a being with human faculties have any rational assurance of being right.' (Mill, *On Liberty*.)

মার্কস্‌বাদের মধ্যে যেটুকু সত্য রয়েছে তা মুক্ত সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই হওয়া উচিত, যেটা ভ্রান্ত সেটাকে কোনো শ্রেণীবিশেষের নাম করে টি*কিয়ে রাখবার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে এবং আপাতত অনিষ্টকর। অবশ্য ভ্রান্তিও যে মানুষের কাজে লাগতে পারে ইতিহাসে তার প্রমাণ বিরল নয়, বিশেষত একদল লোক যখন আর-একদলকে ভুলিয়ে রাখতে চায় তখন মায়া দিয়েই ভোলায়, সত্য দিয়ে নয়। মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিতে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ অধ্যাত্মবাদ। কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজে তো মিথ্যা দিয়ে কাউকে ভোলাবার দরকার হবে না। তাই মার্কস্‌বাদের মধ্যে যেটা সত্য সেটাই শ্রদ্ধেয়, যা কাজে লাগবে বলে আপাতত মনে হচ্ছে তাকে সত্য বলে প্রচার করা এবং তার সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দেওয়া—এই তো অপ-প্রচার। এ-অপপ্রচারের পিছনেও কায়েমী স্বার্থ রয়েছে—সংরক্ষিত মতবিশ্বাস অর্থাৎ ডগ্‌মার প্রতি স্থবির চিত্তের আসক্তি।

আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস দেখিয়েছে যে-কোনো সংসক্ত বা সংক্ষুব্ধ মনের দ্বারা সত্যলাভ সম্ভব নয়, তার জন্য চাই একান্ত নৈর্ব্যক্তিকতা এবং একনিষ্ঠ সন্ধান। বাস্তব সত্তার যে সাংকেতিক চিত্র চিত্তের মুকুরে রূপায়িত হয় তাকেই আমরা বলি সত্য। চিত্রগ্রাহী মুকুর কিন্তু সম্পূর্ণ সমতল থাকা দরকার। সে-মুকুরকে আবর্জিত করে শোষক সম্প্রদায়ের উপস্থিত সমাজব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার সজ্ঞান ও অজ্ঞান বাসনা। কিন্তু শুধু তাই নয়। উল্টো দিক থেকে তাকে বক্রতল করে শোষিত শ্রেণীর বিপ্লব ঘটাবার উদগ্র প্রয়াস। সংরক্ষণী ও বিপ্লবী তত্ত্বরচনা—দুই-ই আবর্জিত চিত্তের প্রতিচ্ছবি, যথার্থ চিত্র অর্থাৎ সত্য নয়। অবিকৃত সত্য শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে দুর্লভ। সত্যের প্রয়োগ বিপ্লবী ও প্রতি-বিপ্লবী শ্রেণী ভিন্নরকমভাবে করবে, কিন্তু সত্য একই, এবং তার মানদণ্ড বৈজ্ঞানিক, কাজেকাজেই নিঃশ্রেণীক। যেটা শ্রেণীনির্ভর সেটা মায়া বা ভ্রান্তি, সত্য নয়।*

* মার্কস্‌বাদী সিডনী হুকও এ-কথা মানেন 'It would be completely misleading to speak as some Marxists do, of class truths. Truth is above classes.' (*Towards the Understanding of Karl Marx*, p. 99.)

৪ সর্বব্যাপী আনুগত্য

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অব্যাহত রয়েছে। তবু সেখান থেকে কোনো অশাস্ত্রীয় রচনা প্রকাশিত হচ্ছে না তার কারণ শাস্ত্র-বহির্ভূত মত সেখানে অবর্তমান, সবাই সরকারি নীতি, লক্ষ্য ও মতবিশ্বাসকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করে নিয়েছে, সমস্ত দেশের চিত্তে গুরুতর সব বিষয়ে গভীর আনুগত্য বিরাজমান।

এ-কথা মেনে নিতে প্রথম বাধা এই যে তথ্যের সঙ্গে এর গরমিল দেখা যায়। সিডনী ও বিয়েট্রিস ওয়েবের মতো অদ্বিতীয় সোভিয়েট-বিশেষজ্ঞ এবং ভক্তও অস্বীকার করতে পারেননি যে মৌলিক যে-কোনো প্রসঙ্গের আলোচনা সেখানে নিষিদ্ধ, এমনকি **'repressed'** (প্রবন্ধের গোড়ায় দেওয়া উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)। সোভিয়েটের অন্য গুণগ্রাহীরা আরো স্পষ্ট ভাষায় সেখানকার সার্বিক রেজিমেণ্টেশনের প্রতিবাদ করেছেন। দলীয় প্রচারকদের কথা অবশ্য ধরছি না।

উপরের যুক্তিটি মেনে নিতে পারলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের নালিশের হেতু থাকে না, কিন্তু দুঃখের কারণ নিশ্চয়ই থাকবে। তিরিশ বৎসর ধরে একতরফা প্রপ্যাগাণ্ডার স্টিম রোলার চালানোর ফলে কি সমস্ত সোভিয়েট নাগরিকদের চিত্ত মরে গিয়েছে, অনুভবশক্তি অসাড় হয়ে গিয়েছে? কারণ সেই চিন্তাই মূল্যবান যা নূতন, মৌলিক, যা পূর্ব-চিন্তার সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্জন। শিল্পসৃষ্টি মানে স্বকীয় সৃষ্টি; ছাঁচে-ঢালা, ছকে-বসানো সৃষ্টি নয়। অথবা বিংশ শতাব্দীর সোভিয়েট রাষ্ট্রে কি আর-এক সুদীর্ঘ মধ্যযুগের সূচনা হলো, এখন থেকে সমস্ত প্রতিভাবান চিত্ত কেবল মার্কস্‌বাদের ভাষ্য ও টীকা এবং তস্য ভাষ্য ও টীকার গোলকধাঁধায় ঘুরে মরবে, সমস্ত শিল্পী নূতন চার্চ ও ধর্মমতের মহিমা-কীর্তনেই নিজের সৃজনীশক্তিকে ব্যাহত করবেন?

আরেকটি প্রশ্ন। মনের আনুগত্য সোভিয়েট রাষ্ট্রে আজ যদি সত্যই এবং স্বতই সর্বব্যাপী, তবে ডিক্টেটরশিপের প্রয়োজন কী?

৫ সংগঠন ও সমালোচনা

সোভিয়েট-ভক্তদের পঞ্চম যুক্তি এই যে সোভিয়েট সরকার এখন এক মহাসংগঠনের কঠিন সাধনায় নিযুক্ত। এই সাধনার মৌলিক স্বীকার্যগুলির (**assumptions**) প্রতিকূল সমালোচনা করবার অবাধ অধিকার দিলে সমস্ত উদ্যোগ পণ্ড হবে, রাষ্ট্র তছনছ হয়ে যাবে।

কথাটা এমনভাবে বলা হয় যেন এটা দু-চার-দশ বছরের ব্যাপার ; এই অল্প-কালের জন্য স্বাধীনতা প্রত্যাহরণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু কাজটা শেষ হলেই আবার মতপ্রকাশের নির্বিঘ্ন অধিকার সবাই ফিরে পাবে। প্রকৃতির গুপ্ত ভাণ্ডার থেকে ধনাহরণ করে বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কারের সাহায্যে সুপরিকল্পিত একাগ্র চেষ্টায় মানুষের জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করে গড়ে তোলা—এ তো এক অনন্ত সাধনা। কোনোদিন এ-সাধনায় ছেদ পড়বে আমরা তা ভাবতেই পারি না, বরঞ্চ নিত্যনূতন শাখায় পুষ্পে-পল্লবে এর অফুরন্ত বিকাশ সমস্ত সাধকের, অর্থাৎ সমস্ত নাগরিকের উদ্যোগকে দিনে-দিনে আরো প্রাণবন্ত করে তুলবে। সেই অনন্তকাল ধরে কি মানুষ ভাববে না, প্রশ্ন করবে না, বিচার করবে না, যন্ত্রচালিতের মতো কেবল কাজই করে যাবে? কাজের উদ্দেশ্য কী, উদ্দেশ্য-বিচারের প্রতিমাণ কী, যে মহৎ আদর্শের দিকে আমরা এগুচ্ছি তার চেয়ে মহত্তর আদর্শ কিছু আছে কিনা, কোন জীবনদর্শনই বা সে-আদর্শের সর্বাপেক্ষা অনুকূল—এ সমস্ত অত্যন্ত মৌলিক, অত্যন্ত আবশ্যিক জিজ্ঞাসা (প্রত্যেক মানুষের যা জিজ্ঞাস্য), তার উপর শাশ্বতকালের জন্য কি কুলুপ লাগানো থাকবে?

আরো-একটি কথা ভাববার আছে। শিল্পী সাহিত্যিক ভাবুককে তার মনের কথাটি—সে-কথা যাই হোক-না কেন—বলবার অধিকার দিলে যে-রাষ্ট্র তছনছ হয়ে যাবে, কেমন সে-রাষ্ট্র? এদের জাদুকরী শক্তির কথা শুনেছি, কিন্তু কী এমন মায়ামন্ত্র এই খামখেয়ালীদের জানা আছে যেটা উচ্চারণ করামাত্র দেশের কোটি-কোটি লোক তাদের এত সাধের এত সাধনার গড়া রাষ্ট্রকে ভেঙে চুরমার করে দেবে? একটি অবস্থায় অবশ্য এই অঘটন ঘটতে পারে। দেশের অধিকাংশ লোক যদি কঠিন নির্যাতনের মধ্যে তাদের স্তব্ধ বিক্ষোভ বুকে চেপে নিয়ে বসে থাকে, এবং সেই অবস্থায় কোনো নূতন কথার সুর তাদের বিক্ষোভের সুরের সঙ্গে মিলে যায়, তা হলে কোটি-কোটি মানুষের মনের সব কটা তার ঝংকার দিয়ে উঠবে, রাষ্ট্র সত্যই বিপন্ন হবে। সোভিয়েট-ভক্তদের কারো-কারো মনের অজ্ঞাত স্তরে এমন সন্দেহ লুকানো আছে কিনা জানি না। আমার বিবেচনায় এ-সন্দেহ পাগলামি। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে অক্লান্ত সংগ্রাম করে তিরিশ বৎসরের মধ্যে সর্বহারার দেশকে সব-পেয়েছির দেশ না-হোক, অনেক-পেয়েছির দেশ করে তুলেছেন। ভূতপূর্ব ধনিক সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট এবং এখন সম্পূর্ণ অক্ষম মুষ্টিমেয় কতকগুলো লোক ছাড়া বর্তমান সোভিয়েট শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদী যুগে ফিরে যাবার কথা কারো মনে আসতেই পারে না। বিদেশী শত্রুর ভয় অবশ্য আছে,

কিন্তু বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে যে-কোনো মুহূর্তে দেশের সমস্ত জনসাধারণকে প্রাণপণ প্রতিরোধের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করা সহজ। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আরো সহজ, কারণ সে-রাষ্ট্রের প্রতি রাষ্ট্রবাসীদের অনুরাগ অন্যদেশের তুলনায় স্বভাবতই গভীরতর। সুতরাং তার জন্য সমস্ত দেশকে অনির্দিষ্টকাল ধরে যুদ্ধের শিবির বানিয়ে বসে থাকবার দরকার করে না। তবু কেন শিল্পী ও ভাবুকদের উপর এই কড়া শাসন, মৌলিক সমালোচনার, নূতন চিন্তার মুখ এত নির্দয়ভাবে বন্ধ? তার উত্তর সেই পুরানো উত্তর। স্তালিনবাদীদের আত্মম্ভরিতা, পরমত-অসহিষ্ণুতা, নিজের গড়া ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্বের প্রতি মোহ. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য সম্বন্ধে প্রগাঢ় ঔদাসীন্য—এক কথায়, ডিক্টেটরি মেজাজ।

৬ মধ্যবর্তী অবস্থা—ডিক্টেটরশিপ

ষষ্ঠ যুক্তিতে, পঞ্চম যুক্তির মতো কিন্তু তার চেয়ে জোরালো গলায় এবং আরো ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে, স্বীকার করে নেওয়া হয় যে সোভিয়েট সমাজে আপাতত ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোনো স্থান নেই। এটা ডিক্টেটরশিপের সময়, দুই যুগের মধ্যবর্তী কাল। ডিক্টেটরি শাসন মানেই জবরদস্তি, পুরাতনকে জোর করে হটিয়ে দিয়ে নূতনের প্রতিষ্ঠা। 'শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রকে হাত করতে চায় স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য নয়, শত্রুপক্ষকে নিষ্পেষিত করবার জন্য। স্বাধীনতার কথা উঠবে তখনই যখন রাষ্ট্রের পাট তুলে দেবার দিন আসবে।' (বেব্‌লকে লিখিত এঙ্গেলসের পত্র; লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে উদ্ধৃত)।

ডিক্টেটরিশাসন চালাবেন কলকারখানা ও ক্ষেতখামারের কোটি-কোটি মজদুরগণ। একটি বিরাট রাষ্ট্রের অর্থনীতি. রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি মায় সংস্কৃতিকর্ম—শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান—সর্ব বিষয়ে সর্বাধিনায়কত্ব করবার মতো শিক্ষা, যোগ্যতা ও সংগঠন কি আছে তাঁদের? যাঁদের আছে, ডিক্টেটরি ক্ষমতা স্বভাবত তাঁদের হাতেই গিয়ে পড়বে।* পার্টির সভ্যরা জনগণের দ্বারা কিংবা শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা নির্বাচিত নন,

* But admittedly, the administration is controlled, to an extent which it is impossible to measure, but which it would be hard to exaggerate, by the Communist Party, with its two or three millions of members. On this point there is complete frankness. 'In the Soviet Union', Stalin has said and written, 'in the land where the dictatorship of the proletariat is in force, no important political or organisational problem is ever decided by

ঊর্ধ্বতন পরিষদ কর্তৃক মনোনীত। পার্টির ডিক্টেটরশিপের স্বরূপটা কী হবে? স্তালিন বলেছেন ওটা নামেই ডিক্টেটরশিপ, আসলে তা পার্টির লীডারশিপ ছাড়া আর-কিছু নয়। নেতৃত্ব বলতে আমরা যা-বুঝি, সোভিয়েট নেতারা কিন্তু ঠিক তা বোঝেন না:

'The scientific conception of dictatorship means nothing more nor less than unrestricted power, absolutely unimpeded by laws or regulations and resting directly upon force.... Dictatorship means—note this once for all, Messrs Cadets—unlimited power, based on force and not on law.' (Lenin, *Selected Works*, vol. vii, pp. 254, 247.)

এতেও দিশাহারা বোধ করতাম না যদি নিশ্চিতরূপে জানা যেত যে ব্যাপারটা সত্যই এবং একান্তই সাময়িক, দু-এক বছর কিংবা বড়জোর পাঁচ-দশ বছরের মধ্যে পুঁজিপতিরা পর্যুদস্ত হলে এবং রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপিত হলেই এই absolutely unimpeded by laws এবং resting directly upon force শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটবে। কিন্তু সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে গেল বত্রিশ বৎসরের মধ্যে ডিক্টেটরশিপের ভিত্তি আরো পোক্ত হয়েছে দেখে সে-আশার ছলনে ভুলে থাকা দুরূহ হয়ে উঠেছে। মার্কসের লেখা পড়ে আমাদের ধারণা জন্মেছিল যে আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি আয়ত্তের মধ্যে এলে পরে ডিক্টেটরশিপের প্রয়োজন থাকবে না, এমন-কি রাষ্ট্রযন্ত্রই অকেজো হয়ে যাবে, এবং শুকনো ফুলের মতো আপনিই ঝরে পড়বে। কিন্তু সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এখন ঘোষণা করছেন: পৃথিবীর সুদূরতম প্রান্তে ধনতন্ত্রের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাবশেষ টি'কে আছে যতদিন, ডিক্টেটরী শাসন ততদিন বলবৎ থাকবে, আরো বলশালী হবে!

সম্পত্তির মালিকরা যে-কোনোদিন কেবল ভোটের জোরে শ্রেণীহীন সাম্যতন্ত্রী সমাজব্যবস্থাকে শান্তশিষ্ট ভালোমানুষের মতো মেনে নেবে—এই বিশ্বাসকে মার্কস্পন্থীরা ইউটোপীয়ান বলে হাসাহাসি করে থাকেন। কিন্তু কোনো-একটি দলের

our Soviets and other mass organisations, without directives from our Party. In this sense, we may say that the dictatorship of the proletariat is substantially the dictatorship of the Party, as the force which effectively guides the proletariat.' (Sidney and Beatrice Webb, *Soviet Communism*, vol. I, pp. 429, 430.)

হাতে অপ্রতিহত অপরিসীম ক্ষমতা যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হলে এক শুভ প্রভাতে তাঁরা সেই ডিক্টেটরি ক্ষমতাকে শৌখীন পোশাকের মতো ঘৃণাভরে পরিত্যাগপূর্বক গণতন্ত্রের গৈরিক ধারণ করবেন, পূর্ববিশ্বাসের চেয়ে এই বিশ্বাসটা যে কোন অংশে কম ইউটোপীয়ান, মার্কস্ সে-কথা বুঝিয়ে বলেননি। রাজদণ্ড কোনো বংশ বা শ্রেণীবিশেষের হাতে চিরকাল থাকে না, ডিক্টেটরদের হাত থেকেও একদিন খসে পড়বে। কিন্তু খসে পড়বার দিনটাকে ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে দেবার জন্য তাঁরা কি তাঁদের সমস্ত বল ও কৌশল প্রয়োগ করবেন না? রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন শেষ হয়েছে এ-কথা রাষ্ট্রের সর্বময় প্রভুরা কি কখনো মানতে চাইবেন, অথবা কাউকে মানতে দেবেন? গণতন্ত্রের পক্ষে এটাই সর্বপ্রধান যুক্তি, অতি প্রাচীন কিন্তু এখনো অখণ্ডিত।

একধরনের মনোরোগী আছে যারা সোনা-রূপার থলি হাতে নিয়ে রিরংসার হর্ষবোধ করে। এদের কথা বাদ দিলে ধনাঢ্যদের মধ্যে অধিকাংশের ধনলোভ ক্ষমতালোভের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতালাভের উপকরণ মাত্র। ধনহীন ক্ষমতা যাদের হাতে আসবে তাদের মনে ক্ষমতার উপরও চরম বৈরাগ্য স্বতই জেগে উঠবে—এ-প্রত্যাশা কি মানবচরিত্র সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক? সাম্যবাদী কর্মীদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। তাঁদের মনের জোর, আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা—সবই মানি। কিন্তু তাঁরা তো মানুষ। অখণ্ড প্রতাপ হাতে তুলে দিয়ে যদি ভরসা রাখি যে তৎসত্ত্বেও তাঁদের বিন্দুমাত্র নৈতিক অধঃপতন ঘটবে না, ক্ষমতার উপর দুরপনেয় মায়া জন্মাবে না, তা হলে তাঁদের মনুষ্যত্বে নয়, দেবত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। হাফিজের একটি বয়েৎ আছে: কাঠের তক্তার সঙ্গে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে সাগরজলে ভাসিয়ে দিয়েছ আর তীরে দাঁড়িয়ে বলছ—সাবধান, কাপড় যেন না-ভেজে:

'দর্‌মিয়ানে ক্যরে দরিয়া তখ্‌ত-বন্দম্ কর্দই,
বাজ্ মী গুই দামনৎ তর্ ম কুন্ হুশিয়ার বাশ্।'

৭ সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা

স্বাধীনতা-সংহরণের পক্ষে সর্বশেষ কৈফিয়ৎ যা এখানে আলোচনা করা হবে সেটা এই: আজ সন্দেহাতীতরূপে এ-কথা সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্র অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং উন্নতিশীল ব্যবস্থা। কাজেই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনো মতের প্রচার সহ্য করা (একমাত্র সমাজতন্ত্র-বিরোধী মতকেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে

কঠিন হস্তে দমন করা হয়েছে) মানেই খাল কেটে আবার শ্রেণীবিভক্ত সমাজাদর্শের কুমীরকে ঘরে ডেকে নিয়ে আসা।

এটা কৈফিয়ৎই বটে, যুক্তি নয়। তিরিশ বৎসর ধরে সমাজতন্ত্রের অপরিমিত সুখ-সুবিধা ভোগ করে আসছে যারা, ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব, একটি ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধ শ্রেণীর হাতে দেশের সমস্ত সমৃদ্ধি প্রত্যর্পণ করে দেবার প্রস্তাব, তাদের কাছে উদ্ভট পাগলামি ছাড়া আর কিছুই মনে হতে পারে না। সোভিয়েট রাষ্ট্রের শতকরা নিরানব্বইজনের অট্টহাসিই সেখানে ধনতান্ত্রিক পুনরুত্থানের সবচেয়ে প্রবল প্রতিরোধ। বাকি একজন নিজের স্বার্থের গরজে বা তাদের বিদেশী পৃষ্ঠ-পোষকদের তাড়নায় সমাজতন্ত্র ভাঙবার জন্য যতই লাফালাফি করুক, তারা কেবল তামাশারই সৃষ্টি করবে। এই তামাশা বন্ধ করবার জন্য এক বিরাট বহুব্যয়-সাপেক্ষ গুপ্ত পুলিশ বিভাগ এবং দুর্ধর্ষ নিষ্পেষণ যন্ত্রের প্রয়োজন ঘটেছে এ-কথা বিশ্বাস করবার মতো নয়। সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা আসতে পারে দুই দিক থেকে: এক—ভূতপূর্ব ধনিকশ্রেণী এবং তাদের ভাড়াটিয়াদের তরফ থেকে। এবং দ্বিতীয়ত—যারা সোভিয়েট রাষ্ট্রের উপস্থিত সমাজতান্ত্রিকতার স্থবির প্রগতি-বিমুখ রূপ দেখে ধৈর্য হারিয়ে সেটাকে আবার গতিশীল করবার জন্য, সমাজবাদের আরো উন্নত স্তরে নিয়ে যাবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন, তাঁদের ভিতর থেকে। অথবা যাঁরা সমাজতন্ত্র অপেক্ষাও সমুন্নত কোনো সামাজিক ব্যবস্থার কল্পছবি মনের মধ্যে দেখতে শুরু করেছেন; কারণ সমাজতন্ত্রও ইতিহাসের জয়যাত্রার শেষ মন্‌জিল নয়, ধনতন্ত্রের পরবর্তী স্টেশন মাত্র। প্রথম শ্রেণীর বিরোধিতা সোভিয়েট রাষ্ট্রে আজ ভয়ের কারণ হতে পারে না: যেমন এলিয়ট কিংবা মারিতঁ্যার মধ্যযুগপ্রীতি ও সামন্ততান্ত্রিক-বিলাসকে ধনিক সমাজ ভয় করে না, ভয় করে মার্কস্‌বাদকেই। দ্বিতীয় প্রকারের বিরোধিতাই সরকারি দমননীতির প্রকৃত লক্ষ্য। ত্রৎস্কিবাদের উপর হিংস্র আক্রমণ তার নিদর্শন হিসাবে ধরা যেতে পারে। ত্রৎস্কির লেখার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের মনে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সত্যই হোক আর ভ্রান্তই হোক, সেটা পুঁজিবাদ সম্পর্কে স্তালিনি শাস্ত্রের চেয়ে আরো ক্ষমাহীন। আমি ত্রৎস্কিপন্থী নই; আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু যে ত্রৎস্কির মতবাদ বা সেইজাতীয় কোনো চিন্তার নিরোধকে বুর্জোয়া প্রচারের নিরোধ বলে চালাবার চেষ্টা ধোপে টেঁকে না; এবং এটাই আজ সমাজতান্ত্রিক প্রগতির সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রৎস্কিবাদী বিরুদ্ধতা যদি গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত না-হতো, তাহলে তারা কখনও গোপন বিদ্রোহের পথ খুঁজত না। সশস্ত্র বিদ্রোহের

ষড়যন্ত্র দমন করা হোক, কিন্তু বিরোধী মতের প্রকাশ নির্যাতিত কেন? এর পিছনেও রয়েছে একটি তত্ত্বগত ভুল—সোভিয়েট আমলাতন্ত্রের ভ্রান্ত বিশ্বাস যে বিরোধ কেবল শ্রেণীতে-শ্রেণীতেই সম্ভব। শ্রমিক শ্রেণীর, তথা শ্রেণীহীন সমাজের আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও দ্বন্দ্বগতির কথা তাঁরা ভুলে যান। সতেরো কোটি মানুষের মন যেন একই ছাঁচে ঢালাই করা, একই রঙে রাঙা। কর্তৃপক্ষের প্রাণপণ চেষ্টা অবশ্য তাই, এবং এ-চেষ্টা মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রসঙ্গে গোঁড়া মার্কস্‌পন্থীদের ঔদাসীন্যের একটি প্রধান কারণ এই যে, তাঁরা ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যার ঐকান্তিক প্রস্তাবকেই একমাত্র সত্য বলে বিশ্বাস করেন। মার্কস্ এঙ্গেল্‌সের লেখায় জড়বাদী ইতিহাস-বিচারকে দুটি ভিন্ন প্রস্তাবে পেশ করা হয়েছে। প্রস্তাব-দুটিতে প্রভেদ মৌলিক এবং সুলক্ষ্য। গোড়ার দিক্‌কার লেখায় তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, অর্থনীতিই ইতিহাসের একমাত্র নিয়ন্তা; সমাজের আর্থিক সংস্থান তার উপরিস্তরের ('superstructure') যাবতীয় ব্যাপারকে সম্যক এবং এককভাবে নিরূপিত করে। শেষ জীবনের রচনায়, বিশেষ করে চিঠিপত্রে, তাঁরা এই মতকে অতিশয়োক্তি বলে স্বীকার করেছেন, এবং সেটাকে শুদ্ধ করে লিখেছেন যে, ঐতিহাসিক পরিবর্তনের হেতু-নির্ণয় করতে গেলে অন্যান্য উপাদানেরও সন্ধান নিতে হবে; তাঁদের বক্তব্য শুধু এই যে, অর্থনৈতিক কারণসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলিকে গণনার মধ্যে না আনলে ইতিহাসের কোনো ব্যাখ্যাই সম্ভব হয় না।* (অন্যান্য উপাদানের মধ্যে ভাবগত ও আবেগজড়িত উপাদানই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই উপাদানগুলির হেতুপরম্পরার সূত্র ধরে আমরা শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ জড়জগতেই পোঁছব, কিন্তু তার জন্য ইতিহাস ছাড়িয়ে নৃতত্ত্বেরও সীমানা পার হয়ে প্রাণী ও উদ্ভিদের আদিপর্বের কথা পাড়তে হয়। মানবেতিহাসের যে-কোনো পর্যায়ে চিত্ত ও বস্তু পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল, কোনোটা আদিম বা মৌলিক নয়।) স্বয়ং প্রস্তাবকারীদের বিবেচনায় যদিচ এই দ্বিতীয় সংশুদ্ধ প্রস্তাবটি অধিকতর সত্য, তবু তাঁদের অনুগামীদের চিত্তগঠনে প্রথম প্রস্তাবের

* 'Marx and I are partly to blame for the fact that young writers sometimes lay more stress on the economic side than is due to it. We had to emphasize this main principle in opposition to our adversaries, who denied it, and we had not always the time, the place or the opportunity to allow the other elements involved in the interaction to come into their rights.' (Engels, *Letter to Joseph Block*, Sept. 21,1890).

অতিজড়বাদী ব্যাখ্যাই অপরিমোচনীয় ছাপ রেখে গিয়েছে। তাই তাঁরা ভাবেন যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সরিয়ে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারলে আর কিছু দেখতে হবে না, রাজনীতি, চারিত্র্য, কলাসৃষ্টি চিন্তাপ্রবাহ—মোট কথা, সংস্কৃতির সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নূতন অর্থনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে রূপান্তর গ্রহণ করবে, দুর্নিবার বেগে উৎকর্ষের দিকে, অভীষ্ট-সিদ্ধির দিকে আপনিই এগুবে। কিন্তু তা হয় না। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা সংস্কৃতির অগ্রগতির জন্য পাকা রাস্তা তৈরি করবে, কিন্তু যথোপযুক্ত মানসিক পরিবেশের অবর্তমানে সংস্কৃতিকে সে-পথে এগিয়ে দিতে পারবে না, এমন-কি অন্যান্য উপাদান যদি অত্যন্ত প্রতিকূল হয় তবে পিছিয়েও দিতে পারে। সংস্কৃতির স্ফুরণের পক্ষে সবচেয়ে প্রতিকূল অবস্থা হচ্ছে ডগ্‌মা-পিষ্ট চিত্ত এবং ডিক্টেটর্‌শিপ। সরকারি দফ্‌তরের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব-করা নিশ্ছিদ্র নিখুঁৎ পরিকল্পনা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, চিৎ-প্রকর্ষের পক্ষে তেমনি একান্ত মর্মান্তিক—সে-পরিকল্পনা যত সাধু-সংকল্পিতই হোক-না কেন। একমাত্র যে-সংকল্প এ-ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হবে তা মুক্তির সংকল্প, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখার সংকল্প। এই সংকল্পকে গোড়া থেকে নেতা এবং নীয়মান উভয়ের চিত্তে প্রখরভাবে জাগরূক রাখতে হবে, নইলে নেতা হবেন সর্বাধিনায়ক, এবং ডিক্টেটর্‌শিপের পরমায়ু হবে অক্ষয়।

সাম্যবাদ, অর্থাৎ শ্রেণীহীন সমাজ, উৎপাদন ক্ষেত্রে মুনাফা-লোভীর তিরোধান এবং একমাত্র জনগণের কল্যাণার্থেই সুপরিকল্পিত অধিনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আসবে কিনা আজকের সমস্যা তা নয়। সে-সমস্যার নিরাকরণ রুশ বিপ্লব করে দিয়েছে। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে সাম্যবাদ আসবে কোন্ রূপে? অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা প্রাথমিক, তাতে বিলম্ব সইবে না, বিশেষতঃ ভারত ও পাকিস্তানের মতো সর্বহারার দেশে। কিন্তু এখনও কি সময় আসেনি অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সঙ্গে মানুষের মুক্তির সমস্যাকে এক করে দেখবার? প্রথম সাম্যতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থনৈতিক সাফল্য দ্বিতীয় বিপ্লবের পথ সুগম করে দিয়েছে এবং তৃতীয় বিপ্লবের পথ মসৃণ। ডিক্টেটর্‌-শিপ ও ডগ্‌মার সাংঘাতিক অস্ত্র—যেটা অনেক পরিমাণে আত্মঘাতী হতে বাধ্য—কি এখনও, ওয়াইমার থেকে সাংহাই অবধি সাম্যবাদ বিস্তারের পরেও, প্রত্যেকটি নব বিপ্লব-প্রয়াসী দেশকে ব্যবহারে আনতেই হবে? এটাই মার্কস্-লেনিন প্রদর্শিত পথ হতে পারে। কিন্তু তাঁরা তো অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে সাম্যতন্ত্র স্থাপিত হয়ে যাওয়ার পর যে-বিপ্লব আসবে তার পন্থা নির্ধারণ করেননি। সাম্য ও স্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে পৃথক করে দেখবার, মাঝখানে সুদীর্ঘ ডিক্টেটর্‌শিপের ব্যবধান রেখে

দেখবার, এখন কোনো কারণ নেই। কারণ নেই, কিন্তু অনুকরণের অন্ধ স্পৃহা আছে, স্তূপীকৃত সংস্কারের চাপ আছে। সাম্যবাদী মিছিলের পথেও আজ প্রতিক্রিয়ার বেড়া তৈরি করেছে কোনো এক দূরদেশের খুঁটিতে-বাঁধা চিন্তা এবং অচলায়তন সংস্কারের স্থিত স্বার্থ।

চীনের নয়া গণতন্ত্র কি গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সাম্যবাদের পথ দেখাবে, সামাজিক সমতা ও মৈত্রীর সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্যবোধকে মেলাবে? তিন হাজার বৎসরের প্রাচীন এই সভ্যতার ভূমিতে কোনো ডগ্‌মা কখনো ভিত গাড়তে পারেনি। নূতন কালের এই ডগ্‌মাকেও তারা মুক্ত বুদ্ধির দ্বারা বিচার করবে, কুসংস্কারের অন্ধকার কক্ষে লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখবে না—এ আশা দুরাশা নয়। নাকি সে-মিলন ঘটবে কবিকীর্তিত এই মহামানবের সাগরতীরেই যেখানে বহু মত ও পথ মিলিত হয়েছে ইতিহাসের বাঁকে-বাঁকে?

Oh comrades, let not those who follow after.
—The beautiful generation that shall spring from our sides.
Let not them wonder how after the failure of banks.
The failure of cathedrals and the declared insanity of our
rulers.
We lacked the Spring-like resources of the tiger
Or of plants who strike out new roots to gushing waters.
But through torn down portions of old fabric let their eyes
Watch the admiring dawn explode like a shell
Around us, dazing us with its light like snow.

—Stephen Spender

সাহিত্যিকের সমাজচেতনা

সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে অনেকে ভাবতে শুরু করেছেন। আজ সে-ভাবনা রীতিমত দুর্ভাবনার পর্যায়ে পৌঁচেছে, কারণ এক প্রবল রাজনৈতিক ধারা সাহিত্যকে আপন ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে টেনে আত্মসাৎ করতে উদ্যত, যেমন করে মধ্যযুগে ধর্ম আত্মসাৎ করেছিল শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র বিকাশকে। রেনেসাঁসের মূল কথা ছিল চার্চের আওতা থেকে চিত্তের মুক্তি এবং ধর্মসংস্কারের বাঁধ ভেঙে বিভিন্ন খাতে চিৎপ্রকর্ষের উচ্ছল প্রবাহ। এই প্রবাহগুলিকে নূতন-এক বদ্ধ জলাশয়ে আটকে রাখার চেষ্টা চলছে ইদানীং। মধ্যযুগীয় চিত্তবন্ধনের দ্বিতীয় পালা আরম্ভ হলো। সে-কালের চার্চের জায়গা জুড়েছে রাজনীতি, অথবা রাজনীতিই এ-কালের চার্চ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নূতন চার্চও শিল্প-দর্শন প্রভৃতিকে আপন সেবায় নিয়োগ করতে কুণ্ঠিত হয়নি, তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয় মূল্যের দাবিকে অসহিষ্ণু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। এঁদের কাছে শিল্প-সাহিত্যের কোনোই সার্থকতা থাকে না, যদি না তারা রাজনৈতিক সংগ্রামের ধারালো অস্ত্র হিসেবে সার্থক হয়। এঁরা ভুলে যান যে সাহিত্য কেবল রাষ্ট্রবিপ্লবের হাতিয়ার হতে পারে না, কেননা সে রাষ্ট্রবিপ্লবের উদ্দেশ্যই হল এমন এক শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে জনসাধারণের জৈবিক অভাব মোচন করে তাদের জীবনকে শিল্পে সাহিত্যে সংস্কৃতিতে নব-নব রূপে উন্মুক্ত ও বিকশিত করা সম্ভব হবে। যদি তাঁরা বলতেন যে, সমাজের চরম সংকটকালে সাহিত্যিক নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না, ধনী-নির্ধনের দ্বন্দ্ব যখন চূড়ান্তে এসে পৌঁচেছে তখন সাহিত্যিককেও নির্ধনের পক্ষে এসে দাঁড়াতে হবে, সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হবে এবং সে-অস্ত্র স্বভাবতই হবে তাই যার ব্যবহারে তাঁরা সিদ্ধহস্ত—তবে সাময়িকভাবে এই মিশ্রিত বা ফলিত সাহিত্যরচনায় আত্মনিয়োগ করবার আহ্বানকে সাহিত্যের উপর আঘাত মনে করবার কারণ ছিল না। কিন্তু আমাদের বিপ্লবী নেতারা সরাসরিভাবে বলে বসলেন এই সাহিত্যই সেরা সাহিত্য, একমাত্র সাহিত্য, অন্য যে-কোনো প্রকারের সাহিত্য অগ্রাহ্য, অসহ্য। যদি তাঁরা এ-যুগের সবচেয়ে প্রাগ্রসর রাজনৈতিক আদর্শ ও ভাবধারার সঙ্গে সাহিত্যিকদের পরিচয় ঘটিয়ে এবং তার প্রতি তাঁদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেই

ক্ষান্ত হতেন, এই নূতন মতাদর্শকে শিল্পকর্মে রূপায়িত করবার ভার শিল্পীদের উপরই ছেড়ে দিতেন, তা হলেও নালিশের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছে তাঁরা দাবি করলেন সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং আত্মবিলোপ। তাঁদের দাবির ভাষা এই : **'Artistic production is to be systematised, organised, collectivised and carried out according to the plans of a central staff like any other soldierly work. This is to be done under the careful and yet firm guidance of the Communist Party.'*** চিন্তার উপরও তাঁদের প্রভুত্ব এমনই নিরেট। মার্কস্-লেনিন-স্তালিনের সর্বগ্রাসী মতবাদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র অমিল তাঁরা সইতে প্রস্তুত নন। দর্শন ইতিহাস সমাজতত্ত্ব সাহিত্য-বিচার (লাইসেন্‌কোর কল্যাণে বিজ্ঞানও এখন এই তালিকাভুক্ত হলো)—কোনো বিষয়ে ব্রাত্য বা স্বকীয় চিন্তার আভাসমাত্র তাঁদের দলবদ্ধ আক্রমণে নিষ্পেষিত হয়। যুক্তির আক্রমণ নয়, সে-আক্রমণ তো সর্বদাই বাঞ্ছনীয় এবং সুফলপ্রসূ; কুৎসিত গালিগালাজের, গর্হিত মিথ্যার আক্রমণ।

সাহিত্যের উপর এক বিশেষ রাজনৈতিক ধারার রূঢ় আঘাতে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজনীতির ছায়া মাড়াবেন না সাহিত্যিক, সমাজ থেকে, গণজীবন ও গণসংগ্রাম থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে বসবেন আপন ঘরের এবং মনের দরজা বন্ধ করে? এ-কথা সত্য যে দলীয় রাজনীতির প্রবেশ সাহিত্যের নির্মল সত্তাকে আবিল করে। সাহিত্যিক যতক্ষণ সাহিত্যকর্মরত ততক্ষণ তিনি একমাত্র নিজের প্রতিভারই অনুগামী, অন্য-কোনো অধিনায়কের প্রত্যাদেশ মেনে চললে তিনি স্বধর্মচ্যুত হবেন, লক্ষ্যভ্রষ্ট হবেন। কিন্তু সাহিত্যিক তো মানুষও বটে, এবং মানুষ সামাজিক জীব। যত আত্মসমাহিতই হোক সাহিত্যিকের জীবন ও মন, সমাজের সঙ্গে নানা নিবিড় সূত্রে তা গ্রথিত। সুতরাং সমাজের জীবনপ্রবাহ, তার গভীর তলবাহী নানা স্রোত ও ধারার সংঘাত, আসন্ন বিপ্লবের আবর্ত, বিপ্লবান্তিক যে-সমাজের পলি পড়ছে কোনো-এক অলক্ষ্য পাড়ে তার বিবিধ কল্পচ্ছবি, তার বিচিত্র অনুপ্রেরণা—এ-সমস্তকে তিনি এড়িয়ে চলবেন কেমন করে? এবং যেহেতু সমগ্র মন দিয়েই সাহিত্যসৃষ্টি হয়, মনের কোনো-এক খিল-দেওয়া কামরায় নয় (অনুভূতিও সমগ্র মন থেকে স্বতন্ত্র বৃত্তি নয়, চিন্তনা ও এষণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো) তাই সমাজের বৃহত্তর জীবন ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে সাহিত্যিক যে-দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন তা

* নিখিল বিশ্বসাহিত্য সম্মেলন, খারকভ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী দ্রষ্টব্য।

তাঁর সাহিত্যকর্মকে প্রভাবিত না-করে পারে না—সে-প্রভাব যত সূক্ষ্মই হোক, যত পরোক্ষ ও দুর্নিরীক্ষ্যই হোক-না কেন। আলংকারিকদের ভাষায় রসসৃষ্টির স্থায়ী ভাবগুলি শাশ্বত কালের, কিন্তু তার সঞ্চারী ভাব পরিবর্তনশীল এবং যুগধর্মসাপেক্ষ।

তার মানে এ নয় যে, কোনো সাহিত্যিকের রাজনৈতিক মতবাদ যদি নির্ভুল বা যুগোপযোগী না-হয় তবে তাঁর সাহিত্য মূল্যহীন হয়ে যাবে। এমনতরো উদ্ভট মূল্যবিচার আজ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হচ্ছে। 'শুধু বিবেকানন্দ কেন, সংস্কারবাদী আবিলতা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে এতই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে রামমোহন রায় থেকে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই সংস্কৃতি-আন্দোলনের নেতাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে উঠেছেন।··· শ্রমিক শ্রেণী বুর্জোয়া ঐতিহ্যের এ-জঞ্জাল বয়ে বেড়াতে রাজি নয়, এর যথাযোগ্য স্থান ইতিহাসের ডাস্টবিনে।' ('মার্কস্‌বাদী', ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ১১৯, ৫ম সংখ্যাও দ্রষ্টব্য)। মহৎ সাহিত্য তাকেই বলা চলে যা একাধারে সমসাময়িক এবং শাশ্বত, যুগধর্মী এবং যুগান্তরগামী। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় মহত্ত্বের এই চিহ্ন সুস্পষ্ট; রাষ্ট্রনেতার কলমের একটি আঁচড়ে তা মুছে যাবে না। তবু বলতে চাই যে কোনো সাহিত্যিক যদি সামাজিক প্রগতির সত্য আদর্শ গ্রহণ করে থাকেন এবং সে প্রগতি-সংগ্রামের আহ্বান সাড়া জাগায় তাঁর মনের গভীরে, তবে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি তাতে সমৃদ্ধ হবেই। পক্ষান্তরে, আজকের দিনে কোনো সাহিত্যরচনায় যদি শ্রেণী-প্রাধান্যের প্রতি পক্ষপাত এসে পড়ে কিংবা অতীতের হৃতগৌরবের জন্য ভাবাবেশ, তবে তা সৎসাহিত্যের অন্যান্য লক্ষণ-সম্পন্ন হলেও আমাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারবে না। রাজনৈতিক যেমন সৎসাহিত্যকে রাষ্ট্রবিপ্লবের অস্ত্রমাত্র জ্ঞান করে নিজের রাজনীতিকেই আদর্শের দিক দিয়ে হীনবল করে ফেলেন, তেমনি সাহিত্যিকের পক্ষেও সুস্থ রাজনৈতিক চেতনার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলার পরিণাম আপন সাহিত্যসৃষ্টিকে ক্ষীণ এবং শৌখীন করে তোলা।

জ্‌দানভী সাহিত্যবিচারের প্রতিক্রিয়া অনেক সাহিত্যিককে প্রগতিধারার একেবারে অপর পারের ডাঙায় নিয়ে গেছে—যে-ডাঙার নরম সবুজ মাটির উপর রয়েছে শাসক ও শোষকশ্রেণীর প্রসাদঘন স্নিগ্ধ ছায়া। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সম্প্রসারণের যুগে তার আওতায় সামাজিক শ্রীবৃদ্ধির যেটুকু স্বল্পপরিসর অবকাশ ছিল তা আজ নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। পরিস্ফীত পণ্য-উৎপাদন এবং সংকুচিত বিপণীর আত্মসংঘাতে এই সভ্যতার ভিত নড়ে উঠছে। এমন মরীয়া অবস্থায় গণতন্ত্রের ভদ্রবেশটি বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না, জাগ্রত গণদেবতার শক্তিরূপের সম্মুখে

সন্ত্রস্ত ধনতন্ত্র আপন আসুরিক মূর্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে, ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর্‌শিপের বর্ম ধারণ করছে। সাম্যবাদী একনায়কত্ব সৎ উদ্দেশ্য সাধনের অসৎ উপায় মাত্র। সাম্য-বাদীরা যে-কথা বুঝতে চান না সেটা এই যে স্বাধীনতার সাময়িক প্রত্যাহরণ তার চিরন্তন প্রতিষ্ঠার উপায়রূপে ব্যর্থ হতে বাধ্য, কারণ সর্বময় প্রভুত্ব একবার যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে কখনো, অন্তত বহু দীর্ঘকালের মধ্যে, তার ভিত টলবে না, নিজের গাঁথুনিকে মজবুত রাখবার কৌশল ও কৈফিয়ৎ সে খুঁজে নেবেই। পক্ষান্তরে, ফ্যাসিস্ট একাধিপত্যের উদ্দেশ্য ও উপায় দুইই সমান গর্হিত। তাতে আছে কেবল শক্তির সাধনা, এবং অধিকাংশ মানুষকে অমানুষ করে রাখার সংকল্প। ফ্যাসিতন্ত্র বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থা-বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে গদীয়ান হয়েছে। আমাদের দেশে তার মানসিক জমি তৈরি হয়েই আছে : সে-জমি হলো দেশের পনেরো-আনা লোকের শাস্ত্রভীরু কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিত্ত। ভারতে মনু-পরাশরযুগের হিঁদুয়ানির এবং পাকিস্তানে দামিশ্‌ক্ বোগ্‌দাদ কিংবা খুল্‌ফায়ে রাশেদীন আমলের মুসলমানীর পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলছেই ; সে-চেষ্টাকে আরো একটু সবল এবং ব্যাপক করে তুলতে পারলে ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর্‌শিপের আয়োজনটা ষোলকলায় পূর্ণ হবে। হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতা আপন-আপন দেশ-কাল-পাত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই মহৎ গৌরবের অধিকারী ছিল, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাদের অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার্য এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে স্মরণীয়। কিন্তু আজকের দিনের অর্থনৈতিক রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে তার অখণ্ড পুনরাবির্ভাব এবং গোঁড়ামির মধ্যে তার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা শুধু ইতিহাসের গতিরোধ নয়, তার শোচনীয় পশ্চাৎগতি। ফ্যাসিস্ট তামসিকতার অভিযানকে ঠেকাতে কিংবা এগিয়ে দেওয়াতে সাহিত্যিক ও ভাবুকের ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু সাহিত্যিকের সমাজচেতনা শুধু নঞর্থক হলে চলবে না। কী চাই না এবং কী চাই—আসলে একই প্রশ্নের-দুই দিক। দুটোকে একসঙ্গে না-দেখলে কোনোটাই পুরো দেখা হয় না, সামাজিক দৃষ্টি অপরিচ্ছন্ন থেকে যায়। কোন সামাজিক আদর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করবে জানতে হলে চোখ মেলতে হবে বাস্তব সমাজের দিকে। যে-সমাজব্যবস্থায় আমরা বাস করছি তার দোষ এবং পাপের লম্বা ফর্দ করা যেতে পারে, অশিক্ষা অস্বাস্থ্য থেকে আরম্ভ করে কুরুচি দুর্নীতি যুদ্ধপ্রীতি পর্যন্ত—কিন্তু তাতে লাভ নেই। এই সমাজকে খণ্ড-খণ্ড ভাবে মেরামত করে এখানে-ওখানে জোড়াতালি লাগিয়ে সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়া যাবে না ; তার ভিত্তিটাই ভুল। সবচেয়ে বড়ো ভুল হচ্ছে তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা অব্যবস্থা। ঐতিহাসিক

ক্রমবিবর্তনে এই ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল একদিন, কিন্তু সে-প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তার উপকারিতা আজ নিঃশেষিত। শুধু নিঃশেষিত নয়, রীতিমত বিপজ্জনক—পুরনো বাড়ি ভেঙে পড়বার আগে যেমন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এই ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে বলা হয় ধনতন্ত্র ; অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাষায় তা 'তম-প্রত্যয়ান্ত লোকের দ্বারা তর-প্রত্যয়ান্ত লোকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার' নীতি, বিশেষত সেই তম-প্রত্যয়টি যেখানে যুক্ত হয় ধারালো স্বার্থবুদ্ধি আর ভোঁতা বিবেকের সঙ্গে। ধনতন্ত্রের জাতিক ও আন্তর্জাতিক অকল্যাণ, এবং তার আশু পরিবর্তনের অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে আজ মতভেদ নেই—মুষ্টিমেয় ধনকুবেরদের বিরুদ্ধ মত এত স্পষ্টতই স্বার্থপ্রণোদিত যে তাতে কর্ণপাত করবার কথা ওঠে না। এও আজ সর্বসম্মত যে তার পরিবর্তে যে-সমাজব্যবস্থা আমরা চাই (এবং যার একমাত্র বিকল্প এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে ফ্যাসিস্ট অপমানবতা) সেটা কোনো-না-কোনো প্রকারের সমাজতন্ত্র—অর্থাৎ শ্রেণীবিভাগ ও মুনাফা-বৃত্তির উচ্ছেদ, উৎপাদন ও বণ্টনক্ষেত্রে জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকেই একমাত্র লক্ষ্য বলে ধার্য করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে সহযোগিতার উপর অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন।

মুখেও অন্তত সমাজতন্ত্রের গুণগান করেন না এমন লোকের সংখ্যা আজকাল খুবই কম, কিন্তু কাজে যাঁরা সমস্ত শক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধ করছেন তাঁদের শক্তি বড়ো কম নয়। ইতিহাসে দেখা যায় ভাগ্যদেবতার কোনো প্রসাদলালিত শ্রেণী প্রসাদের অন্যায় ভাগটা শেষপর্যন্ত বিনা যুদ্ধে কখনো হাতছাড়া হতে দেয়নি। বর্তমান শোষকশ্রেণীর আত্মশুদ্ধিও খুব সহজে ঘটবে ব'লে আশা করবার কোনো কারণ নেই ; কঠিন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সেটা ঘটিয়ে তুলতে হবে। এই সংগ্রামে কর্মীর চেয়ে ভাবুক, রাষ্ট্রনেতার চেয়ে শিল্পরচয়িতার দায়িত্ব কোনো-অংশে কম নয়। বস্তুতপক্ষে আরো বেশি, কারণ শিল্পী-সাহিত্যিকের মন হচ্ছে সমাজের সূক্ষ্মতম বীণাতন্ত্র। সামাজিক দুঃখের আওয়াজ সর্বাগ্রে ধ্বনিত হবে সেই বীণার তারে, এবং তারই ঝংকার সাড়া জাগাবে দেশজোড়া মানুষের চিত্তে। দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথও তাঁকেই সকলের আগে দেখতে হবে এবং সকলকে দেখাতে হবে, তাই সমাজ-সেবী এবং সাহিত্যসেবীর মধ্যে সহযোগ বাঞ্ছনীয়। তবে সেটা প্রকৃত অর্থে সহযোগ হওয়া চাই, রাষ্ট্রনেতার কাছে সাহিত্যকর্মীর আত্মবিলোপ নয়। বিপ্লবীকর্মীর কাছে সাহিত্যিক পাবেন তাঁর জীবনাদর্শের আরো ফলিত, পরীক্ষিত এবং বাস্তবীকৃত রূপ, কিন্তু সেটাকে চিন্তনায় ও কল্পনায় রূপায়িত করবার দায়িত্ব তাঁর একলার। সাহিত্যের এই আভ্যন্তরীণ সমস্যার ক্ষেত্রে বহিরাগত নির্দেশ, সাহিত্য-সমালোচনাকে দলীয় অনুজ্ঞায় পরিণত করবার প্রয়াস সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

মার্কস্‌বাদী সাহিত্য-আন্দোলন সাহিত্যবিষয়ের সীমানা প্রসারিত করেছে—এ-কথা মানতেই হবে। সে-প্রসারের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। পূর্বতন সাহিত্যের দৌড় বড়োলোক ও মধ্যবিত্তের ভাবনা-বেদনার বাইরে বড়ো-একটা ছিল না। সমাজের বৃহত্তর অংশ—যাদের ছোটোলোক বলে এতদিন উপেক্ষা করা হয়েছে—আজ তারা সাহিত্যে যেটুকু স্থান পাচ্ছে তার জন্য প্রধানত মার্কস্‌বাদী প্রচেষ্টাই দায়ী। মার্কস্‌-বাদীদের আর-একটি বরণীয় কৃতিত্ব ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের নিবিড় সম্পর্ককে সাহিত্যিকের চোখে প্রত্যক্ষ করে তোলা। এর ফলে আমাদের সাহিত্যের, বিশেষত কথাসাহিত্যের মেরুদণ্ড শক্ত হয়েছে। মার্কস্‌বাদী সাহিত্যনীতির সঙ্গে আমাদের অনেকের অল্পবিস্তর মতভেদ আছে। মতভেদ আছে বলে আমরা যেন ভুলে না যাই যে তাঁরা সাহিত্যে এক নূতন সমাজচেতনা এনেছেন, এবং পূর্বতন সমাজচেতনাকে দৃঢ় ও প্রশস্ত করেছেন। এই সমাজচেতনার সাহিত্যিক ও সামাজিক মূল্য স্থায়ী।

সমাজগঠনের আদর্শের মধ্যে শোষক ও শোষিতের শ্রেণীভেদ দূর করে পণ্য-উৎপাদনকে সর্বসাধারণের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করবার কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু শুধু তাই প্রগতির নির্ধারক বা বিনির্ণায়ক হতে পারে না। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ যে অধিকাংশ মানুষের পক্ষে মানুষ হয়ে ওঠার পথে একটি প্রকাণ্ড বাধা তাতে সন্দেহ নেই। সেই বাধাটিকে ভেঙে ফেলার চেষ্টার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা যদি আর একটি মস্ত প্রতিবন্ধক ঠিক পথের মাঝখানে খাড়া করবার জন্য উঠে-পড়ে লাগি তা হলে তেমন উদ্যমের আন্তরিকতা আমাদের খুব বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। ডিক্টেটর্‌শিপ হচ্ছে সেই প্রতিবন্ধক। তাকে শ্রমিকশ্রেণীর এক-নায়কত্ব বললে ভালোই শোনায় কিন্তু তথ্যের সঙ্গে তার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কার্যত ডিক্টেটর্‌শিপ একটি ক্ষুদ্র সুসম্বদ্ধ দলের সর্বময় প্রভুত্বে পরিণত হতে বাধ্য। স্তালিনের ভাষায় **dictatorship of the proletariat is substantially the dictatorship of the Party**। ওয়েব-দম্পতি বলেন যে এ-বিষয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রে ঢাকাঢাকির কোনো চেষ্টা মাত্র নেই ('সোভিয়েট সাম্যবাদ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩০)।

সমাজবাদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা আজ খুব তর্কসাপেক্ষ নয়, কিন্তু সমাজ-বাদের গণতান্ত্রিক এবং দলতান্ত্রিক রূপভেদের আপেক্ষিক গুণাগুণ নিয়ে বিতর্ক তীব্র। এই বিতর্কে নিরপেক্ষ থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, সমাজতন্ত্রের আবশ্যিক শর্ত এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে গণতন্ত্র; ও-দুটোর যে-কোনো একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির স্বচ্ছন্দ বিকাশ কল্পনা করতে আমি অক্ষম।

ডিক্টেটর্‌শিপকে একটি দ্রুত বিলীয়মান অবস্থা বলে আশ্বাসবাক্য যত জোরেই উচ্চারিত হোক, তার সপক্ষের যুক্তিটি তেমন জোরালো নয়। সে-আশ্বাস যাঁরা দেন তাঁরা এমন-কথা বলেন না যে, কয়েক বছর ডিক্টেটরি ব্যবস্থার পর তাঁরা পূর্ণ গণতন্ত্র স্থাপন করবার জন্য বদ্ধপরিকর। তাঁরা বলেন, কিছুই করতে হবে না—তাঁদের একনায়কত্ব সমাজের বৃন্ত থেকে একদিন আপনিই খসে পড়বে। খসে পড়বে সেই দিন যেদিন রাষ্ট্রব্যবস্থারই কোনো প্রয়োজন আর থাকবে না, মানুষে-মানুষে মিলে গড়বে মুক্ত সমাজ (free association), স্টেট নয়। আমাদের মনের সবকটি সহজাত বৃত্তিই যদি যৌথবৃত্তি হতো, আর জিগীষা, জিহীর্ষা প্রভৃতি অহংমুখী ভাবগুলি একান্তভাবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সাময়িক কুফল, তা হলে ভাবনা ছিল না। অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ একবার মুছে ফেলতে পারলেই মানব সমাজ একঝাঁক মৌমাছি কি একসারি পিঁপড়ের মতো সহজ সুন্দর যূথবদ্ধ জীবনের মধ্যে সমস্ত সামাজিক সমস্যার নিরাকরণ খুঁজে পেত। মার্কসের ধারণা ছিল কতকটা এইরূপ; তাই তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে শোষকশ্রেণী অবলুপ্ত হলেই রাষ্ট্রের পাট তুলে দেবার দিন আসবে, মানুষের পুনরুজ্জীবিত এবং উন্নীত যৌথবৃত্তিই তাকে স্বাধীন অথচ সুশৃঙ্খলিত জীবনযাপন করবার পথ বাৎলে দেবে। অল্পকালের জন্য একটি মধ্যবর্তী অবস্থার প্রয়োজন হবে বটে—যার নাম তিনি দিয়েছিলেন ডিক্টেটর্‌শিপ অফ দি প্রলিটেরিয়ট। এই স্বল্প সময়টুকু অতিবাহিত হবে ভূতপূর্ব শোষক শ্রেণীর শিকড়গুলিকে চারি দিক থেকে নির্মূল করতে। তার পরে রামরাজ্য—রাষ্ট্রমুক্ত সমাজ, স্বার্থমুক্ত মানুষ। কিন্তু বিপ্লবের প্রায় কুড়ি বছর পরে কমিণ্টার্নের সপ্তম অধিবেশনে ঘোষণা করা হলো: 'The final and irrevocable triumph of socialism and the all round reinforcement of the state of the proletarian dictatorship, is achieved in the Soviet Union.' সে reinforcement এখনো পূর্ণ উদ্যমে চলছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত, কারণ সমাজতন্ত্র যদি অটল এবং চরম রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েই থাকে তবে ডিক্টেটর্‌শিপকে বাঁচিয়ে রাখা কেন? শুধু বাঁচিয়ে রাখা নয়, তার বলবৃদ্ধি করা! এই স্ববিরোধী এবং আপাত মার্কস্‌বিরোধী পরিণামের কারণ মার্কস্‌বাদীদের বিশ্বাস যে স্টেট এবং ডিক্টেটর্‌শিপের মধ্যে ভেদাভেদজ্ঞান মায়া। কাজেই স্টেটের প্রয়োজন যতদিন আছে ততদিন ডিক্টেটরি শাসনের মধ্যে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ঘটতে দেওয়ার কথা তাঁরা ভাবতে পারেন না।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা ক্রমেই প্রতিপন্ন করছে যে সম্পত্তির ব্যক্তিগত

মালিকানা তুলে দিলেই রাষ্ট্রব্যবস্থা খসে পড়ে না ; বরঞ্চ আরো পরিব্যাপ্ত হয়, কারণ ভূতপূর্ব অর্থনৈতিক অরাজকতার স্থলে আসে শৃঙ্খলা, জীবিকানির্বাহের বিশাল ক্ষেত্রটিকে সমগ্রভাবে যৌথ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাষ্ট্র কেবল শ্রেণী-শোষণের যন্ত্র নয়, সমাজ জীবনে সৌষ্ঠব রক্ষার এবং তার অন্তর্নিহিত বিসংবাদী শক্তিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের অপরিহার্য মাধ্যমও বটে। তার হেতু মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে—সে একাধারে পিঁপড়ের মতো যূথপ্রাণ এবং বাঘ-ভালুকের মতো আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থান্বেষী। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি মানুষের অহংপ্রবণ স্বভাবকে চাঙ্গা করে রাখে—এ-কথা সত্য। কিন্তু যদি কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাই না-থাকে তবে কেবলমাত্র যৌথবৃত্তির তাড়না কিংবা তার উন্নীত রূপান্তর সমষ্টিকল্যাণ-বোধ সমাজকে রক্ষা করতে পারবে না ; শক্তিমানের হাতে দুর্বল, কূটবুদ্ধির হাতে সরলচিত্ত মানুষ নিপীড়িত হবেই। যতদিন না মানুষের আদিম স্বভাবের মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হচ্ছে ততদিন রাষ্ট্রের পাট তুলে দেবার আশা কেবল আশার ছলনা। মানব প্রকৃতির এই গভীর রূপান্তর কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ঘটানো যাবে কিনা সন্দেহ। যেটাকে স্তালিনবাদীরা মধ্যকালীন অবস্থা বলছেন সেটা অনিবার্যরূপে বহু দীর্ঘ কালের ব্যবস্থা।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে শ্রমশিল্পের উদ্যোক্তারা অসংকোচে প্রচার করতেন যে দেশের বারো-আনা ধন যদি একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর হাতে পুঞ্জীভূত না-হয় তবে তাঁদের নূতন শিল্পপ্রধান সভ্যতা গড়ে উঠতে পারবে না, যেহেতু বিত্ত খাটাবার জন্য প্রচুর পরিমাণ উদ্‌বৃত্ত টাকার প্রয়োজন এবং সে উদ্‌বৃত্ত টাকা একমাত্র ধনীর কাছেই পাওয়া যাবে। তেমনি বিংশ শতাব্দীতে শোনা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রের পনেরো-আনা ক্ষমতা যদি একটি ক্ষুদ্র দলের হাতে কেন্দ্রীভূত না-হয় তবে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। শিল্পবিপ্লবের গোড়াপত্তন করবার জন্য পুঁজিপতিদের প্রয়োজন হয়তো ছিল ; এখন নেই। ১৯১৭ সালে বলশেভিক ডিক্টেটর্‌শিপের আবশ্যকতা ও অনিবার্যতা যদি-বা স্বীকার করা যায়, আজ—যখন সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা ঘরে বাইরে তখনকার তুলনায় অত্যন্ত ক্ষীণ, এবং সমাজতন্ত্রের উপর আস্থা ব্যাপক ও প্রবল—আজও ডিক্টেটর্‌শিপের মতো আত্মঘাতী অস্ত্রকে আঁকড়ে থাকা বিগত-যুগের কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। একচেটিয়া ক্ষমতা, ক্ষমতা যারা ভোগ করে এবং যাদের উপর প্রয়োগ করা হয়, উভয়ের পক্ষে সর্বনাশা। সম্পত্তিবানকে সম্পত্তি-চ্যুত করার চেয়ে ক্ষমতাবানকে ক্ষমতাচ্যুত করা বিন্দুমাত্র সহজ হবার কথা নয় ; এবং ধনের বৈষম্যের জায়গায় যদি স্থাপিত হয় ক্ষমতার বৈষম্য তবে কোন অর্থে

তাকে সাম্যবাদ বলব, বুঝে উঠতে পারছি না। তাছাড়া ধনতন্ত্রে যেমন ধনের বৈষম্য থেকে স্বভাবতই আসে ক্ষমতার বৈষম্য, সমাজতন্ত্রে তেমনি ক্ষমতার বৈষম্য থেকে ধনের বৈষম্য ফিরে আসা অসম্ভব নয় মোটেই। সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র, সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পরের সম্পূরক, এবং পরস্পরের পক্ষে আক্ষরিক অর্থে অপরিহার্য।

শ্রমিক শ্রেণীর, অর্থাৎ সাম্যবাদী দলের, ডিক্টেটর্‌শিপ আসলে গণতন্ত্রই, এমন-কি, সেটাই গণতন্ত্রের উন্নত ও প্রকৃষ্ট রূপ—এমন যুক্তিও মাঝে-মাঝে তোলা হয়। এর দ্বারা যদি এইটুকু বোঝাবার ইচ্ছা থাকে যে ধনতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের প্রকাশ ব্যাহত, সর্বসাধারণকে যে-রাষ্ট্রাধিকার দেওয়া হয়েছে সেটা নামেমাত্র, কার্যত শাসন-যন্ত্র তাদের ইচ্ছা বা স্বার্থের দিকে দৃকপাত না করেই পরিচালিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের উপর শোষণযন্ত্ররূপেই প্রযুক্ত হয়—তা হলে সে অতি সত্য কথা, ঝুটা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মতো কথাও বটে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশের ডিমক্রেসি মেকি বলেই যে সাম্যবাদী দলের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব খাঁটি গণতন্ত্র হবে—এ বড়ো অদ্ভুত যুক্তি। কোনো-কোনো দিক থেকে সে-প্রভুত্ব লোক-হিতকর হতে পারে, কিন্তু উপর থেকে লোকের হিত করা এবং তাদেরকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা এক জিনিস নয়। গণতন্ত্রের একেবারে গোড়ার কথা হলো বিভিন্ন মত ও কার্যক্রমের মুক্ত প্রকাশ এবং তার নির্ভয় সমালোচনা। এই বিভিন্ন পন্থার মধ্যে কোনটি প্রকৃত জনকল্যাণের পথ, কবে কোন দিকে তার সংস্কারের প্রয়োজন—এসব প্রশ্নের শেষ-বিচারক জনগণই। পক্ষান্তরে, ডিক্টেটর্‌শিপ মানে একটি ধরা-বাঁধা সরকারি মতের বাইরে সমস্ত মতের উন্মূলন, একটি স্বয়ম্ভু দলের বাইরে সমস্ত দলের উচ্ছেদ।

অধিকাংশ লোক শরীরপাত করে ধন উৎপাদন করবে আর অল্প কয়েকজন মুনাফার গদীর উপর বসে সে-ধন ভোগ করবে—এ-ব্যবস্থা ঘোরতর পাপ। ধনতন্ত্র নামধারী এই সামাজিক পাপের প্রচার নিষিদ্ধ হলে কারও ন্যায়সংগত আপত্তি হবার কথা নয়; ক্রাইমের প্রচার সব সমাজেই নিষিদ্ধ। কিন্তু শাসকমণ্ডলীর এক অত্যন্ত সংকীর্ণ অথচ সর্ববিষয়ভুক্ ডগ্‌মার বাইরে যে-কোনো লোকের পক্ষে যে-কোনো উদ্দেশ্যে একটি শব্দ উচ্চারণ করাও দণ্ডনীয়*—এর চেয়ে ভয়াবহ অবস্থা আর-কিছু কল্পনা করা যায় না। মতবৈষম্য কেবলমাত্র শ্রেণীবৈষম্যের দরুনই সম্ভবপর, এটা গায়ের জোরের কথা। ধনিক রাষ্ট্রে যেমন সকলের চিত্ত এমন-কি বুর্জোয়া শ্রেণীর

* Sydney & Beatrice Webb, *Soviet Communism*, vol. II, p. 1 12.

চিত্ত পর্যন্ত, এক ছাঁচে ঢালাই করা নয়, শ্রমিক রাষ্ট্রেও তা হবে না। একই শ্রেণীর কিংবা শ্রেণীহীন সমাজের ভিতরেও বহু মত ও পথের অবকাশ রয়েছে। তার মধ্যে কোনটি সেই শ্রেণীর পক্ষে বা বৃহত্তর সমাজের পক্ষে বরণীয় সেটা নির্ধারণ করবার ক্ষমতা একটি ক্ষুদ্র দলের নায়কিয়ানার মধ্যে অনড়ভাবে আবদ্ধ রাখার নাম আর যাই হোক গণতন্ত্র নয়। সমাজবাদের আলো যে আজ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ছে না তার প্রধান কারণ তো এই যে, সমাজবাদ এখনো দলতন্ত্রের দ্বারা রাহুগ্রস্ত—বাস্তবে এবং চিন্তায়।

এই রাহুর গ্রাসে থাকার প্রয়োজন সাব্যস্ত করতে গিয়ে একনায়কতন্ত্রবাদীরা সোভিয়েট রাষ্ট্রের দারুণ সামরিক বিপদের কথা পাড়েন। চারি দিক থেকে সাম্রাজ্যিক গৃধ্রুতার দ্বারা সে পরিবেষ্টিত; সমাজতন্ত্রকে আঁতুড়েই মেরে ফেলবার জন্য ধনতন্ত্র ওৎ পেতে বসে আছে। এমন ঘোর সংকটকালে বজ্রকঠিন ডিক্টেটর্‌শিপ না-হলে সোভিয়েট রাষ্ট্র কি বাঁচবে? এর উত্তরে দুটি প্রশ্ন করা যেতে পারে: ১. গণতন্ত্র স্থাপিত হলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে পারবে না কেন? ২. সোভিয়েট রাশিয়ার কি এখনো সঙ্গিন এবং অসহায় অবস্থা? দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন পি এম এস ব্ল্যাকেট্—পৃথিবীর একজন সেরা আণব বিজ্ঞানী ও মানবদরদী। সোভিয়েটের পরম গুণগ্রাহী বলে ইনি সম্প্রতি স্তালিনি মহলে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছেন:

'There is not now, and cannot be for some years to come, any force capable of preventing Russia from marching to the Atlantic coast. When Field-Marshal Montgomery took charge of the Western Union defence and started planning, it was at once realised that there was no defence at all against the Red Army. The U. S. might atom-bomb Russian cities, but cannot defend any Western capital or industrial city against the Russians.

Now that Russia possesses the atom bomb plus the Red Army, there is no longer any balance of power in Europe. The only sensible thing, therefore, is to outlaw the use of the bomb.' (*Hindusthan Standard*, Nov. 19th.)

সোভিয়েটের অপরাজেয় সামরিক শক্তি এবং ওয়াইমার থেকে ক্যান্টন অবধি

সমাজতন্ত্রের প্রসারের ফলে পৃথিবীর চেহারা বদলে গেছে। আজ যদি কোনো নতুন দেশে সমাজ-বিপ্লব সম্পন্ন হয়, তবে সে-দেশের অবস্থা ১৯১৭ সালের রাশিয়ার অসহায় অবস্থার অনুরূপ হবে না মোটেই। তবু তাকে সেই রাশিয়ারই শিশু পায়ের পদচিহ্ন ধরে চলি-চলি পা-পা করে চলতে হবে, তার বাইরে এক পা'ও এগুবার অধিকার নেই তার ? এটা জেনেও যে রাশিয়ার গতি আজ শুধু মন্থর নয়, রুদ্ধ ?

পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রকে যৌথ করা সম্ভব, সেখানে পরিকল্পনা ও পরিচালনার অবকাশ আছে। কিন্তু সংস্কৃতিকর্ম যৌথভাবে চলতে পারে না। যৌথবৃত্তির এলাকা চিরাচরিতকে নিয়ে, যুগযুগান্তরের মধ্যে তার পরিবর্তন অনতিলক্ষ্য। আর সংস্কৃতির মূল প্রেরণা হলো নূতনের প্রেরণা, অজ্ঞাতপূর্ব সত্যের অনুসন্ধান, অনাস্বাদিতপূর্ব রসের উপলব্ধি। নিজের বিশিষ্ট ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিধারাকে শিল্পী অবশ্য স্বীকার করবেন, টেনে নেবেন আপন রক্তপ্রবাহের মধ্যে। কিন্তু সার্থক শিল্পী আমরা তাঁকেই বলব যিনি সে-ধারার সঙ্গে আপন ব্যক্তিস্বরূপের উপধারাকে মিলিয়ে তাতে গতিবেগ সঞ্চার করবেন, তাকে গভীরতর এবং প্রশস্ততর করে তুলতে সক্ষম হবেন। ঐতিহ্যের ধারা বরাবরই শুকিয়ে যায় যদি না নিত্য নবপ্রতিভার প্রস্রবণ থেকে ছোটো-ছোটো জলপ্রবাহ নিরন্তর এসে তার সঙ্গে মিলিত হয়। প্রতিভার সৃষ্টি মানে স্বকীয় সৃষ্টি ; তাকে পরিকল্পনার অধীনে আনা সম্ভব নয়। সামাজিক পরিকল্পনার সর্বোচ্চ লক্ষ্যই হলো প্রত্যেক ব্যক্তির সৃজনীশক্তি ও চিৎপ্রকর্ষের বিকাশকে দিনানুদৈনিক জীবনের অভাব, অবমাননা এবং অব্যবস্থার বন্ধন থেকে মুক্ত করা। শিল্পসৃষ্টি কিংবা সত্যসন্ধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বরূপের উন্মোচনকে ব্যক্তিসর্বস্বতার প্রশ্রয় ভাবলে ভুল হবে। এদের বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যই সমষ্টির জীবনকে সমৃদ্ধ করবে, সে-জীবনপ্রবাহে বেগ সঞ্চার করবে। সরকারি প্রত্যাদেশে (দক্ষিণপন্থী কি বামপন্থী—এ-ক্ষেত্রে সেটা অবান্তর) শিল্পী ও জ্ঞানী যদি গতানুগতিক হন তবেই সমাজ পঙ্গু হবে ; তাঁদের ব্যক্তিত্বের কণ্ঠরোধ অব্যবহিতরূপেও সমাজের গতিকে রুদ্ধ করবে।

একটি অবস্থায় অবশ্য শিল্পসাহিত্যকে প্ল্যানিং-এর অন্তর্গত করা যায়—যদি আমরা বিশ্বাস করি যে এগুলি শুধু জৈব প্রয়োজন-সাধনের অস্ত্র, তাছাড়া আর-কিছু নয়। শিল্পসাহিত্য যদি অর্থনীতির ছায়ামাত্র হয় তবে স্বভাবতই আমাদের অর্থনৈতিক জীবন যে সামাজিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত, শিল্প-সাহিত্যও সেই পরিকল্পনা বা তার অনুরূপ কোনো ছায়া-পরিকল্পনার অধীনে এসে পড়ে। বিবর্তন-বিদ্যা আমাদের জানায় বটে যে, জীবজগতে সৌন্দর্যের বিকাশ উদ্‌বর্তনের প্রেরণাতেই ঘটেছে—ফুলের রঙ প্রজাপতিকে আকর্ষণ ক'রে ফুলগাছের বংশবৃদ্ধি ঘটায় বলেই

ফুলের এত বর্ণবৈচিত্র্য—কিন্তু মানুষের বেলাতেও কি বলা যায় তার সৌন্দর্যবোধ ও জ্ঞানানুরাগ কেবল তাকে ব্যক্তি বা জাতি হিসেবে বাঁচিয়ে রাখার উপকরণ? মানবমনের সব-কিছুর ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা খুঁজে বের করা, অর্থাৎ ব্যাখ্যার চোটে সেগুলিকে উপমানবিক স্তরে নাবিয়ে আনা, পণ্ডিতম্মন্যদের একটি ব্যসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এঁদের মুখে শুনতে পাই, প্রেম আর কিছু নয় শুধু বংশবৃদ্ধির তাগিদ, নীতিবোধ যৌথবৃত্তিরই প্রকারভেদ। সংস্কৃতিকর্মের উপর জড়প্রক্রিয়ার ছায়া পড়ে নিশ্চয়ই, কিন্তু ছায়া এ-ক্ষেত্রে কায়াকে ছাড়িয়ে যায় বহুদূর, সেটাই এ-ছায়ার বিশেষত্ব। পদার্থজগতের ছায়া-কায়ার সম্পর্ক মনোলোকে বর্তায় না, সে-উপমাও প্রমাদকারী। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারা এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্র মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিক কারণের দ্বারা নির্ণীত হলেও বুর্জোয়া বিজ্ঞানের মধ্যে যে অনেকখানি সত্য অর্থাৎ যাথার্থ্য রয়েছে তাতে সন্দেহ করা কোনো ডায়ালেক্‌টিক-ধুরন্ধরের পক্ষেও সম্ভব নয়। সে-বিজ্ঞান বুর্জোয়া বলেই আগাগোড়া বাতিল হয়ে যায় না। তেমনি কোনো-এক কাল ও শ্রেণীর শিল্পে একটি বিশেষ অর্থনীতির ছায়াপাত থাকলেও তার উপর যদি প্রতিভার ছাপ পড়ে তবে সে আপন দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে রসের আনন্দ বহন করে নিয়ে যাবে সর্বদেশ ও শাশ্বত কালের কাছে, কোনো শ্রেণী তাকে অন্য শ্রেণী-সঞ্জাত বলে অবজ্ঞা করতে পারবে না।

মার্কস মনের সঙ্গে জড় ও প্রাণের শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগত স্তরভেদের কথা দার্শনিকরূপে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু সমাজতত্ত্বে এবং ইতিহাস-ব্যাখ্যায় মার্কস্‌-বাদীরা মাননিক ব্যাপারকে জৈবপ্রক্রিয়ার সঙ্গে একাকার করে ছাড়েন, মনের সৃষ্টিকে প্রাণধারণের সংকীর্ণ প্রয়োজনের মধ্যে হারিয়ে ফেলেন; তার স্বতন্ত্র কোনো সার্থকতা বা মূল্য খুঁজে পান না। নইলে আর্টকে শ্রেণীসংগ্রামের অস্ত্র, এবং অস্ত্রমাত্র, বলতে তাঁদের বাধত। আর্টের এই অস্ত্রধর্ম যদি মেনে নেওয়া হয় তা হলে অবশ্য আর্টের উপর দলীয় একাধিপত্য এবং দলের বাইরের সমস্ত সংস্কৃতিকর্মীর প্রতি ফাদায়েভী যুদ্ধ-ঘোষণার হদিশ মেলে। তার সঙ্গে-সঙ্গে এও হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে যাঁরা সংস্কৃতির পর্দায় শ্রেণীসংগ্রামের ছায়া দেখেন এবং আর-কিছুই দেখেন না (যদি দেখতেন তা হলে কি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে 'ইতিহাসের ডাস্ট্‌বিনে' ফেলে দেওয়ার কথা ভাবতে পারতেন?), তাঁদের কাছে সংস্কৃতির স্বাধীনতার আশা কামানের কাছে পুষ্পবৃষ্টির আশা।

সবচেয়ে বিপদ এই যে মার্কস্‌-ভক্তরা চিত্তের নিরোধকে ঠিক অন্যায় বলে ভাবতেই পারছেন না। শিল্পে সাহিত্যে দর্শনে বিজ্ঞানে যে-সমস্ত ভাবধারাকে

তাঁরা দমন করতে সমুদ্যত সে তো স্পষ্টতই ভ্রান্ত। ভ্রান্তির অপনোদনে ভিন্নমতাবলম্বীদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে কেন ? আর ভিন্ন মত মাত্রই যদি ভ্রান্ত হয়—সে-দোষ কি মার্কস্‌বাদীর ? সত্যের উপর এই একচেটিয়া মালিকানা তাঁরা স্থাপন করেছেন ১৮৪৮ সাল থেকে ; একশো-এক বছরের মধ্যে তার আর কোনো নড়চড় হয়নি। মতপ্রকাশের অবাধ অধিকারকে সামাজিক কল্যাণের একমাত্র পথ এইজন্য বলতে হয় যে এই মর্ত্যলোকের কোনো সত্যই পরিপূর্ণ অপরিশোধনীয় সত্য নয়, এবং সত্যের পদপ্রার্থী কোন মত তখনকার মতো সবচেয়ে নির্ভুল, সে-বিষয়ে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করা মানুষী শক্তির অতীত। বিভিন্ন মতের অবাধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই ভ্রান্তি ক্ষয় হয়ে সত্য ক্রমাগত সত্যতর হয়ে ওঠে, পরম সত্যের দিকে এগোয়। পরম সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিমিত জ্ঞানের সম্পর্ক asymptotic—অনন্ত কাল ধ'রে এই দূরত্ব কমতে থাকবে, কোনো কালেই ঘুচবে না। কোনো একটি আংশিক সত্য যখন পরম সত্যের ধ্বজা উড়িয়ে অন্যান্য আংশিক সত্যের উপর তরবারি হানে তখনই বুঝব মনের আকাশে তামসিক যুগের ঘনান্ধকার নেমে আসছে, আমরা সামনের দিকে এগুচ্ছি না, যাত্রা করেছি উল্টো দিকে। 'They (the totalitarians) are at one in upholding the doctrine of the inquisition—that the way to promote truth is to state, once for all, what is true, and then to punish those who disagree. The history of conflict between science and the Churches shows the falsehood of this doctrine. We are all now convinced that the persecutors of Galileo did not know all truth, but some of us seem less certain about Hitler or Stalin.' (Russell, *Religion and Science.*)

একটি প্রশ্ন : জীবিকানির্বাহের ক্ষেত্র যদি সামষ্টিক পরিকল্পনা-ভুক্ত হয় তবে শুধু সংস্কৃতির স্বাধীনতা কি মানুষের স্বাধীনতার তৃষ্ণা মেটাতে পারবে ? অধিকাংশ লোকের জীবনের অত্যধিক অংশ যে জীবিকা-সংক্রান্ত কাজকর্মের মধ্যেই অতিবাহিত হয়—সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। সমাজতন্ত্র-স্থাপনের পরেও বহুকাল অবধি বেশির ভাগ লোকের পক্ষে, অবস্থার গতিকে না-হোক, স্বভাবের গতিকে, চিৎপ্রকর্ষের সাধনায় নিজের পুরুষার্থ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং তাদের জীবনের নাতিপ্রশস্ত পরিধির মধ্যে যে-স্তরটা সর্বপ্রধান এবং সবচেয়ে ব্যাপক থেকে যাবে সেই জীবিকানির্বাহের স্তরে তারা যদি স্বাধীন না হয় তবে তাদের স্বাধীনতা আর রইল কোথায় ?—এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অর্থ-

নৈতিক নিয়ন্ত্রণের অর্থ কর্মজীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় একাধিপত্য বা হস্তক্ষেপ নয়। নিয়ন্ত্রণ মানে গোষ্ঠীর মুনাফার পরিবর্তে সমষ্টির প্রয়োজনের দিকে অর্থনীতির মোড় ফেরানো, সমস্ত সমাজের আবশ্যিক চাহিদার সঙ্গে সমগ্র পণ্যোৎপাদন ও বণ্টনের সামঞ্জস্য বিধান। এই সার্বিক সামঞ্জস্য রক্ষা করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে যতখানি বিকেন্দ্রণ সম্ভব, উৎপাদক ও ভোক্তাকে ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত-ভাবে যতখানি স্বাতন্ত্র্য দেওয়া নিরাপদ—তার জন্য নিরন্তর চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যই হবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করা, এবং অর্থনীতিক জীবনকে এমন পরিকল্পনার অধীনে আনা যাতে সামাজিক কল্যাণ বিপর্যস্ত না-ক'রে প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিপদে সম্ভবমতো প্রচুরতম স্বাতন্ত্র্য-সম্ভোগের অবকাশ দেওয়া যায়। গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণকর্তারা সর্বদাই মনে রাখবেন, তাঁরা মনে রাখতে বাধ্য হবেন যে, ব্যষ্টির মঙ্গলের সর্বব্যাপিকতা এবং সমস্ত ব্যষ্টির মঙ্গলের যোগফল ছাড়া সমষ্টির মঙ্গল আর কিছুই নয়। ব্যষ্টির মঙ্গলের উর্ধ্বে সমষ্টি-মঙ্গলের যে-আকাশকুসুম রচনা করা হয়, তা আকাশকুসুমই থেকে যায়। হেগেল সেই অদৃশ্য কুসুমের আঘ্রাণ পেয়েছিলেন বোধ করি, এবং হেগেলের উত্তরাধিকারে মার্ক্স, লেনিন, স্তালিন। তাই 'সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায় ব্যষ্টিকে দুর্বল ক'রে সমষ্টিকে সবল করা যায় না; ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না।' ('রাশিয়ার চিঠি')।

এ-যুগের, শুধু এ-যুগের কেন যে-কোনো যুগের, সবচেয়ে গুরুতর সামাজিক সমস্যা হচ্ছে শৃঙ্খলা (organisation) ও স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয়-স্থাপনের সমস্যা। আধুনিক কালে এ-সমস্যার দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত সমাধান দেখা দিয়েছে—ধনতান্ত্রিক লিব্‌রালিজ্‌ম্‌ এবং ডিক্টেটরি সাম্যবাদ (ফ্যাসিজম্‌কে ধর্তব্যের মধ্যে আনা যায় না)। যাঁরা নিজেদের উদারপন্থী বলেন বা বলতেন তাঁদের সমাধান যে-কোনো প্রকারের সামষ্টিক বন্ধনের পরিপন্থী, এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে অব্যাহত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সর্বত্র অব্যাহত স্বাধীনতার দাবি কিন্তু কার্যত শোষণ করবার অবাধ অধিকারের রূপ ধারণ করল। সে-অধিকারের পরিণাম আজ আমাদের চোখের সামনে রয়েছে—একদিকে পর্বতপ্রমাণ ঐশ্বর্য, অন্যদিকে, সমাজের বিপুল অংশে, দুঃসহ দারিদ্র্য। এবং ধনের বৈষম্য যেখানে অতিমাত্রায় বিদ্যমান, সেখানে রাষ্ট্রিক অধিকারের সাম্য নথিপত্রের বাইরে অবশ্যতই নিশ্চিহ্ন হয়। ডিক্টেটরপন্থীদের বিপরীত সমাধানে রয়েছে সামাজিক শৃঙ্খলার জয়জয়কার, স্বাধীনতার বিলোপ।

তাঁরা বলেন বিলোপটা সাময়িক, কিন্তু সাময়িকতার প্রতিশ্রুতি খুব নির্ভরযোগ্য ঠেকে না—ইতিপূর্বেই সে-কথা আলোচনা করা হয়েছে। আমরা যে তৃতীয় সমাধানের দিকে ইঙ্গিত করেছি—মূলত অর্থনীতির ক্ষেত্রে সামষ্টিক বা সমবায়-ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—সেটা মধ্যপন্থা বলেই উগ্রপন্থী উভয়পক্ষের তীব্র আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। এই পথ যিনি বরণ করবেন, সে-কথা মনে রেখেই করবেন।

সাহিত্যিকের সমাজচেতনা যেন তাঁকে তাঁর 'স্বদেশ' থেকে নির্বাসিত না করে। তিনি সমাজের একজন বলে সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করা তাঁর কর্তব্য ; সাহিত্যিক বলে সৌন্দর্যের তপস্যা তাঁর ধর্ম। এবং ঐ বস্তু যদি একই আধারে ধৃত হয় তা হলে মানুষের মনে এমন-কোনো চৈন প্রাচীর নেই যা ও-দুটিকে পৃথক রাখতে পারে। সমাজ-সংবেদনা সাহিত্যিকের সৌন্দর্যবোধকে সমৃদ্ধ করবেই ; তেমনি সৌন্দর্যের সাধনা তাঁর সামাজিক উপলব্ধিকে পরিশুদ্ধ করবে। সাহিত্যবস্তু কিন্তু ডাক্তারি দোকানের মিক্সচার নয় ; তিন গ্রেন তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে দুই গ্রেন প্রেম মিশিয়ে দিলে প্রগতিশীল গল্প তৈরি হয় না। সাহিত্যিককে ধৈর্য রাখতে হবে ; অপেক্ষা করতে হবে সেই দিনের জন্য যে-দিন তাঁর সমাজচেতনা ভাব ও বিভাবের বকযন্ত্র-পরম্পরায় পরিস্রুত হয়ে রসলোকে নবজন্ম লাভ করবে। ইতিমধ্যে তিনি যেন ভুলে না যান যে, কোনো সাহিত্যরচনা যদি রসোপলব্ধির অলৌকিক আনন্দ দান করতে সক্ষম হয় তবে তার বিষয়বস্তু যাই হোক-না কেন, সে-রচনার জন্য সমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। পক্ষান্তরে, সে-আনন্দ থেকে যদি তিনি পাঠককে বঞ্চিত করেন তবে তাঁর লেখায় 'সমাজবাদী বাস্তবিকতা' যত জোরালো হোক, সাহিত্য হিসেবে তা ব্যর্থ হবে।

সমাজবাদী পরিকল্পনায় ব্যক্তিস্বাধীনতা

সুচিন্তিত সুলিখিত আটটি প্রবন্ধের সমষ্টি।* প্রকর্ষিত চিত্তের ফল, শাঁসালো কিন্তু দুষ্পাক নয়। ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষাতত্ত্ব—এইসব বিবিধ ক্ষেত্রে থেকে আহরিত তাদের রস। কিন্তু রসের বাড়াবাড়ি নেই কোথাও, অন্যদিকে যেমন তত্ত্বকথার কচকচানি কিংবা বিদ্যা ফলানোর চেষ্টা একেবারে অনুপস্থিত। বাংলা প্রবন্ধের লঘুচিত্তচাপল্যে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা খুব সোয়াস্তি বোধ করবেন না এই বই পড়তে, আবার যাঁরা চিন্তারাজ্যে নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের আশা নিয়ে আসবেন তাঁরাও একটু হতাশ হবেন। এ-প্রবন্ধ সমষ্টির যে-গুণটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে তাদের বিষয়-বৈচিত্র্য, সেইসব বিচিত্র ক্ষেত্রে লেখকের স্বচ্ছন্দ বিহার, তাঁর প্রকাশভঙ্গির স্বচ্ছতা। হুমায়ুন কবীরকে যাঁরা রাজনৈতিক নেতা কিংবা আমলাতন্ত্রের একজন পুরোধা বলে জানেন তাঁরা এই বই পড়ে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হবেন। বিস্মিত হবেন এই ভেবে যে তাঁর নিরেট কর্মব্যস্ততার মধ্যে তিনি কোন কৌশলে চিৎপ্রকর্ষের এতখানি অবকাশ সৃষ্টি করলেন; আনন্দিত হবেন উপযুক্ত রোদবৃষ্টি না পেয়েও ফলন এত ভালো হয়েছে দেখে।

মলাটেই বলা হয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের উপলব্ধি প্রবন্ধগুলিকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। সেইসঙ্গে সামাজিক বিধানের প্রয়োজন বিষয়েও লেখক খুবই সচেতন। এবং উভয়ের মধ্যে, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির মধ্যে দুর্নিবার সংঘাতটিও তাঁর চোখের সামনে সর্বদা উপস্থিত। প্রকাশকের ঘোষণা অনুযায়ী এই প্রসঙ্গ বা সমস্যার ছায়াপাত সমস্ত প্রবন্ধে থাকলেও যে-প্রবন্ধগুলির এটাই প্রধান আলোচ্য সেগুলির বক্তব্য বিষয়ে কবীরের সঙ্গে আমার মতের ঐক্য ও অনৈক্য নিয়েই এই পর্যালোচনা।

দেশ-কাল-পাত্র ভেদে গণতন্ত্র বিভিন্নরূপ ধারণ করলেও তাদের মধ্যে একটি ঐক্য ধরা পড়ে। সেই ঐক্যের সন্ধান দিতে গিয়ে কবীর বলেছেন: 'The one

* **Humayun Kabir, *Science, Democracy and Islam* and *Other Essays*, p. 126, George Allan & Unwin, 12s. 6d.**

thing that distinguishes all the differnt political systems and ideologies which we call democratic is the urge to establish an equivalence if not identity between duties and rights.' (p. 27)

আরো একটু বিশদ করে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যকে কবীর দুটি সূত্রে বিশ্লিষ্ট করেছেন : '(a) The attempt to establish the equality of rights and duties for all members of a community, (b) the attempt to make all rights and duties coincident.'

প্রথম সূত্রটি সহজেই বোঝা যায়, কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই সেখানে। দ্বিতীয়টি আমার কাছে খুব পরিষ্কার নয়, অথবা বলা ভালো যে তার যে-অর্থ পরিষ্কার সে-অর্থে তাকে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বলে আমি মানতে পারি না। দুটি পদার্থের মধ্যে 'সমীকরণ', 'তাদাত্ম্য' বা 'সমপাত'-সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দুটি পদার্থ একই, অন্তত একই পদার্থের দুই ভিন্ন রূপ। কিন্তু কবীর নিশ্চয়ই বলতে চাননি যে একই ব্যাপারকে একাধারে কর্তব্য এবং অধিকার বলে গণ্য করা যেতে পারে, একদিক থেকে দেখতে গেলে যা আমাদের অধিকার, অন্যদিক থেকে তাই কর্তব্য। খুব সম্ভব তিনি যে-সম্পর্কের কথা ভাবছেন সেটাকে লাস্কির ভাষায় correlation বলা যায়—কবীর নিজেও ঐ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে correlation-এর অর্থ হবে অন্যোন্যাশ্রয় সম্বন্ধ—অধিকার লাভের জন্যই কর্তব্যপালন, কর্তব্যপালনের জন্যই অধিকারলাভ। সমাজ যদি আমার কতকগুলো অধিকার স্বীকার করে তা হলে সমাজের প্রতি কতকগুলো কর্তব্য আমাকেও স্বীকার করে নিতে হবে। প্রাপ্য এবং দেয়ার মধ্যে একটি সমতা থাকা সংগত বৈকি। কিন্তু ঐ 'কর্তব্যপালনের জন্যই অধিকারলাভ' কথাটা নিয়ে একটু গোল বাধে, অথচ অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজসেবী ওটার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। গান্ধীজীর কাছে তো সেটা ধর্মেরই সামিল ছিল; লাস্কিও বলেছেন :

'My rights are built always upon the relation my function has to the well-being of Society, and the claims I make must, clearly enough, be claims that are necessary to the proper performance of my function.' (*Grammar of Politics*, p. 95.)

সমাজের কাছ থেকে আমার সমস্ত অধিকারের দাবি শুধু এইজন্যই যে সমাজের হিতসাধনে আমি আত্মনিয়োগ করব—এ-কথা যদি-বা সত্য হয়, গণতন্ত্রের বিশেষ

ধর্ম তাকে বলা যায় না। ডিক্টেটরি রাষ্ট্রেও অধিকার ও কর্তব্যের এই ধরনের সমীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়, বরঞ্চ আরো বেশি দেওয়া হয়। ফাসিস্ট ও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রেই ব্যক্তি সমাজের অঙ্গ এবং অঙ্গ ছাড়া আর-কিছু নয়। তাই ব্যক্তির স্বকীয়তাবিকাশের এবং স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য কোনো বিশেষ অধিকার সমষ্টিবাদী সমাজ গ্রাহ্য করে না। কর্তব্যের জন্য অধিকার—এটি সমষ্টিবাদেরই মূলমন্ত্র হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির জীবনের সব ধারাই সমাজের খাতে প্রবাহিত হবে এমন-কোনো কথা নেই। শুধু জৈবিক সুখ সম্ভোগের কথা আমি বলছি না; আমার জীবনের যা শ্রেষ্ঠ ফসল তাও সমাজের নৈবেদ্য সাজাবার জন্য নয়, অন্তত সবটা নয়। আমি যেখানে শিল্পী বা জ্ঞানী, ভগবানের বা মুক্তির সন্ধানী সেখানে আমার সাধনার মূল উৎস সমাজ-হিতৈষণা নয়—যদিও আমার সাধনা সফল হলে সমাজের তাতে লাভ বৈ ক্ষতি নেই। আমি কিছু হতে চাই বা পেতে চাই—এইসব অধ্যাত্মকর্মের মূল প্রেরণা তাই, অন্যকে কিছু দেবার তাগিদ সেখানে গৌণ, অবচেতন। হার্ট্‌মান এ-ধরনের চারিত্রগুণের নাম দিয়েছেন 'radiant virtue'। এমনসব গুণী বা সাধকের কাছ থেকে অন্যেরা আলো পেতে পারে যেমন করে প্রদীপ থেকে লোকে আলো পায়। গ্রহীতা আছে একপক্ষে কিন্তু অন্যপক্ষে কোনো দাতা নেই, আপন তেজে পুড়েই সে আলো দিয়েছে, দান না-করেই সে ধন্য করেছে। অনেক আগে ব্র্যাড্‌লিও চরিত্রের এইসব ব্যক্তিক বা আত্মস্থ সদ্‌গুণের সঙ্গে সামাজিক বা পরার্থী সদ্‌গুণের পার্থক্য নির্দেশ করে গিয়েছিলেন, এবং সেইসূত্রে একটি স্মরণীয় বাক্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন: 'Man is not man at all unless Social, but man is not much above the beasts unless more than Social. (*Ethical Studies*, p. 223.)

বলা বাহুল্য যে মরুভূমি বা তুষারপর্বতে যদি-বা কোনো মানুষ একাকী বাঁচতে পারে, সেখানে একা বসে সে জ্ঞানান্বেষণ কিংবা শিল্পচর্চার কোনো প্রেরণা অনুভব করবে না—করলেও নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু আবশ্যক তার গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবে না সে প্রেরণা। বহু লোকের, বহু বংশের যৌথ ও পরস্পর-সাপেক্ষ চেষ্টার প্রয়োজন এইসবের বৈদগ্ধ্য-সাধনের জন্য। কিন্তু সমাজ-নির্ভর হলেও জ্ঞানী ও শিল্পীর সাধনা মূলত সমাজমুখিন নয়। অথচ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের এই সমস্ত একান্ত ব্যক্তিক ক্ষেত্রেও সমাজের কাছ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সুবিধা (রাজনীতির ভাষায় 'rights') দাবি করব বৈকি? লাস্কি নিজেও স্বীকার করেছেন যে, 'rights are those conditions of human life without which no

man can seek in general to be himself at his best.' এবং এ-কথা সমষ্টিবাদী সমাজের বাইরে নিশ্চয়ই কেউ বলবে না যে সামাজিক মঙ্গলসাধনই একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে a man can seek to be himself at his best. প্রত্যুত্তরে অবশ্য এমন যুক্তি দেখানো সম্ভব যে সমাজ যখন বহু ব্যক্তির সমষ্টি ছাড়া আর-কিছু নয় তখন আমি আমার নিজের ব্যক্তিস্বরূপের পূর্ণতাসাধনে সমাজেরই হিতবিধান করছি। সুতরাং এ-ক্ষেত্রেও সমাজের কাছ থেকে আমার অধিকারের দাবি সামাজিক কল্যাণার্থেই। যুক্তিটা এক হিসাবে ঠিক। তবু এটা মনে রাখা ভালো যে আমাদের কর্ম-প্রেরণার এক ভাগের লক্ষ্য অন্যকে কিছু দেওয়া, অন্য ভাগের লক্ষ্য নিজে কিছু হওয়া বা পাওয়া, এবং উভয় বিভাগে আমরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে আমাদেয় অধিকারের স্বীকৃতি দাবি করি। বরঞ্চ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে প্রথমটার চেয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিকারকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই সব রাষ্ট্রে নয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই লাস্কির এই উক্তি সত্য যে liberty is a product of rights. একনায়কতন্ত্রেও কতকগুলি অধিকার স্বীকৃত হয়—যথা উপযুক্ত বেতন-সহ কর্মের অধিকার, পঙ্গু হলে পেন্সনের অধিকার, সন্তানের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার অধিকার ইত্যাদি। কিন্তু এইসব অধিকারের উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অঙ্গরূপে পুষ্ট করা, রাষ্ট্রের সেবার জন্য প্রস্তুত করা; ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বকীয় যে মর্যাদা তার যথোপযুক্ত স্বীকৃতি নেই সমষ্টিবাদী সমাজে।

কবীর যথার্থই বলেছেন যে একটি বিশেষ শাসনব্যবস্থার নামই গণতন্ত্র নয়, যদিও সেই বিশেষ শাসনব্যবস্থা (অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনবিধি রচনা ও শাসনকার্য চালনা) না-থাকলে গণতন্ত্রের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। গণতন্ত্রের অন্য আবশ্যিক শর্তরূপে কবীর নির্দেশ করেছেন মোট সামাজিক আয়ের সমান বণ্টন, অন্তত বণ্টনব্যবস্থায় বিরাট কোনো অসাম্য না থাকা। এই ধনসাম্য যদি স্থাপন করা হয় উৎপাদনোপকরণের উপর সমষ্টিকৃত আধিপত্য ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা তবে তা সমাজবাদ বলে অভিহিত হয়ে থাকে। কোনো-কোনো মনীষী মনে করেন যে গণতন্ত্র ও সমাজ-বাদের মধ্যে একটি মৌল বিরোধ রয়েছে, কবীর তা মনে করেন না। আগেই বলেছি যে এটাই বর্তমান গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য। এ-বিষয়ে কোনো আলোচনা করবার আগে আমি গণতন্ত্রের আরো দুটি মূল শর্ত বা ভিত্তির কথা বলতে চাই—যার গুরুত্ব পূর্বোক্ত দুটি শর্তের চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়।

কেবলমাত্র শাসনবিধি ও অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় গণতন্ত্র। তার ভিত্তি

আরো গভীরে। মানুষের মনের একটি বিশেষ মেজাজ বা দৃষ্টিভঙ্গির এবং একটি বিশেষ আদর্শের প্রতি আনুগত্য ব্যতীত গণতন্ত্রের পূর্ণ ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সে-মেজাজের গোড়ার কথা হলো **tolerance**—বাংলায় যাকে পরমত-সহিষ্ণুতা বলা যায়। কিন্তু টলারেন্সের অর্থ কেবল পরের মত সহ্য করা নয়। নিজের বা নিজের দলের মত ও পথ আমার বা আমাদের কাছে আপাতত যত সত্য বলেই প্রতিভাত হোক, তাকে অমোঘ কি অকাট্য জ্ঞান না করা, এবং অন্যের বা অন্য-দলের মত ও পথ আপাতত যতই মিথ্যা অথবা অসৎ মনে হোক তাকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখা। হয়তো তাই একদিন সত্য এবং সৎ বলে নিজেকে সপ্রমাণিত করতে পারে এমন-একটি সন্দেহভাবকে মনের কোণে স্থান দেওয়া—এসবই টলারেন্স শব্দার্থের অন্তর্ভুক্ত। গণতন্ত্র কার্যক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ও রুচি-অনুযায়ী চলার নীতি স্বীকার করে; কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভের ফলেই কোনো মত সত্য এবং কোনো রুচি বরেণ্য বলে প্রতিপন্ন হয়ে যায় না। কাজেই সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকেও প্রমাণ করবার বা বিপরীত পক্ষকে দিয়ে মানিয়ে নেবার সর্বদাই সুযোগ দিতে হবে যে তাদের মতই সত্য এবং তাদের আদর্শই শ্রেয়। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, অন্যদিকে সংখ্যালঘিষ্ঠের সম্মান—এই যুগল স্তম্ভের উপর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

স্বমতের যাথার্থ্য ও পরমতের ভ্রান্তি সম্পর্কে একেবারে নিঃসন্দেহভাব যেমন গণতন্ত্রের প্রতিকূল, তেমনি সব সত্যকেই আপেক্ষিক ও সব আদর্শকেই ক্ষণিক জ্ঞান করা-রূপ সর্বগ্রাসী সন্দেহবাদও গণতন্ত্রের বিনাশের কারণ হতে পারে। ভৌগোলিক মরুভূমিতে যেমন মানুষের শরীর বাঁচে না, আধ্যাত্মিক মরুভূমিতে তেমনি মানুষের চিত্ত নিতান্ত অসহায় ও দিশেহারা বোধ করে। মনের মাটিতে কোনো ধ্রুব আশ্রয় যদি কোথাও না-থাকে তা হলে যে মানুষ অধ্রুবতার মধ্যেই স্থির থাকতে পারে এমন নয়, সে তখন ব্যাকুল হয়ে যে-কোনো প্রকারের আপ্তবাক্যকেই আঁকড়ে ধরতে ছোটে—যদি সে-বাক্যের পেছনে গলার, সংখ্যার বা রাজশক্তির জোর থাকে। তাছাড়া আধুনিক রাষ্ট্রের সুদূরপ্রসারী সর্বভুক শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে কোনো নাগরিক যখন নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হয় তখন সে কেবল তার ছোটোখাটো সুখ-দুঃখ বা বৈষয়িক লাভ-ক্ষতির কথাই ভাবে না। জীবনে সে যে-সত্যকে ধ্রুব বলে গ্রহণ করেছে, যে-আদর্শকে মহান বলে বরণ করেছে, তার প্রতিই যখন আঘাত আসে—সে-আঘাত কোনো সর্বাধিনায়কের হাত থেকেই আসুক আর সংখ্যাগুরু কোনো দলের হাত থেকেই আসুক—তখনই তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার প্রকৃত শক্তি সে

খুঁজে পায় নিজের মধ্যে। যদি আপন মতের প্রতি কোনো আস্থাই কোথাও না-থাকে, অর্থাৎ সেটাকে যথার্থ সত্য বলে বিশ্বাস না-করে হাজারটা মতের একটা মত মাত্র ভাবি, তবে তার জন্য প্রাণ কেন কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত দিতে কেউ এগিয়ে আসবে না। এমন অবস্থায় যদি কোনো দোর্দণ্ড-প্রতাপ রাজপুরুষ বা রাজনৈতিক দল সত্যাসত্য ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে দেওয়ার দাবি জানায় তবে সে-দাবি প্রতিরোধ করবার শক্তি এবং প্রেরণা ক'জনের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে ?* নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ী-নিরপেক্ষ সত্যে বিশ্বাস রাখা অথচ পরমতকে সর্বদা অবিচলিত ঔদার্যে ও শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে বিচার করা, ভ্রান্ত জেনেও তাকে অবজ্ঞা না করা— একই চিত্তে এই দুই আপাতবিরোধী মনোভাবের সহভাবিত্ব অত্যন্ত দুঃসাধ্য সে-কথা মানতেই হবে। পনেরো-আনা লোক হয় কোনো সর্বজনীন সত্য বা শ্রেয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, জনে-জনে সত্যের ও শ্রেয়ের প্রতিমানকে ভিন্ন জ্ঞান করে, নতুবা নিজের মত ও আদর্শকে চূড়ান্ত সত্য জেনে অন্যের মতবিশ্বাসের প্রতি খড়্গ-হস্ত হয়ে ওঠে। অথচ কোনো-একটি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সত্য আছে এ-কথা মানার সঙ্গে-সঙ্গে এটা মোটেই অবধারিত হয়ে যায় না যে আমিই সে-সত্যে পৌঁছে গেছি, অন্য মতাবলম্বীরা সবাই ভ্রান্তির তিমিরে মগ্ন। নিরপেক্ষ সত্যের যেমন চরম মূল্য স্বীকার্য, তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের মতন করে নিজের সাধ্য অনুযায়ী সে-সত্যান্বেষণের স্বাধীনতার মূল্যও তেমনি চরম, কোনো অবস্থাতেই তার ব্যত্যয় বা লাঘব ঘটতে দেওয়ার মতো সর্বনাশা বুদ্ধি যেন আমাদের না হয়।

কাজেই গণতন্ত্রের দুটি বাহ্য শর্ত রাষ্ট্রক্ষমতার এবং সামাজিক উৎপাদনের সম-বণ্টনের সঙ্গে-সঙ্গে তার দুটি মানসিক ভিত্তি পরমতসহিষ্ণুতা এবং জাগ্রত সত্য ও শ্রেয়বোধকেও আমি সমান প্রাধান্য দিই। তার মানে এই নয় যে বাস্তবিকক্ষেত্রে যে-রাষ্ট্রগুলিকে আমরা গণতান্ত্রিক বলে জানি তাতে উল্লিখিত সবক'টি শর্ত খুঁজে পাওয়া যাবে, বা কোনো শর্তই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। গণতান্ত্রিকতার দাবি মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রেই বোধ করি সবচেয়ে সোচ্চার এবং আত্মপ্রসন্ন। গণতন্ত্রের পূর্বোক্ত শর্তগুলির মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় শর্ত সেখানে ক্ষীণ, দ্বিতীয় ও চতুর্থ শর্ত প্রায় অনুপস্থিত। গণতন্ত্র আদর্শগতভাবে কী এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তার চেহারা কিরকম এ-দুটো প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট হলেও এক নয়। কবীরের সঙ্গে আমি একমত যে,

* এই প্রসঙ্গের বহুতথ্য-সংবলিত আলোচনা পাওয়া যাবে Polanyi-র *The Logic of Liberty*-নামক গ্রন্থে।

'In addition to the natural fluidity of content in any concept, we have here an additional elememt of uncertainty in the natural human tendency to confuse ideals with actual conditions.' (p. 26)। বলা বাহুল্য উপরে আমরা গণতান্ত্রিক আদর্শেরই বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি, গণতান্ত্রিক বাস্তবের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইনি।

এইবার গণতন্ত্রের প্রথম দুটি শর্তের অন্বয় বা অন্বয়াভাবের সমস্যায় ফিরে আসা যাক। কোনো সন্দেহ নেই যে বংশমর্যাদার অসাম্য যেমন অধিকাংশের জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছিল মধ্যযুগে, তেমনি আজ অর্থনৈতিক সুযোগের অসমতা অধিকাংশের দেহমনের বিকাশকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। এইদিক থেকে বিচার করলে স্বাধীনতা যে সাম্যের উপর নির্ভরশীল সেটা বুঝতে খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার করে না। আর্থিক সাম্য যদি দেবতার বরস্বরূপ পাওয়া যেত এবং কোনো মন্ত্রবলে তাকে রক্ষা করা সম্ভব হতো তা হলে কথা ছিল না। কিন্তু মুশকিল এই যে স্বাধীন সমাজে ধনবণ্টনের সমতা যদি-বা স্থাপিত করা হয়, সেটা দু-দিনেই লুপ্ত হয়ে যায় কারণ যারা প্রকৃতির এক-চোখোমির ফলে অসমান অর্থাৎ অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্থূল-বিবেক তারা মাঝারি মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজের তহবিলে সামাজিক ধনোৎপাদনের মোটা অংশ তুলে নিতে বিলম্ব করবে না। কাজেই ধনসাম্যকে স্থায়ী রূপ দিতে হলে আর্থিক জীবনযাত্রাকে নানাবিধ নিয়মে বাঁধতে হয়, স্বেচ্ছাচারী প্রতিযোগ নীতির স্থলে কেন্দ্রীয় পরিচালনার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এবং তখনই ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে বলে রব ওঠে। সে-রব শুধু ধনিক গোষ্ঠীর স্বার্থ-শিবিরের রণদামামা থেকেই ওঠে না। কবীর যখন বলেন: 'Liberty and Security may be regarded as the systole and diastole of the human mind' তখন একটি বিমূর্ত তত্ত্ব হিসাবে সে-কথা মেনে নিতে বাধা নেই। কিন্তু প্রয়োগকালে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়, কবীরের সুন্দর উপমাটিতে তার নিরসন খোঁজা বৃথা।

একটি বিরাট রাষ্ট্রে গোড়া ঘেঁষে সমাজবাদ পত্তন করবার পূর্ণোদ্যম চেষ্টা চলেছে গত চল্লিশ বছর ধরে, অনেক পরিমাণে সে-চেষ্টার সফলতা আজ অনস্বীকার্য। সেই-সঙ্গে এও দেখা গেছে যে উক্ত রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং rule of law-নামক আধুনিক পাশ্চাত্য ইতিহাসের বহুযত্নলালিত ছোটো চারাগাছটিকে মুচড়ে ফেলা হয়েছিল, আমলাতান্ত্রিক ব্যভিচারে কিংবা অধুনা যার নাম দেওয়া হয়েছে cult of personality তারই তাণ্ডবলীলায় শিল্পসাহিত্য জ্ঞানবিজ্ঞান অধ্যাত্মবিকাশের

যাবতীয় ক্ষেত্র নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত হয়েছিল। ছ-মাস আগে পর্যন্ত এ-নিয়ে তিক্ত বাদানুবাদ চলত, আজ তার ভয়াবহ ইতিবৃত্ত স্বয়ং ক্রুশ্চেভের মুখে উদ্‌ঘাটিত হলো। সমাজবাদের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে কার্যক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই প্রত্যাহার কেমন করে সম্ভব হলো আজ সে-প্রশ্ন সমাজবাদের শত্রু-মিত্র সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। এ কি কেবল স্তালিনের ক্ষমতামদমত্ত স্বেচ্ছাচারের ফল; নানা ঐতিহাসিক কারণে সোভিয়েট সাম্যবাদ যে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল তারই দুষ্ট প্রত্যঙ্গ; চারি দিককার সামাজিক শক্তিগুলির হিংস্র আক্রমণের পৌনঃপুনিক চেষ্টা এবং আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ঘটাবার অবিরাম ষড়যন্ত্রের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া; নাকি সমাজবাদের অন্তরেই এসবের বীজ নিহিত ছিল?

আগেই বলা হয়েছে যে সমাজবাদ বলতে কেবল ন্যায়নীতির সামাজিক প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্যের উচ্ছেদ, ধনের সমবণ্টন প্রভৃতি কয়েকটি উচ্চ আদর্শই বোঝায় না, সেই-সব আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়ার একটি বিশেষ পদ্ধতিও সমাজবাদের অভিধাভুক্ত। সে-পদ্ধতির মূল কথা হলো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পিত অর্থনীতি। অবশ্য আজকের দিনে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা কেবল সমাজবাদের মধ্যে আবদ্ধ নয়। ধনিকতন্ত্রও শত্রুর কাছে পাঠ নিয়েছে, **laissez faire** বা অবাধ অর্থনীতি পরিত্যাগ করেছে, সরকারি নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মানতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ধনতন্ত্রের বুদ্ধিজীবী অধিবক্তারা (উদারপন্থী নামেই তাঁরা পরিচিত, অন্তত পরিচিত হতে ইচ্ছুক) বলেন, তাঁরা যে-নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী তার সঙ্গে সমাজবাদী নিয়ন্ত্রণের প্রভেদ শুধু মাত্রাগত নয়, গুণগত। ক্লাসিকাল অর্থবিজ্ঞানীরা তাঁদের বিজ্ঞানের যেসব নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলি একটি আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার নিয়ম, কোনো বাস্তব সমাজে তা সম্পূর্ণ খাটে না। খাটে না কেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁরা কয়েকটি বিঘ্নবিপত্তির (**friction and disturbances**-এর) কথা বলেছিলেন। উদারপন্থীদের মতে সরকারি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই বিঘ্নগুলি দূর করে এমন-এক সমাজব্যবস্থা প্রণয়ন করা যেটা তাঁদের বিজ্ঞানসম্মত, যেখানে ক্লাসিকাল ইকনমিক্সের নিয়মগুলি অবিকৃত ও অব্যতিক্রান্ত-রূপে প্রযোজ্য। আরো একটু বিশেষ করে বলা যায় যে উদারপন্থী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনিকপক্ষে সর্বগ্রাসী একচেটিয়া ব্যাবসা গড়ে তোলাতে বাধা দেওয়া এবং শ্রমিকপক্ষে যাতে কেউ প্রাণের দায়ে কোনো চুক্তি বা শর্ত মানতে বাধ্য না হয় তার ব্যবস্থা করা (**prevention of necessitious bargaining**)। এরসঙ্গে সমাজবাদী নিয়ন্ত্রণের পার্থক্য সুস্পষ্ট। লিপ্‌ম্যানের ভাষায় দুই নীতির মূল প্রভেদ

হচ্ছে : **'In the liberal philosophy the ideal regulator of the labour of mankind is the perfect market ; in the collectivist philosophy it is the perfect plan imposed by the omnipotent Sovereign.'** (Lippmann, *The Good Society*, p. 236.)

কিন্তু ক্রমশই প্রমাণিত হচ্ছে যে উদারপন্থীরা এই পার্থক্যকে যত দুর্লঙ্ঘ্য জ্ঞান করেছিলেন কার্যক্ষেত্রে তা তত দুর্লঙ্ঘ্য নয়। সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রনেতারা এতদিনকার অভিজ্ঞতায় হৃদয়ঙ্গম করতে বাধ্য হয়েছেন যে অর্থনীতি থেকে মার্কেটের প্রভাব নাকচ করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। বাজারের সঙ্গে উৎপাদন ও বণ্টনের সম্পর্ককে সর্বদা চোখের সামনে না-রাখলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে অরাজকতা ঘটে। অপরপক্ষে উদারপন্থী রাষ্ট্রগুরুরা বুঝতে পারছেন যে একবার নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনার প্রয়োজন স্বীকার করলে তার পরিধি ও গভীরতা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলতে হয়, কোথাও থামতে চাইলেই ঠিক সেইখানটায় থামা যায় না, প্রত্যেকটি পদক্ষেপ তার পরের পদক্ষেপকে অনিবার্য করে তোলে। বিপদ সেইখানে।

এই বিপদের মধ্যে অভয়বাণী শোনা যায় যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে কেবল অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলিকে আনলেই চলবে, জীবনের অবশিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করবার কোনো প্রয়োজন ঘটবে না। অর্থাৎ সমাজ-জীবনের স্থূলবিভাগে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে রাজি থাকি তা হলে ব্যক্তি-জীবনের সূক্ষ্ম ও সুকুমার বিভাগগুলিতে আমাদের স্বাধীনতা আরো পরিপূর্ণ এবং নিরঙ্কুশ হবে। কিন্তু আর্থিক ও পারমার্থিক স্তরগুলিকে এমন একান্ত পৃথক জ্ঞান করা ভুল। মার্কসের ভাষায় একটাকে সামাজিক ইমারতের ভিত এবং অপরটাকে তার চূড়া বললে খুব লাগসই উপমা দেওয়া হয় না যদিও, তবু এটা তো অবিসংবাদিত যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সংস্কৃতির সূক্ষ্মতম বিকাশও উৎপাদনশক্তি এবং উৎপাদন-উপকরণের যথোপযুক্ত প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। এবং মোট উৎপন্ন ধনের কত ভগ্নাংশ সামাজিক ব্যয়ের কোন খাতে প্রবাহিত হবে, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে তার চরম নির্ধারক হবেন কোনো-এক শাসন-পরিষদই। ভাববার কথা এই সমগ্র অর্থনীতির উপর যাদের অধিকার নির্ব্যূঢ় হবে সামাজিক সংস্কৃতির চাবিকাঠিও তাদের হাতেই গিয়ে পড়বে, কারণ **'economic control is not merely control of a sector of human life which can be seperated from the rest, it is the control of the means of all our ends.'** (Hayek, *Road to Serfdom*, p. 68.)

অর্থাৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অনুষঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা অনিবার্য না-হলেও দুর্নিবার হয়ে ওঠে, উৎপাদন-শক্তির সমষ্টিকরণ চুম্বকের মতো টেনে আনে চিন্তাশক্তির সমষ্টিকরণকে। অত্যন্ত সুব্যবস্থিত পরিকল্পনা-চালিত সমাজে মৌলিক মতবিরোধ বা দ্রুত মতপরিবর্তনের অবকাশ নেই। এবং দেশব্যাপী ও দূরদর্শী কোনো পরিকল্পনা গৃহীত হলে তাকে কাজে পরিণত করবার জন্য যত গভীর ও ব্যাপক ঐকমত্যে পৌঁছবেন তখন তাঁদের সেই মত অধিকাংশকে মেনে নিতে বাধ্য করা হবে বলে বা কৌশলে। তাছাড়া আমাদের সকলের জীবিকার একমাত্র নির্ভর হবে সরকারি নিয়োগপত্র, কাজেই আমলাতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শ, রুচি ও খেয়ালের প্রতি আনুগত্য ছাড়া কারুর উপায় থাকবে না। এখন তো তবু একজন বা একদল কর্তার বিরাগভাজন হলে অন্য কর্তার অধীনে কর্ম পাওয়ার আশা আছে, তখন জনগণের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা হবেন সরকার। ত্রত্স্কির সাবধানবাণী আমরা স্মরণ করতে পারি : 'In a country where the sole employer is the State, opposition means death by slow starvation. The old principle – who does not work shall not eat has been replaced by a new one ; who does not obey shall not eat.'

ইত্যাকার অধুনা-প্রদর্শিত অনেকগুলি যুক্তির বিভীষিকার সম্মুখে কবীরের ভরসা যে 'Planning need not necessarily be imposed from above', একটু দুর্বল শোনায় বৈকি। কবীর বলতে চান, 'Just as the political decisions of a democracy are the inter-play of the inclinations, wills and decisions of a multiplicity of individuals, the planning of Welfare State can be the result of the wishes, desires and hopes of all its citizens.' (p. 56)

উদ্ধৃত বাক্যের উপমানটিও পূর্ণ বাস্তবরূপে দেখা দেয়নি কোথাও, উপমেয়র অস্তিত্ব তো একেবারেই কল্পরাজ্যে! কিন্তু যতই দূরবর্তী এবং দুরূহ হোক কোনোটাই অসম্ভব নয়। তবে সম্ভব করতে হলে গণতন্ত্র ও সমাজবাদ উভয় বিষয়ে এবং উভয়ের পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে আরো অনেক ভাবতে হবে, জানতে হবে। ডিক্টেটরি রাষ্ট্রে পুরোদস্তুর প্ল্যানিং-এর বাস্তব চেহারা ইতিমধ্যেই একাধিক ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে, তার দোষগুণ দুই-ই আজ আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত। গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিকল্পিত অর্থনীতির পূর্ণ পরীক্ষা এ-পর্যন্ত কোথাও হয়নি ; ব্রিটেনে, সুইডেনে, নিউজিল্যাণ্ডে যেটুকু চেষ্টা চলেছিল তা জনমতেই অনেকটা স্থগিত,

কতকটা প্রত্যাহৃত। ভারতবর্ষে সম্প্রতি খুব ঘটা করে সমাজবাদী অর্থনীতির সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু সূত্রপাতই। সে-পথে এগুতে হলে যোজনা-সংসদের উচ্চাভিলাষকে আরো খাটো করে নিতে হবে, নাকি ভারতীয় গণতন্ত্রের কচি চারাগাছটি মাড়িয়ে এগুব আমরা—তার উত্তর ভবিষ্যৎই দিতে পারে। এই যাত্রারম্ভের শুভমুহূর্তে যাঁরা কবীরের মতো (আমিও নিজেকে সেইদলের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করি) গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও পরিকল্পিত অর্থনীতির সাযুজ্যে বিশ্বাসী অথচ তার পর্বতপ্রমাণ দুরূহতা সম্বন্ধে সচেতন, তাঁদের বিশেষরূপে বুঝে দেখা দরকার গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার আদর্শ ও পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য কী, ডিক্টেটরি পরিকল্পনা থেকে তার জাতরক্ষা কেমন করে কোন পথে সম্ভব হতে পারে।

উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে দুইপ্রকার পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা সহজ যদিও সে-পার্থক্যের কথা সর্বদা চোখের সামনে রাখা সহজ নয়। সহজ না-হলেও অত্যাবশ্যক। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার চরম লক্ষ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই পরোৎকর্ষসাধন: ধনোৎপাদন ও বণ্টনের সমষ্টিকরণ, শিল্প ও কৃষিকর্মের প্রভূত উন্নতি, সার্বিক প্রাচুর্য ও নিরাপত্তা—সমস্তই তার উপায় মাত্র। অন্য পক্ষে, এ-যাবৎ যে-দুটি প্রধান সর্বাধিনায়কী নিয়ন্ত্রণের পরিচয় আমরা পেয়েছি তার মধ্যে ফাসিস্ট প্ল্যানিং-এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ একটি জাতিকে পৃথিবীর সর্বোত্তম ও সর্ববিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিপন্ন করা, এবং কম্যুনিস্ট প্ল্যানিং-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পণ্যোৎপাদনের অভাবনীয় প্রসার, প্রাকৃত শক্তিকে জয় করে মানুষের ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রয়োজন মেটাবার কাজে লাগানো। মার্কসীয় দর্শনের একজন আধুনিক অধিবক্তার ভাষায়, 'The ever-increasing development of all the productive forces and the resultant improved living standards for all people are at one and the same time the index of social evolution and the rational good of mankind.' (Howard Selsman, *Socialism and Ethics*, p. 112).

কবীর এই প্রশ্নটি তুলেও এড়িয়ে গেছেন। বরঞ্চ তাঁর বিবেচনায় 'it would not be proper for the State to raise these questions (about the increase in the happiness, peace and contentment of the individual), its business is to provide the material conditions which make good life possible.' (p. 53)

রাষ্ট্রের 'business' সুষ্ঠু জীবনের জড় উপাদান মজুত করাই হতে পারে, কিন্তু

তার যাবতীয় কর্মের এই লক্ষ্যটি তার চরম লক্ষ্য না উপলক্ষমাত্র এ-বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না-থাকলে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার স্বরূপ গণতান্ত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করে নায়কতান্ত্রিক লক্ষণাক্রান্ত হতে পারে। শুধু পূর্ণ ও মুক্ত জীবনের অর্থনৈতিক উপকরণ পর্যাপ্ত বা প্রচুর করে দিলেই চলবে না (অবশ্য তা না-করলেও চলবে না); তেমন জীবনের পথে রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক কিংবা শিক্ষাপদ্ধতিগত বিঘ্ন কোনো দিক থেকে আসছে কিনা তার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের চরম উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতাই। এই planning for freedom-এর গণতান্ত্রিক আদর্শকে তুলনা করা যেতে পারে বামপন্থী সর্বাধিনায়কী সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য planning for plenty-র সঙ্গে। ঐ দুইপ্রকার প্ল্যানিং পরস্পর নির্ভরশীল হলেও এক নয়।. স্বাধীনতার ভক্তরা অবশ্য দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান উটপাখির কায়দায়ই করতে চেয়েছেন বরাবর; এবং নায়কতন্ত্রবাদিরা মাত্র ছ-মাস আগে প্রথম আবিষ্কার করলেন যে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য ঘটাতে গেলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবৃদ্ধিরও প্রয়োজন আছে। মার্কস্ যদিও সাম্য-বাদের চরম উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছিলেন : 'That development of human powers which is its own end, the true realm of freedom, which, however, can flourish only upon that realm of necessity as its basis.'

কিন্তু এই আন্দোলনের পরবর্তী নেতা ও ভাবুকরা উদ্দেশ্য এবং উপায়ের মধ্যে একটি মর্মান্তিক গোলযোগ বাধিয়ে বসলেন। কারও অবিদিত নেই যে সাম্যবাদী পরিকল্পনায় শিল্পসাহিত্য দর্শনবিজ্ঞান অর্থনৈতিক উন্নতির অস্ত্ররূপে গণ্য হয়ে থাকে, ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্তত এ-যাবৎ তাই হয়ে এসেছে।

গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে কবীর তার সঙ্গে সকলের, অন্তত অধিকাংশের, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জড়িত করবার কথা বলেছেন। যে-কোনো বৃহৎ রাষ্ট্রের লক্ষ-লক্ষ নাগরিকের ইচ্ছা ও রুচি স্বভাবতই এত বিচিত্র, বিভিন্ন এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী যে সে-সমস্তকেই অক্ষুণ্ণ রেখে কোনো-একটি সুষ্ঠু প্রয়োগসম্ভব পরিকল্পনায় স্থান দেওয়া যায় না। অথচ মোটামুটিভাবে, সম্পূর্ণ না-হোক প্রায়িক, মতসংগতি প্রতিষ্ঠিত না-হলে সমাজবাদী পরিকল্পনা কল্পলোকেই বাস করবে। সমস্যাটি অবশ্য গণতন্ত্রেরই সমস্যা। নায়কতন্ত্র তার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছে শাশ্বত ক্ষাত্রধর্মের মধ্যে। তবে তাদের নির্ভর যে কেবল বিধানকর্তার স্থূল সামরিক প্রতাপের উপর এমন নয়। আধুনিক বিজ্ঞান যেসব নূতনতর সূক্ষ্মতর

বেসামরিক অস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিয়েছে সেগুলির ব্যবহারেও তারা সিদ্ধহস্ত। পাঠশালা থেকে উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের চিত্ত এমন মনোবৈজ্ঞানিক কৌশলে condition করা হয় যে কোনো বিষয়ে কর্তৃবাক্য উচ্চারণ করতে শুধু যে তাদের সাহসের অভাব ঘটে তা নয়, স্বেচ্ছাচারণের প্রবৃত্তিই তাদের মনে বিনষ্ট হয়ে যায়, বাধ্যতার অভ্যাসকে স্বভাবের পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়, হুকুম এবং তামিলের মধ্যবর্তী মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বিলুপ্ত হয়ে অবশিষ্ট থাকে কেবল একটি স্নায়বিক ঘাত, একটি বৈদ্যুৎরাসায়নিক তরঙ্গ। তা না-হলে দুই দশক জুড়ে স্তালিনি ব্যক্তিচর্চার দানবিক পর্ব এমন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারত না।

পক্ষান্তরে, গণতান্ত্রিক আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না-করে মতসাম্যে পৌঁছবার সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি এখন অনাবিষ্কৃত এবং গবেষণাধীন। সুখের বিষয় যে এই গবেষণার গুরুত্ব গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা ইদানীং উপলব্ধি করেছেন।* তাদের আশু সাফল্যের উপর গণ-তন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। যদি কোনো পথ তাঁরা দেখাতে না পারেন তবে নায়কতন্ত্রের কাছে গণতন্ত্রের আত্মসমর্পণ অথবা আত্মস্বরূপ-সমর্পণ অবশ্যম্ভাবী।

উনিশ শতাব্দীর উদারপন্থীদের ধারণা ছিল যে রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-নীতির আদর্শরূপ হচ্ছে তাই যাতে ব্যক্তির উপর বাইরে থেকে কোনো চাপ পড়ে না, যাতে সমস্ত সামাজিক প্রভাব এড়িয়ে সে নিজের অন্তরের গভীরেই খুঁজে পাবে তার পূর্ণতার আদর্শ এবং সে পূর্ণতা-বিকাশের স্বকীয় রীতিনীতি। কিন্তু এ একেবারে অসম্ভব। সমাজের প্রভাব ব্যক্তির উপর পড়েই, শুধু তাই নয়, সে-প্রভাবের মধ্যেই তার ব্যক্তিস্বরূপ ক্রমে-ক্রমে গড়ে ওঠে। মানুষের মন তো আকাশ থেকে নেমে আসে না, আপন পরিণত রূপ নিয়ে মায়ের পেট থেকেও জন্মায় না। পরিবারের, শিক্ষকমণ্ডলীর, বন্ধুবান্ধবদের, সহকর্মীদের, বৃহত্তর সমাজের এবং পূর্বপুরুষাগত ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড় আদান-প্রদানের ভিতর দিয়েই ধীরে-ধীরে ব্যক্তিচরিত্রের রূপ ও রেখা ফুটে ওঠে—যদিও তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বরূপটি অনন্য, সমাজের ছাপমাত্র বা সামাজিক প্রবাহের বুদ্‌বুদ মাত্র নয়। সামাজিক প্রভাবকে কতক পরিমাণে কাটিয়ে উঠবার, কতকাংশে বর্জন করবার শক্তিও ব্যক্তির আছে। কিন্তু সমাজের প্রভাব থেকে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত করা বা রাখার প্রস্তাবকে কবিকল্পনা বলবার মানে এই নয় যে সর্বাধিনায়কী রাজনীতির উল্টো চেষ্টাকে আমরা সমর্থন করব,

* পাঁচ বছর পূর্বে প্রকাশিত Mannheim-এর *Freedom, Power, and Democratic Planning*-কে এই গবেষণার একটি প্রধান স্তম্ভ মনে করা যেতে পারে।

চাইব একটি পূর্বকল্পিত ছকে ফেলে প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত স্বরূপটি গড়ে তুলতে। এটা সম্ভব হলেও ভয়াবহ। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার কাম্য হচ্ছে একটি মধ্যপন্থার সন্ধান, যাতে ব্যক্তি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধীনও নয়, সম্পূর্ণ অতীতও নয়। তাদের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তার মধ্যে সৌসামঞ্জস্য স্থাপন করার চেষ্টা, এবং তাদের স্বাতন্ত্র্যকে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ বলে ধিক্কৃত ও বিলুপ্ত করে সবাইকে এক ছাঁচে ঢালাই করার সংকল্পের মধ্যে প্রভেদ অপরিমেয়।

মানুষ অভ্যাসের দাস, শৈশবকাল থেকে যেসব শিক্ষা-দীক্ষা উপদেশ-অনুশাসন সে পেয়ে আসছে তার আচার-ব্যবহার অনেকটা সেসবের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত সভ্যতাভিমানী মানুষের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া খুব সহজ নয়। স্বকীয় আদর্শে, স্বকীয় রুচি-অনুসারে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে আচরণ করতে ও শিখতে হয়, শিক্ষাচালিত না-হওয়ার জন্যেও একরকমের উল্টো শিক্ষার প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক সমাজ এই দুইপ্রকার শিক্ষাকেই মূল্যবান জ্ঞান করে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে ঠিক নিজের মতো হতে শেখায়, পাঁচজনের মতো হতে শেখায়; তার ব্যক্তিস্বরূপের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথেও তাকে এগিয়ে দেয়, আবার তার ব্যক্তিসত্তায় সমাজ-স্বরূপকে অধিকৃত করতেও সহায়তা করে। ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ততা ততক্ষণই মূল্যবান যতক্ষণ সে অপর-কোনো ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ততাকে আঘাত না-করে, এবং ব্যক্তির সমাজীকরণ—যাকে তার সভ্যতাও বলা যেতে পারে—ততক্ষণই শুভ যতক্ষণ সভ্যতার মুখোশ তার ব্যক্তিস্বরূপকে কুণ্ঠিত বিকৃত বা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত না-করে ফেলে।

হিন্দি, ইংরেজি ও মাতৃভাষা

হিন্দি বনাম ইংরেজি নিয়ে যে-বিতর্ক চলেছে তার পরিধি সম্পর্কে কোনো পক্ষের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। আমাদের সংবিধানপত্রে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে হিন্দিকে কেন্দ্রীয় শাসনকার্যের এবং আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের ভাষারূপে গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। অহিন্দিভাষীদের মধ্যে এতেই আপত্তি উঠেছে; হিন্দিভাষীদের এতেও মন উঠছে না। তাঁরা—অন্তত তাঁদের মধ্যে অনেক প্রোৎসাহী ব্যক্তিরা—চান শুধু সরকারি কাজকর্মে কেন, আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যাবতীয় ক্ষেত্রে ইংরেজির বর্তমান যে-আসন সেটা দখল করবে হিন্দি, হিন্দিকেই আমাদের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হবে, সমগ্র ভারতের একমাত্র জাতীয় ভাষা বলেও এই হিন্দিকেই মেনে নিতে হবে। বাংলা, মারাঠি, তামিল, তেলুগু যেন বিজাতীয় ভাষা। না, বিজাতীয় ঠিক বলা হয়নি, খুব নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিকতার ভান করে আমাদের অন্যসব জাতীয় ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষা সংজ্ঞা দিয়ে কতকগুলি উপভাষা বা পল্লী অঞ্চলের মৌখিক বোলচালের ভাষার স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে প্রায়।

হিন্দি আমাদের 'জাতীয় ভাষা' অর্থাৎ একমাত্র জাতীয় ভাষা—এটা গায়ের জোরের কথা, স্পষ্টতই তথ্যের অপলাপ। উৎসাহের চোটে যাঁরা তথ্য আর কল্পনার ভেদ লোপ করে বসেননি, তাঁরা বলবেন, আজ নয় বটে কিন্তু হবে একদিন। কেমন করে হবে? হিন্দি যদি ভারতবর্ষের অত্যধিকসংখ্যক লোকের, অন্তত অধিকাংশের ভাষা হতো, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা, হিন্দিভাষীরা যদি ভারতময় সর্বত্র সমানে ছড়িয়ে ও মিলেমিশে থাকতেন তা হলেও একটা কথা ছিল। তা হলে আমরা আশা করতে পারতাম যে এ-দেশে হিন্দি একদিন তেমনি স্বাভাবিকভাবে সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাষা হয়ে উঠবে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নানা ভাষাভাষীর সমাবেশ থাকলেও ইংরেজিই হয়ে উঠেছে তাদের সকলের একমাত্র জাতীয় ভাষা। কিন্তু এখানে অবস্থা প্রায় বিপরীত। হিন্দিভাষীদের সংখ্যা সমগ্র লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের অধিক নয় এবং তাঁদের পরিব্যাপ্তি দেশের উত্তর ও মধ্যভাগেই আবদ্ধ। পক্ষান্তরে, পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে অন্য-কয়েকটি ভাষার স্বতন্ত্র বিস্তার, সংখ্যায় সেসব ভাষাভাষীরা পৃথকভাবে হিন্দিভাষীর তুল্য না-হলেও তাদের

সঙ্গে তুলনীয়, প্রকাশশক্তিতে ও সাহিত্যসম্পদে আমাদের একাধিক ভাষা হিন্দির চেয়ে অগ্রসর।

না, আমাদের 'জাতীয়' ভাষা হিন্দি এখন নয়, স্বাভাবিকভাবে ভবিষ্যতে হয়ে উঠবার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। তবু হিন্দির পক্ষপাতীরা বলতে পারেন, আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টার দ্বারা সেটা সম্ভব করে তুলতে হবে। অর্থাৎ তথ্য নয়, ভবিষ্যৎবাণী নয়, এ হলো আমাদের সংকল্প। কিন্তু কেন এই সংকল্প এবং চেষ্টা? উত্তরে যে-কথাটা সবচেয়ে আগে শোনা যায় আর সবচেয়ে জোরালো শোনায় তা এই: প্রায় হাজার বছর পর ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে আমরা আবার একটি স্বাধীন জাতিরূপে গড়ে উঠেছি, বিশ্বের দরবারে আমাদের অস্তিত্ব আবার সগৌরবে ঘোষণা করেছি। আমাদের এই নবলব্ধ স্বাধীনতার একাধারে ভিত্তি ও প্রতীক-স্বরূপ একটি 'জাতীয় ভাষা' থাকা একান্ত আবশ্যক। হাজার বছর আগে এ-দেশের জাতীয় ভাষা ছিল সংস্কৃত; নানা কারণে আজ সংস্কৃত সে-স্থান পুনরধিকার করতে অক্ষম। বর্তমানকালের কোনো জীবিত এবং চলিত ভাষাকেই সে-অধিকার দিতে হবে। কোনো-একটি ভারতীয় ভাষাকে যদি সে-অধিকার দিতে হয় তবে হিন্দির দাবিই যে সর্বাগ্রগণ্য তাতে আর সন্দেহ কী! আমাদের সন্দেহ অধিকারীকে নিয়ে নয়, অধিকারের অস্তিত্ব নিয়েই।

জাতীয় সত্তার উপাদানে অনেকগুলি উপকরণ দেখা যায়—ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ইত্যাদি। তার কোনোটা মুখ্য কোনোটা-বা গৌণ, কিন্তু কোনো উপকরণকেই অপরিহার্য বলা যায় না। ভাষাগত ঐক্য অবশ্য গুরুত্ব-পূর্ণ, তবু তার অভাবে যে জাতীয় ঐক্য ভেঙে যাবে এমন নয়। চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি সুইট্জারল্যাণ্ড, ক্যানাডা, যুগোস্লাভিয়া তাদের জাতীয় ঐক্য দিব্যি গড়ে তুলেছে দুটি বা তিনটি ভাষাকে 'জাতীয় ভাষা' বলে স্বীকার করে। বরঞ্চ কোনো-একটি ভাষার প্রতি রাষ্ট্রীয় পক্ষপাত দেখাতে গেলেই তাদের জাতীয় সত্তা হতো বিখণ্ডিত। এই সত্যটি আমাদের বেলা আরো প্রকট। তাছাড়া ভারতভূমিকে আমরা মিলনতীর্থ বলে বর্ণনা করি, এবং তাতে গৌরব বোধ করি। বিভেদ এমন-কি বিপরীতকেও গ্রহণ করে আমাদের ঐক্যের সাধনা চলে আসছে, চলবে। আমরা কেন লজ্জা পাব এ-কথা সবাইকে জানিয়ে দিতে যে আমাদের জাতীয় ভাষা একটি নয়, হিন্দি, তামিল, ওড়িয়া, মারাঠি ইত্যাদি এই বারো-তেরোটি ভাষাই আমাদের জাতীয় ভাষা।

'জাতীয় ভাষার' সঙ্গে-সঙ্গে বা তার বিকল্পে 'রাষ্ট্রভাষা' কথাটাও ইদানীং খুব

শোনা যাচ্ছে। হিন্দি সম্পর্কে প্রযুক্ত এই উভয় বিশেষণ-পদেই এক বিশেষ মর্যাদা ও গৌরবের দাবি নিহিত রয়েছে। আমাদের সংবিধানপত্রে কিংবা ভাষা কমিশনের রিপোর্টে ঐ-শব্দগুলি অবশ্য অনুপস্থিত, কিন্তু তার পৌনঃপুনিক বেসরকারি ব্যবহার পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রভাষা শুনলেই সহজেই রাষ্ট্রধর্ম বা 'স্টেট্ রিলিজন'-এর কথা মনে আসে। এ-দেশে প্রচলিত পাঁচ-ছয়টি ধর্মের মধ্যে কোনো ধর্মকেই 'রাষ্ট্রধর্ম' আখ্যায় বিভূষিত না-করে আমাদের সংবিধানকর্তারা খুবই সুবুদ্ধি ও প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। কোনো-একটি ধর্ম 'রাষ্ট্রধর্ম' অর্থাৎ রাষ্ট্রের দ্বারা বিশেষরূপে সম্মানিত বা রাজানুকূল্য-গর্বিত ধর্ম হলে স্বভাবতই অন্য ধর্মাবলম্বীরা নিজেদেরকে অবহেলিত এবং অবাঞ্ছিত জ্ঞান করতেন। 'রাষ্ট্রভাষা' কথাটাতেও এমন একটি পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ এবং বহুভাষা-বিশিষ্ট রাষ্ট্র। 'রাষ্ট্রধর্ম' বা 'রাষ্ট্রভাষা' পদগুলি এখানে অনর্থক বিপদ ডেকে আনবে, ঈর্ষ্যা বিক্ষোভ ও অপ্রীতির ইন্ধন জোগাবে।

অবশ্য 'রাষ্ট্রভাষা' মানে যদি হয় কেবল সরকারি কাজকর্মের ভাষা, সে অন্য কথা। কিন্তু সে-কথা আলোচনা করবার আগে স্বাধীন ভারতের ভাষাসমস্যাকে আরো একটু বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাক। মানুষের কাজকর্ম চলে ভাষার মাধ্যমে, কিন্তু কর্মজীবনের উপরেও তার একটা জীবন আছে যাকে তার মনোগত জীবন বলা যেতে পারে। সেখানেও ভাষার গুরুত্ব কিছু কম নয় এবং সেখানেও স্বাধীনতালাভের পর কতকগুলো প্রশ্ন উঠেছে। আমাদের মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা, বিদ্যানুশীলন, সাহিত্যসৃষ্টি, পৃথিবীর (বিশেষত পাশ্চাত্যের প্রাগ্রসর দেশগুলির) সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও অন্যবিধ যোগরক্ষা—এসব ক্ষেত্রেও আমাদের ভাষাসমস্যার নতুন সমাধান খুঁজতে হচ্ছে। এতদিন ইংরেজিকেই আমরা ঝালে ঝোলে অম্বলে এবং সন্দেশেও লাগিয়ে এসেছি। কিন্তু চিরদিন তো তা চলে না, চলা উচিতও নয়। আমাদের ভাবতে হচ্ছে ইংরেজিকে সরাসরি বিদায় দেব, না কি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজির উপকারিতা এখনো পূর্ববৎ রয়েছে। ইংরেজি যদি যায় তবে তার শূন্য আসনের সবটুকু জুড়ে কি কোনো-একটি ভারতীয় ভাষাকে বসানো যায় ? আমাদের মাতৃভাষাও খুব বড়ো দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সে-দাবি অবশ্য মেটাতে হবে, অথচ মাতৃভাষাকে দিয়ে আমাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটবে না। বাংলা কি তামিল তো আর কেন্দ্রীয় শাসনের ভাষা হতে পারে না।

নতুন যুগের নতুন আলো-হাওয়া লেগে যে-সাহিত্যসৃষ্টির অনুপ্রেরণা জেগেছিল তার বাহন কী হবে এ নিয়ে মাইকেল মধুসূদনের সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভে একটি

দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল। সে-দ্বন্দ্বের মহৎ সমাধান মাইকেল স্বয়ং করে দিলেন বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে মহাকাব্য রচনা করে। তার পর থেকে মাতৃভাষাই সাহিত্যকর্মের একমাত্র মাধ্যম বলে গণ্য হয়ে আসছে—যদিও এক-আধজন ভারতীয় আজও ইংরেজি ভাষাতেই আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন আমাদের প্রতিভাবান প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। কিন্তু এঁরা নেহাৎই ব্যতিক্রম। সৃজনী সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা যে মাতৃভাষাতেই সম্ভব এ-কথা এখন আর তর্কসাপেক্ষ নয়। তবে এ-ও তর্কাতীত যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও চিন্তার রক্তপ্রবাহের সঙ্গে ইংরেজি ভাষা আমাদের যে নাড়ির যোগ ঘটিয়েছিল তাকে ছিঁড়তে গেলে ভারতীয় সাহিত্যগুলি রক্তাল্পতা দোষে পাংশুবর্ণ হয়ে পড়বে। প্রাণে মরবে না হয়তো, হয়তো-বা হেঁটেও চলতে পারবে, কিন্তু ছুটে চলবার বল আর থাকবে না তাদের দেহে।

মানবিক বিদ্যা বা হিউম্যানিটিজ্ এবং প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের কাছে আমাদের ঋণ আরো অপরিমেয়। কিন্তু অতীতের ঋণস্বীকারের কথা শুধু এ নয়। বর্তমানকালে এগিয়ে চলতে হলে আমাদের বিদ্যানুরাগী ও বিদ্বানদেরকে সাহিত্যিকদের অপেক্ষাও তৎপর এবং তৎসাময়িক সম্বন্ধ রক্ষা করতে হবে পাশ্চাত্য চিন্তার দ্রুত প্রবাহের সঙ্গে। তাই ইংরেজি ভাষাচর্চার সংকোচন নয়, সম্প্রসারণের কথাটাই বিবেচ্য। এ তো গেল আহরণের দিক। প্রকাশের দিকে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানীদের নিবন্ধ-রচনায় ভাষার স্থান খুবই সংকুচিত, তাতে বারো-আনাই পারিভাষিক ও সংকেত নিয়ে কাজ। সুতরাং ইংরেজি-হিন্দি-মাতৃভাষার বিতর্ক সেখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোনো ভাষাতেই লিখতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করবেন না কেউ। ঠিক-ঠিক জায়গায় লেখাটা পৌঁছতে পারলেই হলো। ঐ-ব্যাপারে অবশ্য ইংরেজির উপকারিতা অগ্রাহ্য করা যাবে না। কিন্তু মানবিক বিদ্যার বেলা, বিশেষত দার্শনিক ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্ষেত্রে, মনের স্ফুরণ অনেকখানি ভাষা-নির্ভর। ভাষার নিগূঢ় বোধ এবং রচনাশক্তির সহজ স্বাচ্ছন্দ্য না-থাকলে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর নয়। অর্থাৎ মাতৃভাষার আশ্রয়—আজকে সম্ভব না-হলেও দশ-বিশ বছর পর—আমাদের নিতেই হবে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে সাহিত্যে, মানবিক বিদ্যায়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে, অর্থাৎ চিৎপ্রকর্ষের সকল ক্ষেত্রে পথরেখা চিহ্নিত হয়ে উঠছে (এবং নিঃসন্দেহে তাই হওয়া উচিত) ইংরেজি ভাষা থেকে মাতৃভাষার দিকে—ইংরেজিকে সম্পূর্ণ বর্জন না-করে অবশ্য। এসব বিভাগে হিন্দির সার্থক ভূমিকা কেবল তাঁদের জন্যই যাঁদের

মাতৃভাষা হিন্দি। অহিন্দিভাষীরা হিন্দির কাছ থেকে পাওয়ার মতো কিছু পেতেও পারেন না, হিন্দিকে দেবার মতো কিছু দিতেও পারেন না।

শিক্ষার বাহনের প্রশ্নে মতভেদের অবকাশ আরো কম। ইস্কুলের শিক্ষা যে মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত এ আজ সর্ববাদীস্বীকৃত। কলেজি শিক্ষার ব্যাপারেও অধিকাংশের মত তাই। কেউ-কেউ অবশ্য (যেমন সরকারি ভাষা কমিশনের সদস্য আর. কে. ত্রিপাঠি) বলেছেন বটে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যম হিন্দি হওয়া আবশ্যক, নইলে সমমান রক্ষা হবে না। শিক্ষার বাহন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সারগর্ভ প্রবন্ধগুলি আমাদের সকলের পড়া আছে। অন্তত বাঙালি পাঠককে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে, সর্বস্তরের শিক্ষা মাতৃভাষাতে না-হলে চিত্তের পূর্ণ উন্মেষ এবং বিদ্যার সম্যক্ আত্তীকরণ সম্ভব নয়। তবু হয়তো আরো কিছুকাল আমাদের ইংরেজি ভাষার উপর নির্ভর করতে হবে,—যতদিন-না আবশ্যক পাঠ্যপুস্তক এবং বিবিধ বিষয়ে কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থাদি মাতৃভাষায় রচিত হচ্ছে। হিন্দিকে শিক্ষার বাহন করলে আমরা (অহিন্দিভাষীরা) ইংরেজির সমস্ত সুবিধাই হারাব, মাতৃভাষার কোনো সুবিধাই পাব না, এবং উভয়ের ভিন্ন-ভিন্ন অসুবিধার একত্রিত চাপে আমাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাকে বানচাল করে 'রাষ্ট্রভাষা'র ছত্রছায়াতলে সুখ-নিদ্রা দিতে পারব। বিভিন্ন রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সমমান রক্ষা করাটা এমন-কিছু মহৎ কর্ম নয় যে তার দোহাই পেড়ে উচ্চশিক্ষার একেবারে গোড়ায় আঘাত করা যেতে পারে।

জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির এই পটভূমিকার উপর এবার সরকারি ভাষার প্রশ্নটাকে তুলে ধরা যাক। কোনো সন্দেহ নেই যে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান যত ঘুচবে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্রের রূপ ততই পরিস্ফুট হবে। সেজন্য রাজার ভাষা আর প্রজার ভাষা অভিন্ন হওয়াই বিধেয়। আমাদের বহুভাষী দেশে কেন্দ্রীয় সরকার এ-নীতি পালন করতে পারেন না। কিন্তু রাজ্যসরকার পারেন, কারণ রাজ্যগুলি মোটের উপর ভাষার ভিত্তিতেই গঠন করা হয়েছে। রাজ্যসরকারের ভাষা যে সেই রাজ্যের ভাষা হবে এ-বিষয়ে সংবিধানে কোনো নির্দেশ না-থাকলেও সুস্পষ্ট অনুমোদন আছে। সদ্য প্রকাশিত সরকারি ভাষা কমিশনের রিপোর্টেও এর পক্ষেই রায় দেওয়া হয়েছে। অতএব এ-সমস্যাটা নিয়ে নতুন করে ভাববার কিছু নেই। আমাদের ভাষা প্রসঙ্গে যে-প্রশ্ন এখনো তর্কসাপেক্ষ সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় শাসনকার্যের এবং কেন্দ্র-প্রান্ত যোগাযোগের ভাষার প্রশ্ন। এর দুটি উত্তর কার্যকরী বিবেচনার যোগ্য—হয় ইংরেজি ভাষা দিয়েই আমাদের

কাজ চলবে, নয় তার স্থলে হিন্দিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভারতবর্ষের সবকটি জাতীয় ভাষাকে সর্বভারতীয় সরকারি ভাষা করতে পারলে গণতান্ত্রিক অধিকারের দিক থেকে সবচেয়ে সংগত হত, কিন্তু দিনানুদৈনিক শাসনকার্যের প্রত্যেকটি সরকারি কাগজপত্র যুগপৎ বারোটি ভাষায় প্রস্তুত করার ব্যবহারিক অসুবিধা এত প্রচুর হবে যে, এই প্রস্তাবটির স্বপক্ষে অধিক যুক্তিবিস্তার কেজোবুদ্ধি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে।

ইংরেজি ভাষার উপর আমাদের রাগ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। ইংরেজি যে ইংরেজের ভাষা—সেই ইংরেজ যারা এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের উপর প্রভুত্ব করে গেছে। ঐ-প্রভুদের দপ্তরে আমরা মুন্সি-মুহুরির কাজ করব তাই তো আমাদের ইংরেজি শেখানো হয়েছিল। আজ স্বাধীন ভারতের উচ্চতম রাষ্ট্রিক প্রয়োজন মেটাবে সেই ভাষা! কিন্তু ইতিমধ্যে ইতিহাসের অনেকগুলি পাতা উল্টে গেছে; এখনো কি আমরা আগের পাতার রাগটাকে পরের পাতায় টেনে চলব? রাগ জিনিসটা সর্বদাই হানিকর, আর শত্রু যখন সাতসমুদ্রপারে তখন পাত্রহীন রাগের ঘায়ে আমরা নিজেদেরই অঙ্গহানি করছি কিনা সেটা বুঝে দেখা দরকার। অবশ্য স্বদেশের কাজে বিদেশের ভাষা খামাকা কেউ টেনে আনতে যায় না। কিন্তু আমরা যে দায়ে ঠেকেছি। দায় এই নয় যে, আমাদের নিজের বলতে কোনো ভাষা নেই; দায় এই যে, নিজের ভাষা একটি নয়, এক ডজন। এদের মধ্যে কোনো-একটিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা করতে গেলে সেই ভাষা যাঁদের মাতৃভাষা তাঁদের অযথা অনেকগুলি সুবিধা করে দেওয়া হয়, আর অন্য ভাষাভাষীদের জন্য বিনা পাপেই গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা। এহেন সংকটে (উভয় সংকট নয়, দ্বাদশ সংকটে) যদি ইংরেজি ভাষাতে কেন্দ্রীয় দপ্তরের কাজ চালিয়ে গেলে গ্রহশান্তি ঘটে তবে তাতে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হচ্ছে? শুধু বিদেশি বলেই কি বর্জনীয়? কিন্তু ভাষা কমিশনের হিন্দিপক্ষের সভ্যরা পর্যন্ত মন্তব্য করেছেন, 'ইংরেজি ভাষা বিদেশী বলেই অগ্রাহ্য হতে পারে না। আমরা স্বীকার করি যে, কোনো ভাষা কোনো জাতিবিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়; ভাষা তাদেরই যারা সে-ভাষার সদ্ব্যবহার করতে পারে।' আর এমন তো নয় যে শুধু সরকারি কাজকর্মের জন্যই ইংরেজি শিখতে হচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে যে, ইংরেজি শিক্ষার ধারা দেশের মহত্তর প্রয়োজনের তাগিদেই আমাদের বলবৎ রাখতে হবে। সেই প্রয়োজনসাধনের উপরিপাওনা হিসেবে যদি কেন্দ্রীয় সরকারি কাজও চলে তবে ভারতবর্ষের দুই-তৃতীয়াংশের উপর অতিরিক্ত একটি ভাষা চাপানো কেন?

ইংরেজির বিরুদ্ধে আমাদের যে-আপত্তি সেটা যুক্তিপ্রসূত নয়, চোদ্দ-আনাই সংস্কারগত বা আবেগজনিত। তার আলোচনায় অধিক সময় নষ্ট না-করে বরং হিন্দির স্বপক্ষের যুক্তিগুলি বিচার করে দেখা যাক। সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো যুক্তি এই যে, হিন্দি এ-দেশেরই ভাষা এবং এক-তৃতীয়াংশের মাতৃভাষা। যাঁদের মাতৃভাষা নয়, তাঁদের মধ্যেও হিন্দির অল্পবিস্তর চল আছে, 'টুটিফুটি' হিন্দিতে কাজ চালিয়ে নিতে পারেন অনেকেই। এ-কথা ঠিক যে, কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত না-হলেও তার একটু আগে অবধি একপ্রকার ছন্নছাড়া ব্যাকরণভাঙা শ' দুই শব্দ সম্বলমাত্র একটি ভাষা চল্‌তি আছে যাকে হিন্দুস্থানি বলা হয়ে থাকে। আসলে তাকে কিন্তু লক্ষ্ণৌ-দিল্লী অঞ্চলের আচারনিষ্ঠ কৌলিন্যাভিমানিনী খাড়িবোলি হিন্দির অপভ্রংশ বললেও বেশি বলা হয়; সেটা কোনো ভাষাই নয়, ভাষার ভেংচিকাটা মাত্র। যে-ভাষায় আইন-কানুন ও সংবিধান রচিত হবে, প্রতিবেদন এবং প্রত্যাদেশ লিপিবদ্ধ হবে, হাইকোর্টে জজ রায় শোনাবেন, লোকসভায় রাজ্য-সভায় রাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে শাণিত শোভিত এবং সাবধানী বাক্য-বিস্তার হবে—তাকে ঐ-অপভাষার সমগোত্র ভাবতে গেলে কষ্টকল্পনাও ফেল মারবে।

যে-হিন্দি সরকারি ভাষা হবে অহিন্দিভাষী সবাইকে তা শিখতে হবে বহু বৎসর ব্যাকরণ মুখস্থ করে, অভিধানে হাবুডুবু খেয়ে। এ-ভাষাতে লিঙ্গ-বিভক্তি থাকায় এবং অন্যান্য বিভক্তি (মায় ক্রিয়া-বিভক্তি) তারই আজ্ঞাবহ বলে এই নিয়ম ও ব্যতিক্রমের গোলকধাঁধায় বহুদিন ঘুরেও 'রামনে বড়ী লম্বী দাঢ়ী বঢ়াই হৈ' কিংবা 'নির্মলানে বড়া সুন্দর দুপট্টা ওঢ়া থা' দুরস্ত করে বলতে গিয়ে আমাদের বারকয়েক ঢোক গিলতে হবে। অনেক বছর বাধ্যতামূলক হিন্দি শিক্ষার পরও উত্তর ভারতে পা বাড়ালেই পদে-পদে শুনতে পাব 'য়হ্‌ হিন্দি বোল্‌তে হৈঁ য়া হিন্দি কী টাঁগেঁ তোড়তে হৈঁ!' অথবা মাতৃভাষাভিমানীদের সৌজন্যপূর্ণ সাধুবাদ এবং অনতিগুপ্ত কৃপাকণা কুড়িয়ে আমাদের দীর্ঘ পরিশ্রমকে সার্থক জ্ঞান করব আমরা। ভাষা-শিক্ষার বিশেষ প্রতিভা আছে যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের তাঁদের কথা অবশ্য আলাদা। সুশিক্ষিত 'অহলে জবানদের' হিন্দি বা হিন্দুস্থানির বাঁকাপন্‌ আর নজাকত্‌ আমার প্রশংসা জাগায়, কিন্তু তা নির্ভর করে এমন-সব সূক্ষ্ম ও বিশিষ্ট প্রয়োগরীতির উপর যা বিভাষীরা দু-চার বছরের চেষ্টায় আয়ত্ত করতে পারবেন—এমন আশার ছলনে যেন তাঁরা না-ভোলেন।

হিন্দি রাজভাষারূপে বৃত হলে অহিন্দিভাষীরা যে কেবল কর্মজীবনে নানারূপ অসুবিধা ভোগ করবেন তাই নয়, জীবনযাত্রা তাঁদের আরম্ভই হবে স্বল্পতর পাথেয়

হাতে নিয়ে। যেখানে হিন্দিভাষীরা দুটি ভাষার সহায়তায়ই (হিন্দি ও ইংরেজি) তাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারবেন সেখানে বেচারী অহিন্দিভাষীর ছাত্রজীবনকে তিনটি ভাষার বোঝা পঙ্গু করে রাখবে। মনে রাখা দরকার যে যেমন-তেমন করে হিন্দি শিখলে চলবে না, সে-ভাষার উপর উত্তমরূপে দখল থাকা অত্যাবশ্যক হবে, কারণ, প্রতিযোগীদের মধ্যে অনেকের মাতৃভাষা হবে হিন্দি। আর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রও দিনে-দিনে বেড়ে চলেছে, যেহেতু সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সংখ্যা এবং তাদের জীবনের বিরাট অংশ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও পরিচালনার (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের) অধীনে এসে পড়ছে।

অন্তত শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে এ অসহনীয় অসমতা দূর করবার জন্য কেউ-কেউ প্রস্তাব করেছেন হিন্দিভাষী ছাত্রদেরও অন্য একটি ভারতীয় ভাষা শিখতে বাধ্য করা হোক। ভাষা কমিশনের অধিকাংশ সদস্য অবশ্য এতে আপত্তি জানিয়েছেন। বলেছেন, অহিন্দিভাষী ছাত্রদের পক্ষে হিন্দি তো বিঘ্ন নয়, সুযোগ; হিন্দি শিখলে কত সুবিধে তাদের! কিন্তু হিন্দিভাষী ছাত্ররা আর-একটা ভারতীয় ভাষা শিখতে যাবে কিসের গরজে? এই বোঝা তাদের ওপর চাপানো যায় না, স্বেচ্ছায় তারা শিখতে চায় শিখুক। চমৎকার যুক্তি। এ-যুক্তি আশাকরি পার্লামেণ্ট অগ্রাহ্য করবেন—যদি অবশ্য সাম্য ও সৌভ্রাত্রের সম্যক্ অর্থ তাঁদের পক্ষে ইতিমধ্যে অনধিগম্য না-হয়ে গিয়ে থাকে। তবু ভেবে দেখা উচিত সকল ছাত্রের উপর তিনটে (সংস্কৃত অবশ্য-শিক্ষণীয় হলে চারটে) ভাষার বোঝা চাপিয়ে তাদের শিক্ষাকে পঙ্গু করে রাখা কি বাঞ্ছনীয়? এতগুলি ভাষা শিখবার পর অন্য কিছু শিখবার সময় ও শক্তি কি তাদের অবশিষ্ট থাকবে?

সম্প্রতি অনেকে বলতে শুরু করেছেন যে ইংরেজির দ্বারা গণসংযোগ (mass communication) সম্ভব নয়, তাই গণতন্ত্রের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা করা যায় না। যদি গণসংযোগ মানে হয় জনগণের সঙ্গে গণনায়ক এবং রাজপুরুষদের সংযোগ তবে ইংরেজির অসুবিধা স্বীকার করি। কিন্তু হিন্দিকে রাজভাষা করলেই-বা কোন সুবিধা হবে? অসমীয়া, মালয়ালি, মহারাষ্ট্রীয় জনগণের সঙ্গে যদি নেতৃবৃন্দ এবং কর্তৃপক্ষরা আত্মীয়তা স্থাপন করতে চান তবে তাঁদের দয়া করে অসমীয়া, মালয়ালম, মারাঠি ভাষাতেই কথাবার্তা বলতে হবে, বক্তৃতা করতে হবে, পত্রিকা-পুস্তিকা প্রকাশ করতে হবে। কোটি-কোটি নিরক্ষর-সাধারণ তাঁদের মাতৃভাষা ছেড়ে বা তদুপরি আর-একটা ভাষা শিখবেন কয়েক-হাজার বহুব্যয়ে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত উপরওয়ালাদের সুবিধার জন্য—এ যে বড়ো অকরুণ

বিধান। শুধু অকরুণ নয়, অবাস্তবও বটে। যে-দেশে আরো কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কল্পিত ও অনুষ্ঠিত হবার পরও জনসাধারণের শুধুমাত্র মাতৃভাষারও অক্ষর পরিচয় হবে কি না ঈশ্বর জানেন, সে-দেশে সবাই একটি অতিরিক্ত অপেক্ষাকৃত দুরূহ ভাষাও শিখে ফেলবে কেবল গণসংযোগের মন্ত্রোচ্চারণে—একি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম।

আর গণসংযোগ মানে যদি হয় জনগণের পরস্পর যোগ, তবে কি সরকার বিনা ভাড়াতে রেলের টিকিট বিতরণ করবার কথা ভাবছেন? যাদের আমরা ম্যাসেস্ বলে থাকি তারা লাখে-লাখে দেশভ্রমণ করতে বা স্বদেশবাসীর তত্ত্বতালাশ নিতে বাংলা থেকে মহীশূর কিংবা গুজরাত থেকে উড়িষ্যাতে ঘুরে বেড়ায় না। অল্প-সংখ্যক যারা তীর্থ করতে বা জীবিকার অন্বেষণে বেরোন, তাঁরা ভাঙাচোরা হিন্দিতেই কিংবা যেখানে গিয়ে বসবাস করবেন সেখানকার বুলি অল্পস্বল্প রপ্ত করে একরকম কাজ চালিয়ে নেন। এর জন্য পঁয়ত্রিশ কোটি লোককে আট বছর ধরে বাধ্যতামূলক হিন্দিশিক্ষা দেবার ফরমাশটা একটু তুঘলকশাহি শোনায় বৈকি।

হিন্দির সমর্থনে বামপন্থীরা যে-যুক্তির উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেন সেটা হিন্দির পক্ষে ততটা নয় যতটা ইংরেজির বিপক্ষে। হিন্দিভাষী প্রাচীনপন্থীদের মধ্যেও হিন্দির পক্ষপাতিত্ব ইংরেজি-বিরোধিতার প্রকারভেদ। এঁদের আপত্তি যে ইংরেজি শিখে আমাদের ছেলেরা স্বজাতির প্রাচীন ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়, দেবদ্বিজে ভক্তি হারায়, ইত্যাদি। একই উদ্দেশ্যে বামপন্থীরা ভিন্ন কথা বলেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে যাঁরা ইংরেজি ভাষা তথা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও ভাবধারার সবিশেষ অনুশীলন করেন তাঁরা নিজেদেরকে একটি অভিজাত বা বিদগ্ধ সম্প্রদায় বলে ভাবতে শেখেন, তাঁদের সঙ্গে ইংরেজি না-জানা আপামর সাধারণের মনের অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটে যায়। কেন্দ্রীয় শাসনের ভাষা ইংরেজি থাকলে এরাই সরকারি উচ্চ-পদগুলি দখল করে বসবেন, অথচ দেশের লোকের সঙ্গে এঁদের যোগ কতটুকু! এঁরা দেশের সেবক হবেন না, প্রভু হয়েই বিরাজ করবেন।

এর উত্তরে কয়েকটি কথা বলার আছে। প্রথমত, যাঁরা ইংরেজির বিরুদ্ধে এই-ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করেন তাঁরা অন্তত প্রকাশ্যে সরকারি দপ্তর থেকেই ঐ-ভাষাটাকে তাড়াতে চান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে নয়। কিন্তু সে-অবস্থায় ইংরেজি-শিক্ষিত বিদগ্ধ গোষ্ঠী বহাল তবিয়তেই থাকবেন; যে-ব্যাপারটা নিয়ে আপত্তি তার তো কোনো সুরাহা হবে না। নাকি পূর্বোক্ত যুক্তিধারীদের প্রস্তাব এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি শেখানো চলবে বটে কিন্তু যাঁরা ইংরেজি ভালো-

মতো শিখবেন তাঁরা কোনো সরকারি চাকরি অন্তত কোনো উচ্চ পদ পাবেন না —অন্যসব যোগ্যতা থাকলেও। স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই বোধহয় যে গোখলে গান্ধী নেহরু চিত্তরঞ্জন—এঁরা সবাই ইংরেজি ভাষা ও ভাবধারার সঙ্গে খুবই পরিচিত ছিলেন, অথচ তার ফলে তো এঁরা দেশের লোকের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েননি, দেশসেবার যোগ্যতাও হারাননি।

দ্বিতীয়ত, ইংরেজির বদলে হিন্দি ভাষায় পারদর্শী হবেন যাঁরা তাঁরা কেমন করে শুধু ঐ-ভাষার জোরে তামিল তাঁতি বা ওড়িয়া চাষীর মনের খুব কাছাকাছি এসে পড়বেন তা বোঝা গেল না। তামিল বা ওড়িয়া ভাষার মাধ্যমেই সেটা সম্ভব; কিন্তু তা হলে ইংরেজি শেখাটা অন্তরায় এবং হিন্দি জানাটা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহাস্ত্র বলে প্রতিপন্ন হলো কি? আর তাছাড়া হিন্দি সরকারি ভাষা হলে হিন্দি অঞ্চলের বাইরে হিন্দিতে সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও এক বর্ণশ্রেষ্ঠ বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠি বা 'এলিট্' শ্রেণীতে স্বচ্ছন্দে পরিণত হবেন, কারণ সেখানকার জনসাধারণ তো আর হিন্দি জবানে ফর-ফর করে বাতচিত করতে পারবেন না।

তৃতীয়ত, ইংরেজ আমলে, বিশেষত অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে, ইংরেজি-পড়া দেশি কর্মচারীরাও শ্বেতকায় রাজপুরুষদের ছত্রছায়ায় দাঁড়িয়ে দেশের লোকের কাছে অহেতুক সম্ভ্রম পেতেন, এবং ইংরেজি না-জানা মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করতেন না। এসব গ্লানিকর সত্য কিন্তু আজ ইতিহাস হয়ে গেছে। নিছক ইংরেজি বুলি ঝেড়ে—সে যত বাঁকা উচ্চারণেই হোক্—আজকের দিনে সম্মান দাবি করতে গেলে অপমানিতই হতে হয়। বিদেশি ভাষা-শিক্ষার যেটুকু কদর আছে তা ইংরেজি-জর্মন-রুশ-চীন নির্বিশেষেই আছে। তবে এ-কথা সত্যি যে রাজকার্যের ঊর্ধ্বস্তরে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাই অধিষ্ঠিত হয়ে থাকেন। এবং উচ্চশিক্ষা সারা পৃথিবীতে এক নতুনধরনের শ্রেণীভেদ তথা এক নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে। পূর্বে এই শ্রেণী ধনিক শ্রেণীরই অন্তর্গত ছিল; ইদানীং তাতে সব অর্থনৈতিক শ্রেণীর সমাবেশ দেখা যায়—মধ্যবিত্তদেরই অবশ্য সর্বাধিক। এঁরা অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকের সঙ্গে (কোটিপতি-নিষ্কপর্দক নির্বিশেষে) সহজে মেলামেশা করতে পারেন না, একটু দূরত্ব রক্ষা করে চলেন, নিজেদের অনন্যসাধারণত্বে অভিমানী। সমাজের কাছ থেকে কিছু মানমর্যাদা এঁরা পেয়েও থাকেন, এবং সে-মর্যাদা উচ্চবর্ণের বা উচ্চপদের মর্যাদার মতো একেবারে অপ্রাপ্য বা নিরর্থক নয়।

অন্যান্য শ্রেণীভেদের মতো এ-শ্রেণীভেদও বিদূরিত হওয়া নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। অথচ সমাজের শতকরা একশোজনই যথার্থ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হবেন এ-আশা দুরাশা,

দু-এক শতাব্দীর মধ্যে হতে পারবেন এটা দিবাস্বপ্ন। আমরা বরঞ্চ আশু প্রত্যাশা রাখতে পারি যে বিভেদটা উপরের দিক থেকে ঘুচবে, উচ্চশিক্ষিতেরা তাঁদের শ্রেষ্ঠতাভিমান ত্যাগ করবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রকৃত জ্ঞানী যাঁরা তাঁদের অহংকারবোধ নেই, আকাশ ছুঁয়েও তাঁরা মাটির মানুষ। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য সব ক্ষেত্রে এ-বিশ্বাসের অনুকূল নয়। এ-শ্রেণীভেদের সমস্যা সর্বদেশকালের সমস্যা। এর সমাধান অর্থনৈতিক পরিবর্তনে কিছুদূর, চারিত্রনৈতিক পরিবর্তনে আরো অনেক দূর পর্যন্ত সম্ভব। পূর্ণ নিরাকরণ কিসে হতে পারে, আদৌ হতে পারে কিনা, জানি না। এটুকু জানি যে উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতি-অভিমানী 'এলিট্' সমস্যার কোনো সমাধান হিন্দি বনাম ইংরেজি বিতর্কে খুঁজতে যাওয়া নিতান্ত পণ্ডশ্রম।

সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই। যে-ভাষাগুলি আমাদের দেশের বহুসংখ্যক লোকের মাতৃভাষা (সংবিধানে ল্যাঙ্গুয়েজেস্ অব্ ইণ্ডিয়া শীর্ষে যার তালিকা দেওয়া হয়েছে) তার প্রত্যেকটি ভাষাই আমাদের জাতীয় ভাষা। এদের মধ্যে কোনো-একটিকে 'রাষ্ট্রভাষা' নামে অভিহিত করে সকলের উর্ধ্বে কোনো রাজাসনে বসানো যায় না; এক শ্রেণীর নাগরিককে শুধু বিশেষ এক অঞ্চলে তাঁদের জন্ম বলে অতিরিক্ত কোনো ক্ষমতা বা সুবিধা দেওয়া যায় না। দিলে আমাদের সংবিধানস্বীকৃত অধিকারসাম্য বিধ্বস্ত হবে। সর্বস্তরে শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা হতেই পারে না—শিক্ষার উপরের স্তরে ইংরেজি থেকে মাতৃভাষায় রূপান্তর কিছু সময়সাপেক্ষ হলেও অবধারিত। রাজ্য সরকারের ভাষা সেই রাজ্যের ভাষাই হবে এই স্বাভাবিক নীতিটাও এখন প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নেওয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষার অঙ্গরূপে (মাধ্যমরূপে নয়) ইংরেজির চর্চা সবদিক দিয়ে বাঞ্ছনীয় যখন, তখন সেইসঙ্গে ইংরেজি যদি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-কার্যের ভাষাও থাকে তা হলে সুবিধা অনেক। দুটি বড়ো সুবিধা, তাতে করে সমস্ত নাগরিকের অধিকারসাম্য রক্ষিত হয়, এবং দেশের দুই-তৃতীয়াংশ লোক অতিরিক্ত একটি ভাষাশিক্ষার ক্ষয়কারী পরিশ্রম থেকে বাঁচে। সবচেয়ে বড়ো অসুবিধা এই যে একটি বিদেশি ভাষাকে সরকারি ভাষা করলে আমাদের সদ্যপ্রস্ফুটিত জাতীয়তার তীব্র অভিমান খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়। এই ভাবাবেগের কাছে যদি মাথা নত করতেই হয় তবে হিন্দি এবং ইংরেজি উভয় ভাষাকেই কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা করা যেতে পারে। তাতে এইটুকু রক্ষা যে অহিন্দিভাষীদের কেবল শুনে বা পড়ে বোঝবার মতো হিন্দি শিখলেই চলবে। সরকারি এবং অন্যান্য কাজে কিছু লিখতে বা বলতে হলে তাঁরা ইংরেজি ভাষাই ব্যবহার করতে পারবেন (মাতৃভাষায় যেখানে কাজ

চলে না)। হিন্দিভাষীদের পক্ষে ব্যবস্থা ঠিক উল্টো হবে। এটা সবাই জানেন যে কোনো পরভাষা ঠিকমতো বলতে বা লিখতে হলে যতটা শিখতে হয়, তার সিকি-ভাগের কম শিখলেই সে-ভাষা বোঝা যায়। আমাদের পক্ষে শুধু বোঝবার মতো হিন্দি শেখার একটু সুবিধাও আছে, কারণ হিন্দি ভাষা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতো সংস্কৃতজ বলে তার অনেকগুলি শব্দ অহিন্দিভাষীদের জানা থাকবে। এবং হিন্দিভাষার লিঙ্গপীড়িত ব্যাকরণ, তার সূক্ষ্ম ও বিপুল ইডিয়মের ভাণ্ডার বিবেক-সম্পন্ন বিভাষী বক্তা বা লেখকের সামনে যে-বিভীষিকা রচনা করে, শুধুমাত্র বোদ্ধার কাছে তেমন কিছুই করে না।

হিন্দির দাবি

হিন্দি ভাষা সম্পর্কে নিম্নলিখিত দাবিগুলি শোনা যায়। হিন্দি আমাদের—

১. জাতীয় ভাষা (ন্যাশনাল ল্যাংগুয়েজ)

২. রাষ্ট্রভাষা (স্টেট্ ল্যাংগুয়েজ)

৩. যোগাযোগের ভাষা (লিঙ্ক ল্যাংগুয়েজ)

৪. সরকারি ভাষা (অফিশিয়াল ল্যাংগুয়েজ)

এই দাবিগুলির পেছনে জোর যত আছে যুক্তি আছে কিনা একটু বিচার করে দেখা যাক।

১. জাতীয় ভাষার অর্থ যদি হয় জাতির একাংশের ভাষা, তবে হিন্দি যে আমাদের অন্যতম জাতীয় ভাষা তা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু জাতির অন্যান্য অংশের ভাষা—তামিল, মারাঠি, বাংলা প্রভৃতি—এমন-কী অমার্জনীয় অপরাধ করেছে যে জাতীয় ভাষা বলতে কেবল উত্তর ও মধ্যভারতের ভাষাকেই বুঝব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের সবকটি ভাষার অস্তিত্ব বেমালুম ভুলে যাব, অথবা সেগুলিকে বিজাতীয়, বিগত বা নাবালক ঠাউরে 'জাতীয় ভাষা' রূপে গণ্য হবার তাদের জলজলে দাবিটিকে সরাসরি খারিজ করে দেব? আর যদি জাতীয় ভাষার মানে হয় সমগ্র জাতির ভাষা তবে শতকরা ৩৫ ভাগের মাতৃভাষার পক্ষে এ-হেন মাত্রাজ্ঞানশূন্য দাবি-দাওয়াকে হিন্দি ফ্যানাটিক্‌দের দিবাস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত—যদি-না (কিমাশ্চর্যমতঃপরম্) পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় এই দাবি-সংবলিত এক প্রস্তাব ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৫ সালে বিনা আপত্তিতে গৃহীত হতো। ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা কী তা আইনের প্রশ্ন নয়, বিধানসভায় লোকসভায় ভোটের দ্বারা নির্ধারিত হবার বস্তু নয়, স্লোগানের চিৎকার বা মেশিনগানের ধোঁয়ার ভেতর থেকে আলাদীনের দৈত্যের মতো তা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে না কোনোদিন। ব্যাপারটা নিতান্তই তথ্যগত। তথ্যের অকাট্য সাক্ষ্য মেনে নিয়ে স্বয়ং জওয়াহরলাল নেহরু কয়েক বৎসর পূর্বে গৌহাটির এক মহতী জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন যে ভারত-সংবিধানভুক্ত প্রত্যেকটি ভাষাই আমাদের জাতীয় ভাষা; তারপরে একাধিকবার লোকসভামঞ্চে তাঁরই মুখে এই কথাটির পুনরাবৃত্তি শোনা

গেল। তারপরেও না-জানি কোন ভাবের ঘোরে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত বিধান-কর্তারা সর্ববাদিসম্মতিক্রমে দিল্লীর দরবারে নিবেদন করে বসলেন যে একমাত্র হিন্দিই আমাদের ন্যাশনাল ল্যাংগুয়েজ। হিন্দি সাম্রাজ্য অভিলাষীরা অবশ্য বিশ্বাস করেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক ও অন্যবিধ শক্তিপ্রয়োগে এবং সংখ্যাবলে (যদিও সংখ্যাধিক্য তাঁদের নেই) অদূর ভবিষ্যতে একদিন ঐ মহৎ স্বপ্নকে কঠোর সত্যে পরিণত করবেন তাঁরা। তাঁদের মনের কথা বুঝি কিন্তু তল পাই না আমাদের মাননীয় এম. এল. এ.-দের মনের গভীরতার। তাঁরা কি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদকে স্বাগত জানাতে চান ইংরেজির নাগপাশ থেকে মুক্তিদাতা বিভ্রমে, যেমন কিনা একদিন এই পোড়া দেশেরই গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ইংরেজ লাটবেলাটকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের সংহারকরূপে? নইলে একমাত্র হিন্দিকেই সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা বলার মতো উদ্ভট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি ক্ষীণ কম্পমান হস্তও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় উত্তোলিত হলো না কেন সে-দিন?

২. যে-কারণে হিন্দুধর্ম ভারতবর্ষের রাষ্ট্রধর্ম (state religion) হলো না, ঠিক সেই কারণে হিন্দি ভাষাও আমাদের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না। এই বহুধর্ম-বিশিষ্ট দেশের একটিমাত্র ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা এবং এই বহুভাষাবিশিষ্ট দেশের একটিমাত্র ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে গেলে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ও অন্য ভাষাভাষীদের মনে পরিপূর্ণ দেশাত্মবোধ ও রাষ্ট্রানুগত্য জাগিয়ে তোলা অসম্ভব হয়ে উঠবে। আজকের দিনে রিলিজনের চেয়েও মাতৃভাষা আমাদের মনকে নাড়া দেয়, প্রাণে সাড়া জাগায়। হিন্দুরা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ হয়েও যে-দাবি ত্যাগ করতে পারলেন, হিন্দিভাষীরা শতকরা মাত্র ৩৫ ভাগ হয়েও অনুরূপ দাবির উপর অটল হয়ে বসে আছেন কেন? আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে ভাষার বেলায়ও নিরপেক্ষ থাকতে হবে, পক্ষপাতিত্ব এ-ক্ষেত্রেও কম ফাটল ধরাবে না। তামিলনাদে তারই ভয়াবহ এবং বেদনাদায়ক সূচনা দেখা গেল।

৩. যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ইংরেজির চেয়ে হিন্দির উপযোগিতা অনেক বেশি এমন একটা রব উঠেছে। যোগাযোগ কথাটার অর্থ সবক্ষেত্রে অভিন্ন নয়, নানাস্তরে নানাবিধ যোগাযোগ হয়ে থাকে। সর্বত্র একই ভাষার উপর সে-দায়িত্ব ন্যস্ত করতে গেলে বাস্তবের বিচারে তা ভ্রান্ত এবং আদর্শের নিরিখে ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। আমি তিন প্রকার যোগাযোগের কথা এখানে তুলব—জনগণের মধ্যে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ, এবং উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ।

এক প্রদেশের চাষীর সঙ্গে অন্য প্রদেশের চাষীর যোগাযোগ অত্যন্ত দুর্ঘট ব্যাপার, এবং সুদূর ভবিষ্যতেও যে হাজার-হাজার চাষী সপরিবারে বাংলা থেকে অন্ধ্র, কেরালা থেকে পঞ্জাব মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াবেন এমন সম্ভাবনা যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন এঁদের মধ্যে মেলামেশা কথাবার্তা কোন ভাষার মাধ্যমে সবচেয়ে নির্বিঘ্ন হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার আশু প্রয়োজন দেখি না। শ্রমিক-শ্রেণী অবশ্য অপেক্ষাকৃত জঙ্গম, কোনো একস্থানে ইস্পাত কারখানা, তৈল শোধনাগার, হাইডেলাদি শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠলে নানা প্রদেশের মজুর সেখানে জমায়েত হন। উত্তর, পূর্ব বা পশ্চিম ভারতে তাঁদের মধ্যে বোলচালের ভাষা একপ্রকার বাজারি বা চালু হিন্দুস্থানি আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়; দক্ষিণ ভারতে কী হয় আমি ঠিক জানি না। কিন্তু যাই হোক, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত। শ্রমিক-শ্রেণীর যৌথ জীবনের দৈনন্দিন মেলামেশা কাজকর্মের মৌখিক ভাষা মুখে-মুখেই গড়ে ওঠে; এর জন্য কোনো কমিটি ডেকে রেজলিউশন পাস করে বা আইন প্রণয়ন করে নেতৃবৃন্দের মূল্যবান সময় নষ্ট করবার দরকার নেই।

শিক্ষিত শ্রেণীর সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ অর্থাৎ ম্যাস কনট্যাক্ট কোন ভাষায় সমীচীন তা নিয়েও কি তর্কের অবকাশ আছে? বাংলাদেশের কংগ্রেস, কমিউনিস্ট বা সোস্যালিস্ট নেতারা মেদিনীপুর, বীরভূম, নদীয়ায় গিয়ে ইংরেজি কিংবা হিন্দিতে বক্তৃতা করে নিজেদের হাস্যাস্পদ এবং শ্রোতাদের উত্যক্ত করবেন না আশা করি। যদি অন্য প্রদেশের কোনো নেতা বা কর্মী পশ্চিমবাংলায় আসেন তবে তিনি এখানে দীর্ঘকাল বাস করে রাজনৈতিক বা সমাজোন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কোনো কাজকর্মের পরিকল্পনা নিয়ে এলে তাঁকে কৃপা ও কষ্ট করে বাংলাভাষা শিখে নিতে হবে। আর তিনি যদি মাত্র কয়েকদিন এ-অঞ্চল সফর করে তাঁর বাণী শুনিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে আসেন তবে বাংলা বলতে না-পারলে হিন্দি, মারাঠি, তামিল যে-কোনো ভাষায় তিনি বক্তৃতা করতে পারেন, সঙ্গে-সঙ্গে একজন দোভাষীকে সে-বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ করে যেতে হবে। অন্যসব প্রদেশেরও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। কয়েকজন ভ্রাম্যমাণ বক্তা বা কর্মীর সঙ্গে ক্বচিৎ সংযোগস্থাপনের জন্য দেশের শতকরা ৬৫ জন অহিন্দিভাষী বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে হিন্দি শিখবে—সেইসব লোক যাদের আপন মাতৃভাষায় লিখন-পঠনক্ষম হতে আরো অন্তত তিন-চারটে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকাল লাগবার কথা—এই অত্যাশ্চর্য প্রস্তাবটি কোন প্রতিভাবানদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছে জানলে খুশি হতাম।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে যোগাযোগের প্রশ্নে এবার

আসা যাক। এই যোগাযোগ জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-সাহিত্যের, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দিনে-দিনে আরো ঘনিষ্ঠ ও পরিব্যাপ্ত হোক আমরা সকলেই তা কামনা করি, তার আশু প্রয়োজন অনুভব করি। কোন ভাষার মাধ্যমে তা হবে? এখানে তিনটে কথা মনে রাখা দরকার। বহুকাল পূর্বে মহাকাব্যের যুগ থেকে হর্ষবর্ধনের যুগ পর্যন্ত এবং তার কিছু পরেও সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক সংযোগের মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা। এ-দেশে তুর্কী সাম্রাজ্য বিস্তারের পর সে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়. তুর্কী কিংবা ফার্শি ভাষা সংস্কৃতের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে পারেনি। অনেক পরে ১৯ শতকের মধ্যভাগ থেকে সে-স্থানে দেখা গেল ইংরেজি ভাষা। বস্তুতপক্ষে ইংরেজির যুগে আমাদের বৃহত্তর জাতীয় চেতনা যতখানি উদ্বুদ্ধ হয়েছে, রাজ-নৈতিক. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ যতখানি ঘনিষ্ঠ ও প্রশস্ত হয়েছে, ভারতের পূর্ব-ইতিহাসে কখনো এতখানি হয়ে উঠতে পারেনি। কোন অপরাধে আজ সেই ইংরেজি ভাষাকে দণ্ডিত করে, যে অত্যাবশ্যক, অত্যন্ত বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র সে নিজগুণে দখল করে নিয়েছে, সেখান থেকে তাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে আমরা উদ্যত হয়েছি? ইংরেজি বিদেশাগত শুধু এই কারণে যদি চিরকাল তার প্রতি বৈরীভাব পোষণ করি তবে যেন ভুলে না-যাই যে বৈদিকও একদিন বিদেশ থেকেই ভারতে এসেছিল। তামিলভাষীদের সংস্কৃত-বিদ্বেষ ও হিন্দিভাষীদের ইংরেজি-বিদ্বেষ একই প্রকার অযৌক্তিক। রামমনোহর লোহিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে হাস্যরস সৃষ্টি করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং সে-দায়িত্ব অপূর্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে চলেছেন। তাঁর বিদূষকী প্রতিভাসম্ভূত 'আংরেজি হটাও' আন্দোলনকে নমস্কার জানিয়ে আমি শুধু একটি প্রশ্ন করব—শিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রের পক্ষে ইংরেজি আজ প্রায় মাতৃভাষার তুল্য এবং অন্য যে-কোনো ভারতীয় ভাষার চেয়ে আপন নয় কি, আমাদের দেড়শত বৎসরের সমগ্র সাংস্কৃতিক উদ্দীপনার মধ্যে কি এই ভাষা ওতঃপ্রোতভাবে মিশে যায়নি?

দ্বিতীয় কথা এই যে সাংস্কৃতিক সংযোগ আমাদের রক্ষা করতে হবে শুধু ভারতের অভ্যন্তরে নয়, সমস্ত পৃথিবীর, বিশেষত যাবতীয় প্রাগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে। এই সংযোগের মাধ্যম, আমাদের পক্ষে ইংরেজি ভাষা ছাড়া আর কী হতে পারে? ইংরেজিকে আমাদের কুনো কল্পনা ও অবরুদ্ধ চিন্তার গবাক্ষ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কাব্যকথা বলে উড়িয়ে দেবার মতো নয় এ-কথা।

তৃতীয়ত, আজ এটা সর্বসম্মত সত্য যে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক থেকে পোস্ট-গ্রাজুয়েট পর্যন্ত সমস্ত স্তরের বাহন মাতৃভাষা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। সঙ্গে-

সঙ্গে এ-ও কিন্তু অবিসংবাদিত যে, স্কুলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে হিন্দি যদি-বা অল্প-স্বল্প শেখানো চলে, উচ্চতর স্তরে বিশেষত অনার্স ও এম-এ পড়ার জন্য ইংরেজি সহযোগী ভাষা হিসাবে শিখতেই হবে এবং বেশ ভালোভাবেই শিখতে হবে, নইলে অতিদ্রুত চলমান বিজ্ঞানে ও হিউম্যানিটিজে উচ্চতম শিক্ষাদান যে-কোনো ভারতীয় ভাষার অপুষ্ট ধনভাণ্ডারে বহুকাল কুলিয়ে উঠবে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের এ-হেন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা যখন সভাসমিতি সেমিনার আদিতে মিলিত হবেন, তখন কি তাঁরা হিন্দিতে বক্তৃতা করতে, প্রবন্ধ পড়তে, আলোচনা ও বিতর্ক চালাতে স্থবিধা বোধ করবেন, নাকি ইংরেজিতে? হিন্দিকে এই স্তরের লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ করতে হলে শিক্ষাব্যবস্থা পাল্টাতে হয়, হিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে ইংরেজিকে ক্লাস ফাইভ-সিক্সে সীমাবদ্ধ রেখে হিন্দিই আবশ্যিকরূপে শেখাতে হবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্তরে সহকারি ভাষা হিসাবে। এর অবধারিত ফল সমস্ত অহিন্দিভাষী রাজ্যের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থাকে বানচাল করে দেওয়া, কারণ, শিক্ষার সর্বোচ্চ শিখরে বাংলার দৈন্য হিন্দির দানে ঘুচবার কথা নয়; ইংরেজির বিপুল ঐশ্বর্যের সঙ্গে তুলনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, বাংলা অপেক্ষাও হিন্দি ভাষার জ্ঞান ও সাহিত্য-ভাণ্ডার অপূর্ণ। অবশ্য প্রস্তাব করা যেতে পারে যে, সমগ্র দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে ইংরেজির সঙ্গে হিন্দিও শেখাতে হবে অবশ্যপাঠ্য ও উত্তমরূপে। কিন্তু কেন, কেন আমাদের ছাত্রদের কাঁধের উপর এ অনর্থক বোঝা চাপাতেই হবে? ইংরেজির দ্বারা যে-কাজ অতি স্থষ্ঠুভাবে চলছে সেই কাজকে খানিকটা অস্থষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য হিন্দির মতো অত্যন্ত দুরূহ ভাষা (ঐ-ভাষাতে লিঙ্গের খামখেয়ালী নীতি ও যত্রতত্র আধিপত্য এবং ইডিয়মের প্রাচুর্য বিষয়ে যাঁরা অবগত আছেন, তাঁরাই জানেন, বিভাষীর পক্ষে ঐ-ভাষাতে কথা বলা বা লেখা কতখানি দুরূহ) শিখতে কোনো স্বস্থবুদ্ধিসম্পন্ন লোক খামখা রাজি হবে কেন? বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীর মধ্যে যোগাযোগের প্রয়োজন মেটাতে যে লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ দেড়শো বছরের ফলবান প্রচেষ্টা ও সাধনায় আমরা লাভ করেছি, তাকে হটিয়ে দেবার অধিকার কোনো অদূরদর্শী বিদ্বেষচালিত রাজনৈতিক নেতা বা দলের নেই। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দির অবদান একান্তই আঞ্চলিক, সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক অভ্যুদয়ে ও ঐক্যবন্ধনে তার ভূমিকা শূন্য। ৩৫ পারসেণ্ট সংখ্যার জোরে কিংবা রাজদণ্ড প্রতাপে, না-কে হ্যাঁ করা যায় না, তবে যা গড়ে উঠেছে তাকে ভেঙে চুরমার করা যাবে বৈকি। তাই কি চান আমাদের নেতৃবৃন্দ ও কর্তৃপক্ষ?

৪. সরকারি ভাষা যখন প্রত্যেকটি রাজ্যে সেই রাজ্যের ভাষা হবে, এ-কথা

অবধারিত, তখন হিন্দিকে নির্বিশেষণে (unqualifiedভাবে) আমাদের সরকারি ভাষা (অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ) বলা শব্দের অমার্জনীয় অপপ্রয়োগ। প্রশ্নটা কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানীস্থ এবং অন্যসব ছোটো-বড়ো শহরে বিক্ষিপ্ত দপ্তর-সমূহের যাবতীয় কাজকর্মের ভাষার। এ-প্রশ্ন জটিল বটে কিন্তু যতখানি বিরাট ও নিরাকরণীয় করে তোলা হয়েছে ততখানি নয়। জাতীয় ভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং যোগাযোগের ভাষার প্রশ্ন থেকে (ঐসব ক্ষেত্রে এ-প্রশ্নের উত্তর হিন্দি হতে পারে না, তা আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি) আলাদা করে দেখলে এবং আমাদের প্রাক্-স্বাধীনতা ইংরেজ-বিদ্বেষ ও পরিস্ফীত স্বাজাত্যাভিমান-প্রসূত কতগুলি বিভ্রান্ত ধারণা থেকে চিত্তকে মুক্ত করে বিচার করলে এ-সমস্যার সমাধান দেশের সুধী-জনের সম্মিলিত চেষ্টার অতীত নয়। সমস্যাটা যখন কাজকর্মের, তখন যে-ভিত্তি-ভূমিতে সমাধানের খসড়া তৈরি হবে, সেটা এই সহজ জিজ্ঞাসা যে, কোন ভাষাকে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা করলে সকলের কাজকর্মের সর্বাধিক সুবিধা হয়? ধরে নেওয়া যেতে পারে যে উর্ধ্বতম থেকে নিম্নতম কর্মচারীরা তাঁদের মাতৃভাষাই সব-চেয়ে ভালো জানেন (মুষ্টিমেয় যে-কয়জন জানেন না তাঁদের লজ্জায় অধোবদন হওয়া উচিত), ইংরেজি তার চেয়ে কম জানেন, তবু একটু ভুলচুক সত্ত্বেও ইংরেজি বুঝতে ও লিখতে এবং তাতে একরকম কাজ চালিয়ে নিতে পারেন। শতকরা ৬৫ জনের হিন্দি জ্ঞান আপাতত শূন্য ('হাম তোমারা মাথা ফাটায়ে দেগা'—গোছের ভাষাকে হিন্দি বলে চালাবার চেষ্টা হাস্যকর); অদূর ভবিষ্যতে অত্যল্প হবে বলে আশা করা যায়, এবং সুদূর ভবিষ্যতেও অত্যল্পই থাকবে—কোনো সুস্থ সুপরিকল্পিত সর্বভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় এর অন্যথা হতে পারে না—হওয়া বিধেয় নয়। এ-ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা করলে সকল কর্মচারীই সবচেয়ে সুবিধা বোধ করবেন। উঠে-পড়ে লাগলে দু-চার বছরেই প্রয়োজনমতো পরিভাষা তৈরি করা যায়, সে-দিক থেকে অসুবিধা যৎসামান্য। কিন্তু ১৪টি ভাষার একত্র প্রয়োগে কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলিকে টাওয়ার অব বেবেল করে তোলা সুবুদ্ধির কাজ নয়।

তার পরেই সুবিধা ইংরেজির। ইংরেজি বিদেশি ভাষা বলে একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, যদিও বি-এ, এম্-এ পাস করবার পরও আমাদের ইংরেজি বিদ্যা কাঁচাই থেকে যায়, তবু দেশশুদ্ধ সকলের সেদিক দিয়ে একই অবস্থা, কোনো অঞ্চল কারো উপর টেক্কা দিতে পারে না। এ-দেশে যাঁদের মাতৃভাষা ইংরেজি, তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য, তাঁদের অস্তিত্ব কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না। পক্ষান্তরে যাঁদের মাতৃভাষা হিন্দি তাঁরা সংখ্যায় বিরাট, সমগ্র লোকবলের ৩৫ ভাগ; তদুপরি তাঁদের

মাতৃভাষাই যদি রাষ্ট্রের একমাত্র সরকারি ভাষা হয়ে ওঠে (মনে রাখতে হবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও পরিধি দ্রুতগতি বেড়ে চলেছে) তবে তাঁরা যে দুর্ধর্ষ ক্ষমতার অধিকারী হবেন এবং দেশে যে নিদারুণ অসমতার সৃষ্টি হবে, তার কোনো ব্যবহারিক সন্তোষজনক প্রতিবিধান দেখা যাচ্ছে না। অহিন্দিভাষীরা বছরের পর বছর খেটে যতই-না-কেন হিন্দি শিখুন, হিন্দিভাষীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবেন কেন ? এবং সেই প্রতিযোগিতার তাগিদে ইস্কুলে-কলেজে একটি অতিরিক্ত ভাষার বোঝা বহন করার দরুন তাঁদের সমস্ত শিক্ষাই হিন্দিভাষীদের চেয়ে পেছিয়ে থাকবে।

ইংরেজির একটি অসুবিধা অবশ্য এই যে, ঐ-ভাষায় রাজপুরুষগণ জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন না। হিন্দির মাধ্যমে কি তা পারবেন ? আগেই বলেছি যে, মাস কনটাক্ট করতে ভদ্রমহোদয়গণকে অনুগ্রহপূর্বক একটু কষ্ট স্বীকার করে জনগণের মাতৃভাষা শিখতে হবে অথবা তাঁদের কথন-লিখন দোভাষীর দ্বারা অনুবাদ করিয়ে নিতে হবে। পর্বত মুহম্মদের কাছে আসে না, মুহম্মদকেই শেষ অবধি পর্বতের কাছে যেতে হয়। যাঁরা বলেন যে, বর্তমান ব্যবস্থায় ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা অযথা সুবিধা ভোগ করেন, তাঁদের বোঝা উচিত যে, ইংরেজির স্থলে হিন্দিকে বসালে অহিন্দিভাষী অঞ্চলে তার কোনো প্রতিকার হয় না, হিন্দি ভাষায় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা সেই একই প্রকার এলিট্ সম্প্রদায় তৈরি করবেন।

হিন্দিই কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভাষা হবে—সুখের বিষয় এই অন্যায় ও সাংঘাতিক প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এখন যে-প্রস্তাবটি বিবেচনাধীন তা এই যে, ইংরেজি ও হিন্দি যুগ্মভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা থাকবে। শুধু ইংরেজিই কেন্দ্রীয় শাসনকার্যের ভাষা হলে সব দিক দিয়ে সমীচীন ও সুবিধাজনক হতো, কিন্তু যে-ইংরেজিবিদ্বেষ থেকে ১৭ বছর আগেই আমাদের মুক্ত হওয়া উচিত ছিল, তা আমরা আজও পুষে রেখেছি এবং তারই পটভূমিকায় হিন্দির দাবি এতদিন ধরে অযথা পরিস্ফীত হয়ে উঠেছে। ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু কালের গতি অপরিবর্তনীয়। আজকের পরিস্থিতিতে সবচেয়ে কম বিপদসংকুল এবং একমাত্র শান্তিময় সমাধান যা দেখা যাচ্ছে তা কেন্দ্রীয় শাসনকার্যে ইংরেজি ও হিন্দি ভাষাদ্বয়ের সহ-অবস্থান নীতি অনির্দিষ্টকালের জন্য মেনে নেওয়া। এটা অহিন্দিভাষী মেজরিটির পক্ষে খানিকটা ক্ষতি ও নতিস্বীকার তাতে সন্দেহ নেই। ক্ষতির পরিমাণ সহনীয় করবার জন্য যে ন্যূনতম রক্ষাকবচ একান্ত আবশ্যক, তা নিম্নপ্রকার হতে পারে।

ক. শিক্ষার মাধ্যম ইস্কুলে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা হবে, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও যতশীঘ্র সম্ভব মাতৃভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে। কিন্তু ইস্কুলের মাধ্যমিক স্তর থেকে কলেজের উচ্চতম স্তর পর্যন্ত ইংরেজি সহকারি ভাষারূপে অবশ্যপাঠ্য থাকবে। ইস্কুলের মাধ্যমিক স্তরে অহিন্দিভাষী অঞ্চলে হিন্দি এবং হিন্দিভাষী অঞ্চলে অন্য কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষা বছর-দুইয়ের জন্য আবশ্যিক হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তার বেশি কালের জন্য নয়। অবশ্য যাঁরা ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে কৌতূহলী, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অত্যল্পই হবে।

খ. কেন্দ্রীয় দপ্তরগুলিতে কোনো অহিন্দিভাষীকে হিন্দিভাষা প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হবে না, এবং সে-ভাষা ব্যবহার করতে না-পারলে কোনোরূপ অসুবিধায় ফেলা হবে না। অর্থাৎ কর্মসূত্রে তাঁকে যা-কিছু বলতে বা লিখতে হবে, তা ইংরেজিতে বলবার বা লিখবার অধিকার তাঁর অক্ষুণ্ণ থাকবে। এবং যে-কোনো সরকারি কাগজপত্র বা মৌখিক আদেশ-নির্দেশ ও পরামর্শ তাঁকে দেওয়া হবে. সঙ্গে-সঙ্গে তার ইংরেজি তর্জমাও তলব করবার অধিকার তাঁর থাকবে। কালের কোনো সীমা নির্দেশ না-করে এই সমস্ত অধিকার সুস্পষ্ট ভাষায়, সংবিধানমতো অন্তত আইনত সংরক্ষিত হওয়া আবশ্যক।

শক্তিশালী মাইনরিটি গোষ্ঠীর কাছে আপাতত ছত্রভঙ্গ মেজরিটির এইটুকু দাবি কি খুব অন্যায়? যদি অন্যায় বলে বিবেচিত হয়, তবে মেজরিটিও ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য হবে। সেদিন কি আবার এক নতুন দ্বিজাতিতত্ত্বের ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের সম্মুখীন হব আমরা? স্থির শান্তচিত্তে পরিচ্ছন্ন যুক্তিপ্রয়োগে এই গুরুতর সমস্যার আশু সমাধানে মনোনিবেশ করতে সকলকে আহ্বান করি।

সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে, নিম্নলিখিত মৌলিক নীতিগুলি না-মেনে নিলে সমাধানের পথ দেখা যায় না:

(১) সংবিধানভুক্ত ১৪টি ভাষাই আমাদের জাতীয় ভাষা।

(২) এ-দেশে কোনো ধর্ম রাষ্ট্রধর্ম নয়, কোনো ভাষা রাষ্ট্রভাষা নয়। উভয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ হতে হবে।

(৩) একটি ভাষার দ্বারা সর্ববিধ যোগাযোগ এ-দেশে সম্ভব নয়।

(৪) সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা কী হবে সে-বিষয়ে মনুস্থির করবার আগে আমাদের মনস্থির করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে ইংরেজি বাদ দিয়ে বা ইংরেজির সঙ্গে হিন্দিকে অবশ্যপাঠ্য করা সংগত

কিনা। উভয় বিকল্প ব্যবস্থাই অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

(৫) আমাদের ভাষাসমস্যার সমাধান সময়সাপেক্ষ নয়। যে-সমাধান সবচেয়ে নৈতিক ও ব্যবহারিক তাই স্থায়ীভাবে গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় দপ্তরে যুগ্ম সরকারি ভাষার নীতি স্থায়ী হলেও UPSC পরীক্ষার মাধ্যম ইংরেজিই রাখতে হবে। অন্য কোনো উপায়ে সমতারক্ষা ও যোগ্যতমের নির্বাচন সম্ভবপর নয়।

পুনঃ। 'ভাষা-ভাষা করে এই যে গভীর হৃদয়াবেগ—একে কিছু কমানো না-গেলে' কোনো সমস্যারই সমাধান হবে না, এ-বিষয়ে আমি মানসী দাশগুপ্তের সঙ্গে একমত। হিন্দির স্বপক্ষে যত কথা বলা হয় তার বারো-আনাই আবেগজনিত, কতটুকুই-বা যুক্তি থাকে তার পেছনে। আর ইংরেজির বিরুদ্ধে যা প্রকাশ পায় তা শুধু আবেগ নয়, উষ্মা এমন-কি কুসংস্কার। ইংরেজি যবন, ইংরেজি ম্লেচ্ছ, অতএব তার স্পর্শে আমাদের শুচিতা, আমাদের বিশুদ্ধ ভারতীয়তা নষ্ট হবে—এটাই হল প্রথম যুক্তি বা যুক্তিহীনতা। এই কুসংস্কার থেকে দৃষ্টিকে মুক্ত করলে দেখতে ভুল হবার কথা নয় যে যেসব কাজ এতকাল, এবং স্বাধীনতালাভের পরও ১৭ বছর, ইংরেজির দ্বারা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে আসছিল, এক শিক্ষার মাধ্যম হওয়া ছাড়া বাকি সমস্তটাই ভবিষ্যতেও নির্ঝঞ্ঝাটে সম্পন্ন হতে পারতো; 'আংরেজী হটাও' আর 'হিন্দি চলাও'—হাঁক-ডাক জোর-জবরদস্তি করে চারিদিকে অশান্তি ছড়াবার কোনো দরকার ছিল না।

দ্বিতীয় যুক্তি, হিন্দিকে সরকারি ভাষা করলে তা আমাদের রাজপুরুষগণকে এবং আমাদের যাবতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে জনগণের একেবারে বুকের কাছে নিয়ে যাবে, এই সাগরপারের ইংরেজি ভাষাটাই মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে। আমি আলোচিত প্রবন্ধে দেখিয়েছিলাম যে এমনতরো সংযোগ কেবল হিন্দি-ভাষী অঞ্চলেই ঘটতে পারে, বিস্তীর্ণ অহিন্দিভাষী অঞ্চলে ব্যবধান যেমন ছিল তেমনি থাকবে; সেখানকার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে হলে তাদের ভাষাই শিখতে হবে ওপরওয়ালাদের, যারা নিজেদের মাতৃভাষাতেই এখনো নিরক্ষর তারা অদূর ভবিষ্যতে হিন্দি ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করবে—আমাদের রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনা এমন কাণ্ডজ্ঞান-বর্জিত হলে চলবে কেন? আর দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গেই যদি সরকারের আত্মীয়তা ঘটে, অথচ অবশিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে দূরত্ব

পূর্ববৎ থেকে যায় তবে তার ফল কীরকম সাংঘাতিক হবে তা সহজেই অনুমেয়। রাজাজী যথার্থই বলেছেন, The Government of India must be evenly related to the whole of India। একে 'সকলে মিলে ডুবে যাবার সুবিধা' বলে মানসী রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত হতে না-পারায় আমি দুঃখিত। প্রকৃতপক্ষে এ হলো সকলে মিলে ডেক-যাত্রী হওয়ার সুবিধা বা অসুবিধা ভোগ করা। রাষ্ট্রের জাহাজে একদল লোক কেবিনে বসে আয়েস করবে আর অধিকাংশ যাত্রী খোলা ডেকে ঝড়ঝাপটা মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকবে—একে আর যাই বলা হোক সুযাত্রা বলা যায় না, এবং এ নিয়ে রসিকতা করাটা একটু নিষ্ঠুর।

একটা কথা উঠেছে যে হিন্দি সরকারি ভাষা হলে হিন্দিভাষীরা অনেকখানি সুযোগ-সুবিধা পেয়ে যাবেন এতে আমাদের আপত্তি সরব, কিন্তু ইংরাজি সরকারি ভাষা থাকলে ইংরাজি-শিক্ষিতেরা একই প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন, তার বেলা আমরা নীরব কেন? দুটো পরিস্থিতির মধ্যে কিন্তু অনেক তফাৎ আছে। ভারতবর্ষের যে-কোনো লোক ইংরেজি শিখতে পারে? গরীব ছাত্রের পক্ষে কিছু বাধা আছে, কিন্তু সে-বাধা কেবল ইংরেজির পথে নয়, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত বিজ্ঞান প্রভৃতি যে-কোনো উন্নত শিক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ এবং গরীবের পক্ষে সহজলভ্য নয়। এটি এক ব্যাপক সমস্যার অন্তর্গত—আমাদের দারিদ্র্য সমস্যা। তার সমাধান ধনবণ্টনে অসাম্য লাঘব, উৎপাদনে অগ্রগতি ইত্যাদি দূরপাল্লার সামাজিক উন্নয়ন। ইতিমধ্যে স্কলারশিপ, অবৈতনিক শিক্ষাদির দ্বারা কিঞ্চিৎ উপশম হতে পারে। কিন্তু যার মাতৃভাষা হিন্দি নয়, সে কোনো গুণ বা চেষ্টার ফলে হিন্দিকে মাতৃভাষারূপে লাভ করতে পারবে না। দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় যদি এ-হেন চিরস্থায়ী জন্মগত বৈষম্যকে গুরুতর আকার ধারণ করতে দেওয়া হয় তবে তা আমাদের গণতন্ত্রকেই বিপন্ন করবে।

'ইংরেজি ভাষা কখনো এ-দেশে শিকড় গাড়েনি' যদি সত্য হয় তবে হিন্দিভাষী অঞ্চলের বাইরে হিন্দিও কোনোদিন শিকড় গাড়বে না, তার সিকিভাগও না। শিকড়ের পরিমাপ পরিসংখ্যান দ্বারা হয় না, নাড়ীর মধ্যে তা অনুভব করা যায়। সমগ্র দেশের চিন্তা ও উদ্যমকে, প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যের সাহিত্যসৃষ্টি, রসবোধ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, কল্পনা ও ভাবনাকে ইংরেজি যেভাবে একশো বছর ধরে চেতিয়ে তুলেছে, এগিয়ে নিয়ে গেছে, হিন্দি কি তার সিকির সিকিভাগও পারবে কোনোদিন?

মানসী লিখছেন, '…"দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের সবক'টি ভাষার অস্তিত্ব

বেমালুম ভুলে যাব" এমন কথা তুলে শুধু-শুধু নিজেদের ভাষাভিমান নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠার কোনো কারণ ঘটেনি। অকারণে দিবাদুঃস্বপ্নে অস্থির হয়ে ওঠা কি আইয়ুবের মতন সুধীজনকে সাজে?' আমার ঈষৎ দীর্ঘ বাক্যের ওপর কাঁচি চালিয়ে তিনি বিতর্কে বেশ সুবিধা করে নিয়েছেন। এই সুবিধের লোভটুকু ত্যাগ করতে পারলে তাঁর বুঝতে বিলম্ব হতো না যে আমার ক্ষোভের কারণ অত্যন্তই বাস্তব। পুনরুক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক আরো-একটু বিশদ করে আবার জানাই সে-কারণ। 'জাতীয় ভাষা' পদটি প্রয়োগ করার সময়ে কেউ-বা হিন্দি ছাড়া অন্যসব ভারতীয় ভাষার অস্তিত্ব বেমালুম ভুলে যান (মনে করিয়ে দিলে বলেন—ও, হ্যাঁ, সেগুলিও এক অর্থে আমাদের জাতীয় ভাষা বটে, তবে আমরা তো এক জাতি, কাজেই আমাদের জাতীয় ভাষা একটাই হবে, এবং তা হিন্দি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না) কেউ-বা ওগুলির কথা মনে রেখেই বলেন, হিন্দিই ভারতবর্ষের একমাত্র জাতীয় ভাষা, আর-সব হলো গিয়ে আঞ্চলিক ভাষা। এই দুইপ্রকার হিন্দি-পক্ষপাতীদের অস্তিত্ব কি মানসী অস্বীকার করছেন? যদি অস্বীকার না-করেন, তবে তিনি আমাকে কোন অভয়বাণী শোনাতে চেয়েছিলেন? তা কি এই যে কট্টর হিন্দিভাষীরা হিন্দিকে আমাদের ন্যাশনাল আর স্টেট্ ল্যাংগুয়েজ বলেন কেবল 'ইংরেজি ভাষা-জ্ঞান দুর্বল থাকার জন্য?' কিন্তু দিব্যি বাংলা ভাষাতেই পশ্চিম বাংলার বিধানকর্তারা সর্ববাদিসম্মতিক্রমে গত ১৬ ফেব্রুয়ারিতে একমাত্র হিন্দিকেই 'জাতীয় ভাষা' আখ্যা দিলেন। আর নেহরু ২৪ এপ্রিল ১৯৭৩ তারিখে লোকসভায় যে-বক্তৃতা করেছিলেন ('...There is no question of any one language being more a national language than the other ; Bengali or Tamil or any other regional language is as much the Indian national language as Hindi.'), তা ভুল ইংরেজি শোধরাবার জন্য নয়, ভুল ধারণা সংশোধন করবার জন্য। হিন্দি আমাদের 'জাতীয় ভাষা' (অর্থাৎ একমাত্র জাতীয় ভাষা)—বহু উচ্চকণ্ঠে বিঘোষিত এই দাবিটি ভুল এবং ভিত্তিহীন, এ-কথা মেনে নিলে একমাত্র হিন্দিকেই কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা করার যুক্তিটা তেমন জোর পায় না, এবং সারা ভারতের আপামর সাধারণের পক্ষে ঐ দুরূহ অথচ যাবতীয় সাহিত্য-কর্মে অপরিণত ভাষাকে অবশ্যপাঠ্য করার হুকুমনামাটা একটু তুঘলকশাহি ঠেকে। 'জাতীয় ভাষা' জাতির প্রত্যেকেই জানবে এটাই স্বাভাবিক, যে-হতভাগারা জানে না তাদের অবশ্যই জেনে নিতে হবে এটা খুবই সংগত। এই কথাটাকেই উল্টো করে শেঠ গোবিন্দদাস বলেছেন—আজ যারা হিন্দি জানে না, তারা পেট্রিয়ট নয় (অর্থাৎ

সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ থেকে আরম্ভ করে মানসী দাশগুপ্ত পর্যন্ত কেউই পেট্রিয়ট নন) দুদিন পরে হিন্দির ধ্বজাধারীরা বলবেন, যারা হিন্দি জানে'না তারা এ-দেশে নাগরিকই নয়। কিন্তু জাতীয় ভাষা যদি ১৪টি হয় তবে তার একটিকে রাজপ অধিষ্ঠিত করে প্রত্যেক ভারতবাসীর ওপর তার আনুগত্য চাপিয়ে দেওয়াটা নির্বিবাদে মেনে নেবার কোনো কারণ আমি দেখি না। মনে রাখতে হবে অত্যন্ত সীমিত ফ্র্যানচাইজে নির্বাচিত সংবিধানসভারও অর্ধেক সদস্য এই প্রস্তাবে বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অমত জানিয়েছিলেন। ভাষাবদলের মতো এত বড়ো মৌলি সমস্যার সমাধান সভাপতির কাস্টিং ভোটের দ্বারা করা কি গণতান্ত্রিক?

মানসী দাশগুপ্ত শিক্ষাবিদ এবং একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। সুতর আমি ভাষাশিক্ষা সম্পর্কে যে-মতটা অভিব্যক্ত করেছিলাম তারই খণ্ডন বা বিশ্লে তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এ-ব্যাপারটা তি অত্যন্ত ভাসা-ভাসা রেখে দিয়েছেন। হিন্দিকে সর্বজাতীয় স্তরে উন্নীত করতে হ অহিন্দিভাষী সকল ছাত্রকে হিন্দি শিখতে বাধ্য করা হবে বোঝা গেল, কিন্তু ব বছরের জন্য? আপাতত পশ্চিমবাংলায় স্কুলের মাধ্যমিক স্তরে যে চতুর্বার্ষিক ব্যব আছে তা কি কম, না বেশি, না যথোপযুক্ত? এই ব্যবস্থায় যারা শিক্ষা পে বেরিয়েছে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখেছি এক-আধজন সম্মানিত ব্যতিক্র ছাড়া তাদের হিন্দি বিদ্যে শুধু কাঁচা নয়, একেবারে খেলো। তাদের শিক্ষিকাদে কাছ থেকেও এই বিরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থন পেয়েছি। হিন্দি ভাষায় যদি অফি আদালত করতে হয়, শিক্ষিত হিন্দিভাষীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়, সর্বভারতী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সেমিনারে প্রবন্ধাদি পাঠ ও আলোচনা করতে হয় তবে শু উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে নয়, কলেজের স্তরেও হিন্দিভাষা ও সাহিত্যশিক্ষা চালি যেতে হবে—যেমন আজকের দিনে ইংরেজি চলছে।

আমাদের সাধারণ ছাত্ররা অতিকষ্টে যতটুকু ইংরেজি শেখে তাতে কোনোরক কাজ চলে। এর ওপর হিন্দির বোঝা চাপাতে গেলে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে নামমাত্র যেটুকু শিক্ষা তারা পাচ্ছে তাও যাবে ভেস্তে। কেন্দ্রীয় সরকার এব ঊর্ধ্বতন নেতৃবর্গ তিনভাষার নীতিকে সবচেয়ে মৌলিক বলে ঘোষণা করেছেন, এ ওপরই সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হবে এই সংকল্প প্রকাশ করেছেন। অথচ এ চেয়ে অচল এবং অনিষ্টকর নীতি আর-কিছু হতে পারে না। অনিষ্টকর বলছি তিনটি বিকল্প পরিণামের কথা চিন্তা করে—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা হ কেবল ভাষার পরে ভাষা শিখেই তাদের শিক্ষা সমাপ্ত করবে, আর-কিছু শি

উঠবার সময় পাবে না ; অথবা, হিন্দির ওপর চাপ দিলে (হিন্দি সরকারি ভাষা হলে সে-চাপ পড়বেই) ইংরেজি কিংবা মাতৃভাষা কিংবা দুটোকেই ইচ্ছাপূর্বক অত্যন্ত অবহেলা করবে।

মানসী দেখছি এ-কথা মেনে নিয়েছেন প্রকারান্তরে। বলছেন 'ইংরেজি স্কুল' থাকবে শুধু 'যে-সব ছাত্র বাইরে যেতে চায়, যাদের বিদেশে রাষ্ট্রিক কাজে আমরা পাঠাতে চাই' তাদের জন্য, বাকি সবাই নিজেদের মাতৃভাষার সঙ্গে কেবল হিন্দিই শিখবে। এ-ব্যবস্থা সম্ভবপর, কিন্তু আমার মতে এটা প্রগতি নয় পশ্চাদ্‌গতি।

ভাষা শিখবার উন্নততর, আধুনিকতর পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে বৈকি। কিন্তু সে-পদ্ধতিতে আমরা ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে এবং কলেজে ইংরেজিই শিখতে চাই, হিন্দি নয়। ইংরেজি ভাষায় চিন্তাপ্রধান ও সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের সম্পদ অপরিমেয়, অন্যান্য প্রাগ্রসর ইওরোপীয় ভাষা থেকে যা আমরা আহরণ করতে চাই তা মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধানেই ইংরেজির মারফৎ পেতে পারি, ঐ-ভাষা আজ সমস্ত পৃথিবীর সাংস্কৃতিক রাজনীতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের ভাষা। এসব সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে দিয়ে আমরা হিন্দি শিখব কিসের প্রত্যাশায় ? বাংলা, তামিল বা মারাঠি ভাষায় আমাদের যে উন্নততর জ্ঞানের, সূক্ষ্মতর সাহিত্যের পিপাসা, বৃহত্তর মানবিকতাবোধ (রবীন্দ্রনাথ যার নাম দিয়েছেন বিশ্বমানবিকতার বোধ) মেটে না, তা কি হিন্দি ভাষা মেটাতে পারবে ? সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্যবন্ধনে ইংরেজির ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং হিন্দির অবদান যে শূন্য, সে-কথা পূর্ব প্রবন্ধে লিখেছিলাম। তবু মানসী বলছেন, হিন্দি আমাদের বাঙালি নয়, মারাঠি নয়, ভারতীয় করে তুলবে। কিন্তু এই ভারতীয়তা তো একটি বিমূর্ত সত্তা নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে তার মানে হচ্ছে ভারতীয় মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ। এই যোগাযোগ হিন্দির দ্বারা কতটুকু হতে পারে আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলাম। তার প্রত্যালোচনার ধার দিয়েও যাননি মানসী। গেলে বোঝা যেত হিন্দি কোন মন্ত্রবলে আমাদের ভারতীয় অর্থাৎ ভারতীয়তর (এখন কি আমরা অভারতীয়, নাকি ভারতীয়বোধ-বর্জিত ?) করে তুলবে।

চল্লিশ কোটি মানুষকে জোর করে হিন্দি শেখাবার যে-সংকল্পটি মানসী মনের মধ্যে লালন করছেন সেটি হচ্ছে ভারতকে দুই জাতিতে দ্বিখণ্ডিত করবার অব্যর্থ পরিকল্পনা—এক, যাদের মাতৃভাষা ও শিক্ষার বাহন হিন্দি, তারাই হবে সেরা জাতি, 'আহলে জবান' ; দুই, যারা 'কষ্ট করে চেষ্টা করে' আমাদের নতুন রাজভাষা শিখবে তবু বাক্‌রীতিতে, ব্যাকরণে, উচ্চারণে অনিবার্যত ভুল করবে আর তার জন্য

ঐ প্রথম শ্রেণীর নাগরিকদের কাছে অবজ্ঞা বা কৃপাপাত্র হয়ে থাকবে। বেশি-দিনের কথা নয় যখন ইংরেজ রাজপুরুষদের কাছে তৎকালীন রাজভাষা ভুল বলা বা লেখার জন্য আমরা লাঞ্ছিত হতাম। সেই রাজপুরুষরা আজ বিদায় হয়েছেন, কিন্তু উদীয়মান হিন্দিভাষী রাজপুরুষদের সামনে কি আবার আমরা তেমনি সভয়ে গিয়ে দাঁড়াব আমাদের বাঁকাচোরা হিন্দি নিয়ে? সমস্যাকে দিবাদুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়াটা তার সমাধানের প্রশস্ত উপায় নয়। তবে একটি ব্যক্তিগত দুঃস্বপ্নের কথা বলি। মানসী মনস্তাত্ত্বিক মানুষ, ভালোই জানেন যে প্রেমের মধ্যে একপ্রকার সংহারশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে। তিনি ভারতপ্রেমিক, কিন্তু তাঁর প্রেমাস্পদকে বাধ্যতা-মূলক হিন্দির খাঁড়া দিয়ে কেটে দু-টুকরো করার প্রচ্ছন্ন বাসনা পোষণ করছেন—এই দুঃস্বপ্ন দেখে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি বৈকি। আশা করি আমার দুঃস্বপ্ন অচিরে ভাঙবে এবং চোখ মেলে দেখব ঐ-মারণাস্ত্রটি তাঁর হাত থেকে খসে পড়েছে। তখন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে হিন্দিভাষা ও সাহিত্যচর্চা করার দিন আসবে। আমি অবশ্য ইতিমধ্যেই হিন্দি সাহিত্যের জনৈক গুণগ্রাহী। কিন্তু ওদের বাঁধন যত শক্ত হচ্ছে, আমার উৎসাহ ততই শক্তি হারাচ্ছে।

‘শান্তি কোথায় মোর তরে’

যে স্ব-লিখিত ও প্রায় যাবতীয় প্রাসঙ্গিক বিদ্যায় অনেকখানি সংবলিত প্রবন্ধটি ‘দেশ’-এ (১৯-১১-৭৭) বিকাশ চক্রবর্তী প্রকাশ করেছেন* তাতে আমি খুশি হয়েছি স্বভাবতই। তবে যে-সম্মানের আসনে তিনি আমাকে বসিয়েছেন তার আমি যোগ্য নই। তবু তাতেও খুশি হয়েছি আমার মানুষী দুর্বলতাবশত। অনুমান করি, এ-লেখাটি পড়ে আরো অনেক পাঠক খুশি হয়েছেন। কারণ সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছেন বিকাশ চক্রবর্তী। কয়েকটির উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন; অন্তত আংশিক উত্তর; কয়েকটি অনুত্তরিত রেখে দিয়েছেন। আমার পক্ষে এই উত্তরদানপর্বে কিছু-দূর এগোনো সম্ভব ছিল দু-তিন বছর আগে পর্যন্ত; এখন দন্তাপহারী বিধাতা সেই শক্তিটুকুর বারো-আনাই প্রত্যাহরণ করেছেন। শুধু একটু চেষ্টা করব। সে-চেষ্টার আগে অন্য একটি ছোটো-খাটো প্রশ্ন আমি নিজেই তুলতে চাই।

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-ভাবধারার অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও সুযোগ্য সমালোচনা করেছেন অন্তত ‘গীতাঞ্জলি’-পর্ব পর্যন্ত, তার জন্য আমরা সবাই তাঁর কাছে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংশয় ও অমঙ্গলবোধের কথা যথোপযুক্তভাবে কি তিনি বলেছেন কোথাও? হয়তো বলেছেন, তবে সেটা আমার চোখে পড়েনি, হয়তো পড়েছিল, কিন্তু আমি সঠিক স্মরণ করতে পারছি না। বরঞ্চ মনে পড়ে বিপরীত কথাটাই।

আমার ‘রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা’ গ্রন্থের “অমঙ্গলবোধ ও রবীন্দ্রনাথ” অধ্যায়ের শেষের দিকে আমি লিখেছিলাম: ‘শুধু প্রাচীনপন্থীরা নন, আধুনিক মেজাজ ও রীতির শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধি বুদ্ধদেব বসুও বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ জীবনের শুভত্ব বিষয়ে সর্বদা নিঃসংশয় ছিলেন, উপরন্তু গ্যেটে অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথে এ-বিশ্বাসের ঘোষণা অধিকাংশ স্থলেই নির্দ্বন্দ্ব।’ এবং পাদটীকায় আমি তাঁরই শেষ দিককার লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি যোগ করেছিলাম: **‘His verse changed externally**

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

as it had many times before, but neither in his attitude to life nor to the use of language did he outgrow himself." (Buddhadeva Bose, *Tagore : Portrait of A Poet*, 1962, p. 25.)

আমার বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে। তার পরে আরো দুটি সংস্করণ বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এ-যাবৎ বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং কিংবা তাঁর অনুরাগী সুযোগ্য কোনো পাঠক মৌখিক বা লিখিত প্রতিবাদ করেননি। করলে নিশ্চয়ই আমি আমার ভ্রম সংশোধন করতাম।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমি বিশদভাবে বলতে আরম্ভ করি ১৯৬৪ সালে, শেষ করি ১৯৭৭ সালে। এই তেরো বৎসরের মধ্যে আমার মন এবং মতবিশ্বাস কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে, আশা করি সমৃদ্ধ হয়েছে, আশঙ্কা করি হয়তো-বা বিভ্রান্ত হয়েছে। তার ফলে কিংবা নিছক অনবধানতাবশত কোনো-কোনো term-এর ব্যবহারে হেরফের ঘটেছে। শেষ দু-বছরে যা লিখেছি তা অত্যন্ত অসুস্থ শরীর, অক্ষম চোখ এবং ক্ষীয়মান স্মরণশক্তি নিয়ে—ইত্যাদি কৈফিয়ৎ দেওয়া বৃথা, কারণ লিখবার দুঃসাহস যখন করেছি তখন বিকাশের মতো মনোযোগী পাঠকের অক্ষমাও মাথা পেতে নিতে হবে বৈকি।

আমার রবীন্দ্র-আলোচনায় একটি key-term হচ্ছে ট্র্যাজিক চেতনা। তবে তার পর্যালোচনার পূর্বে বলে রাখি যে বিকাশ চক্রবর্তীর একটি প্রশংসাবাক্য আমি কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করতে পারলাম না। তিনি লিখেছেন যে আমি একটি পূর্ণাবয়ব সাহিত্যাদর্শ বা সাহিত্যতত্ত্ব রচনা করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি। উল্টো করে বলা যায় যে আমি রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারাকে ভালোবেসে অনুধাবন করেছি এবং সেখান থেকেই একটি কাব্যতত্ত্ব গঠন করতে প্রায় সক্ষম হয়েছি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজে অনেক গদ্য-পুস্তকে এবং কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় একটি কিংবা একাধিক কাব্যতত্ত্ব আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। তবে শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, আরো অনেক পাশ্চাত্য কবির পদ্য ও গদ্য রচনা থেকে আমি কাব্যতত্ত্ব আহরণ করেছি।

কিন্তু যে-কাব্যতত্ত্বই আমার মনে স্থান পেয়ে থাক, আমি যখন কোনো কবিতা বিচার করতে গিয়ে দেখি তার অবমূল্যায়ন ঘটছে তখন সে-কবিতাটিকে সরাসরি বাতিল করে দিতে পারি না, বিশেষত যখন সে-কবিতা যতবার পাঠ করি ততবারই আমার মনকে স্পর্শ করে এবং মনের গভীরে অনুরণন জাগায়। সমর্থন খুঁজি আমার কাব্যরসিক পরিণতরুচি বন্ধুবান্ধবের কাছে তথা শ্রদ্ধেয় কাব্যবিচারকদের লেখায়।

যদি সমর্থন পাই, তবে আমার রচিত বা গৃহীত কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠি, সেই তত্ত্বটিকে যথোপযুক্তভাবে সংশোধিত করার চেষ্টা করি। যাতে আলোচ্য কবিতাটির মূল্য তার মধ্যে স্থান পায়। এইরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আমার রবীন্দ্রনাথের আলোচনাতেও ঘটেছে।

'ট্র্যাজিক চেতনা' শব্দটিতে চেতনা শব্দটি আমি ইংরাজি consciousness বা awareness অর্থে ব্যবহার করেছি। consciousness বা awareness শব্দের পর of সম্বন্ধবাচক অব্যয় পদটি অনিবার্যত আসে, অনিবার্যত প্রশ্ন ওঠে consciousness of what? ট্র্যাজিক বিশেষণটি পরোক্ষেই চৈতন্যকে বিশেষিত করে, সোজাসুজিভাবে বিশেষিত করে চেতনার বিষয়কে, অর্থাৎ কোনো ট্র্যাজিক ঘটনা-সমাবেশকে বা পরিস্থিতিকে। সে-পরিস্থিতি একটি ক্ষুদ্র পারিবারিক সীমানায় আবদ্ধ থাকতে পারে, দু-তিনজন প্রেমিক-প্রেমিকার দুর্লভ প্রেমের চূড়ান্ত ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে; অর্ধেক পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হতে পারে, কিংবা cosmic বা বিশ্বজাগতিক হতে পারে। উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি।

প্রথম উদাহরণ, রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত গল্প "নষ্টনীড়"। দুই ভ্রাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে ট্র্যাজিক বড়ো গল্পটি রচিত। খুব মনোযোগ-সহকারে না-পড়লে সঠিক উপলব্ধি করা যায় না কত দিক থেকে কত সর্বনাশা অর্থে এই সুখের নীড়টি নষ্ট হয়ে গেছে। বিরাট বাড়িতে এবং তার প্রশস্ত বাগানে চারুলতা ঘুরে বেড়াবে একেবারে নিঃসঙ্গ, চারিদিক থেকে কেবল নেকড়ে বাঘের মতো তেড়ে আসবে অসংখ্য স্মৃতি, ঠাকুরপো-বউদির মধুর হাস্যপরিহাস, বাগানকে নূতন করে সাজিয়ে তোলার কত নিভৃত রঙিন জল্পনা-কল্পনা। মধুর স্নেহের সম্পর্ক যে ধীরে-ধীরে নিবিড় প্রেমে পরিণত হয়ে উঠছে তা ওরা টের পায়নি, যখন পেল তখন বড়ো দেরি হয়ে গেছে, ফিরে আসা আর সম্ভব নয়। তারপরে সর্বনাশের পালা আরম্ভ। ভূপতি জানতে পেরেছিল যে অমল চারুলতার মন জয় করেছিল সাহিত্যরচনার পথে। সে-ও সে-চেষ্টা করল। কিন্তু এ-চেষ্টা যেমন মর্মস্পর্শী তেমনি হাস্যকর, কারণ সাহিত্যরচনার লেশমাত্র ক্ষমতা ছিল না ভূপতির।

দ্বিতীয় উদাহরণ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র-র স্বল্পখ্যাত কিন্তু অসাধারণ রসোত্তীর্ণ বড়ো গল্প "বিকল্প" ('অঙ্গীকার' নামক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত)। এ-গল্পটিও তিনজনকে কেন্দ্র করে—এক স্নেহপরায়ণ কিন্তু ঈষৎ স্থূলবুদ্ধি পিতা, তার অনূঢ়া কর্তব্যপরায়ণা উচ্ছলপ্রাণা কন্যা এবং তার ছোটো ভাইয়ের জন্য নিযুক্ত গৃহশিক্ষক। পিতা যখন টের পেলেন এই অতিদরিদ্র নিম্নবর্ণের অতিসাধারণ টিউটরের সঙ্গে তাঁর সুন্দরী

কন্যার সম্পর্ক ধীরে-ধীরে প্রেমে পরিণত হয়েছে, তখন তিনি রাগে আত্মহারা হয়ে শিক্ষককে শুধু তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, তাকে অন্যান্য সহ-ভাড়াটিয়াদের বখাটে ছেলেদের দিয়ে পেটানোর ব্যবস্থা করলেন। পেটানো একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল, টিউটরটি কয়েকদিন পরে জ্বরবিকারে মারা পড়ল। খবর পেয়ে মেয়েটি একেবারে পাষাণ হয়ে গেল। এই পাষাণ-মূর্তিতে নূতন করে প্রাণসঞ্চার করবার সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো তখন বিমূঢ় পিতা শেষ চেষ্টা যা করলেন তা যেমন নিষ্করুণ তেমনি হাস্যকর। তিনি নূতন একজন টিউটরের খোঁজ করতে লাগলেন। মধুর ও করুণ রসের গল্পেও শেষের দিকে হাস্যরসের ছোঁয়া দুই গল্পকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বড়ো গল্পের পর্যায়ে তুলে দিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

দ্বিতীয়প্রকার ট্র্যাজিক পরিস্থিতির উদাহরণ দুই দশকের ব্যবধানে দুটি বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর আগে থেকেই নাৎসীদের ইহুদী নিধন আরম্ভ হয়েছিল ঝটিকা বাহিনীর জঘন্য জয়োল্লাসের মধ্যে। এই দেশেরই প্রকাণ্ড অংশে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে নোয়াখালি পর্যন্ত সারা উত্তর ভারত জুড়ে সাম্প্রদায়িক হানাহানি আকারে ছোটো হলেও ঘৃণ্যতায় প্রচণ্ডতর।

তৃতীয়প্রকার ট্র্যাজিক পরিস্থিতিকে বিশ্বজাগতিক বা cosmic বলা যায়। উপল-বন্ধুর চড়াই-উৎরাই পথে কখনো অগ্রগতি কখনো রুদ্ধগতি কখনো পশ্চাৎ-গতি সত্ত্বেও মানবজাতির প্রগতিধারায় বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়ে রেখেছিলেন প্রায় শেষ জীবন পর্যন্ত—আমি লিখেছিলাম এবং সেই উক্তিটিকে বিকাশ উদ্ধৃতও করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। কিন্তু আমি আরো লিখেছিলাম যে এই প্রগতিধারা চলেছে বিশ্বজাগতিক অবক্ষয়ের উজান বেয়ে। দূর ভবিষ্যতে (বৈজ্ঞানিকদের অনুমান, প্রায় পঞ্চাশ কোটি বৎসর পরে) মানবপ্রগতির এই ক্ষীণ ধারা একদিন বেগ হারিয়ে ফেলবে এবং বিশ্বজাগতিক অবক্ষয়ের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

বিকাশ তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন, বিশ্বব্যাপী মঙ্গলবিধানে আশ্রয় হারিয়ে ফেলেছেন আধুনিক সাহিত্যিকেরা, বিশেষত ডস্টয়েভস্কি ও কাফকা। ব্যাপারটাকে স্পষ্টতর করার জন্য আমি দুইপ্রকার বিধানের কথা বলেছিলাম—প্রাকৃতিক বিধান (natural order) এবং নৈতিক বিধান (moral order)। বর্তমানকালে প্রাকৃতিক বিধানে আস্থা আরো দৃঢ়তর হয়েছে আমাদের সকলের মনে, আধুনিক বিজ্ঞানের অসাধারণ অগ্রগতির ফলে। তারই প্রতিতুলনায় নৈতিক বিধানের ফাঁক তীব্রতরভাবে লক্ষণীয় এবং বেদনাদায়ক হয়ে উঠছে।

বিকাশ লিখেছেন যে বাস্তবজীবনে কোনো পরিস্থিতি বা ঘটনা-পরম্পরা

বেদনাদায়ক হতে পারে, মর্মন্তুদ হতে পারে কিন্তু তা ট্র্যাজিক নয় ; তাকে অবলম্বন করে কোনো শক্তিমান সাহিত্যিক যখন কাব্য বা গল্প রচনা করেন তখন সেই রচনাকেই সংগতভাবে ট্র্যাজিক বলা যায়। আমি ভিন্নমত পোষণ করি। কোনো বেদনাদায়ক ঘটনা যখন মর্মন্তুদতার একটি বিশেষ মাত্রায় পৌঁছয় তখন সেটি ট্র্যাজিকরূপে প্রতিভাত হয় আমাদের সংবেদী হৃদয়ের সম্মুখে। তফাৎ মাত্রাগত, গুণগত নয়। এবং এই পরিস্থিতির চেতনা বা অবহিতিকেও আমি ট্র্যাজিক বলি। রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ শিল্পীর রচনায় যখন সেটি অভিব্যক্ত হয় তখন আমাদের ট্র্যাজিক চেতনা অনেক বেশি গভীর এবং পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। এখানেও ভেদ মাত্রাগত, গুণগত নয় ; অথবা মার্কস্‌বাদী পরিভাষায় বলতে পারি মাত্রাগত ভেদ যখন একটা বিশেষ পর্যায়ে ওঠে তখন তা গুণগত ভেদে পরিণত হয়।

বিবিধপ্রকার ট্র্যাজিক পরিস্থিতির চেতনা ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে রবীন্দ্রনাথের লেখায়। একটি ছোটো পরিবারে আবদ্ধ ট্র্যাজিক পরিস্থিতি অসাধারণ রূপ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়" নামক গল্পে এবং "পরিশোধ" নামক কবিতায়। 'মানসী' পর্বে আরো একটু বৃহদাকার ট্র্যাজিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন তিনি। আবালবৃদ্ধবনিতাবাহী তীর্থযাত্রীর জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ে ডুবে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হলো ঈশ্বরের বিধান কোথাও নেই, সর্বত্রই জড়ের রাজত্ব। অথবা মানবভাগ্য নিয়ে শুভের দেবতা এবং অশুভের দেবতার মধ্যে যেন দ্যূতখেলা চলছে। কে কখন জয়ী হবে কিছুই বলা যায় না। 'মানসী' থেকে 'কল্পনা' পর্যন্ত দেখা যায় তাঁর প্রগাঢ় মানবপ্রেম এবং দুর্ভাগা মানুষের প্রতি সমবেদনার সঙ্গে গতানুগতিক ঈশ্বরের মঙ্গলবিধানে তথা মঙ্গলময় বিধাতার আস্থার ঘাত-প্রতিঘাত। সেটাই 'মানসী' থেকে 'কল্পনা' পর্যন্ত নৈরাশ্য ও বিষাদের ছায়া ফেলেছে তাঁর কাব্যে। সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন তিনি তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত জীবনদেবতার প্রত্যয়ে। কিন্তু সেটা অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার।

বিষাদ ও নৈরাশ্য সবচেয়ে গভীর ছায়া ফেলেছে 'কল্পনা' কাব্যে, বিশেষত তার প্রথম কবিতায়। তবু সেটা তেমন নিরেট নয় যেমন দেখা গেল অনেক পরে রচিত 'বৈকালী' কাব্যে।

নিরাশা ও বিষাদ থেকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী প্রায় দ্বাদশবর্ষকালীন, উত্তরণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের গীতাখ্য তিনখানি গীতিকাব্যে। কিন্তু তার জন্য তাঁকে জনমানবের বিক্ষোভপূর্ণ তীর ত্যাগ করে খেয়া পার হতে হয়েছিল সবুজ ছায়াঘন নির্জনতার প্রশান্ত তীরে। সেখানে বিজন মন্দিরে বসে তাঁর পরাণসখা বন্ধুর সঙ্গে

দ্বিরালাপ প্রায় অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল প্রথম মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে। এই পশ্চিমমহাদেশব্যাপী পরিস্থিতি তাঁর কানে এল মৃত্যুর গর্জন-রূপে। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর বিজন মন্দিরে মধুর সাধনা সমাপ্ত হলো, দেখলেন 'তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে', বুঝলেন তাঁকে নোঙর তুলতে হবে, নতুন মহাসাগরে পাড়ি জমাতে হবে।

কিন্তু গীতাঞ্জলি পর্বের গোড়ার দিকেই তিনি লিখেছিলেন একটি অত্যন্ত রসোত্তীর্ণ কবিতা ("ভ্রষ্টলগ্ন"-"আত্মত্যাগ") ও একটি অর্থঘন প্রতীকী নাটক 'রাজা'। বিকাশ এই নাটক বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন, বিশেষত ঠাকুরদার মানসিকতাকে কেন্দ্র করে। তাই আমাকে আবার সেই নাটক সম্বন্ধে দু-কথা বলতে হবে।

পাঁচটি ছেলে পর-পর মারা গেল, তার হেতু জিজ্ঞাসা করার মতন বিজ্ঞানচর্চা বা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ঠাকুরদার মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে, এই প্রশ্ন তাঁর মনে কি একেবারেই জাগেনি? স্পষ্ট ভাষায় অবশ্য প্রশ্নটি আমিই করেছি, নাটকে কোথাও করা হয়নি। তবে ঠাকুরদার মনের গভীরে প্রশ্নটি তোলপাড় করছিল। তার উত্তর, বস্তুতপক্ষে উত্তরণ, তিনি পেয়েছিলেন নাটকের থীম সঙের মধ্যে—'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে…' ইত্যাদি। অর্থাৎ নান্দনিক দৃষ্টিলাভের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও প্রথম যৌবনে একটি বিরাট ব্যক্তিগত দুঃখ ঘটেছিল নতুন বৌঠানের আত্মহত্যার পর। কিছুকালের জন্য তিনি একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন, নাস্তির অন্ধকার গহ্বরে ডুবে ছিলেন। কিন্তু বেশি কালের জন্য নয়। এই অন্ধকার পার হয়ে বা ভেদ করে তিনি আলো দেখতে পেলেন নান্দনিক দৃষ্টি লাভ করে। নিজের এবং সব মানুষের জীবনকে তিনি দেখলেন যেন সব দুঃখ-সুখের জীবনমৃত্যুর ধারার অনেকটা ওপর থেকে। বিকাশ একে দেশিক উপমা বলছেন। দার্শনিকরা একে বলেন, **viewing all things and all events sub-specie œternitatis (under the form of eternity)**, এই দার্শনিক তর্ক বা বিচার এখানে তুলবার ইচ্ছা আমার নেই।

ঠাকুরদার মুখে আমরা শুনি একটি সুন্দর গান :

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা, প্রিয় আমার, ওগো প্রিয়—
বড়ো উতলা আজ পরান আমার, খেলাতে হার মানবে কি ও॥

কিন্তু হার মানতেই হবে। কারণ খেলাটি দুই অসমান প্রতিপক্ষের মধ্যে; শক্তিতে ও স্বভাবে তাদের বিভেদ অসীম।

তুমি সাধ করে, নাথ, ধরা দিয়ে আমরাও রঙ বক্ষে নিয়ো,
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু রাঙাবে ঐ উত্তরীয়॥

এই অনুনয় খুবই করুণ এবং মর্মস্পর্শী কারণ বিশ্বনাথ নির্মম, তাঁর উত্তরীয় সর্বদাই শুভ্র নিরঞ্জন। ঠাকুরদা এখনো উপলব্ধি করেননি যে তাঁর ব্যাকুল প্রেম প্রেমাস্পদের মধ্যে কোনো সাড়া জাগাতে পারে না, যেমন রক্তের অক্ষরে রবীন্দ্রনাথ জানলেন শেষজীবনে সত্য যে কঠিন, অর্থাৎ নির্মম। তবু বললেন, 'কঠিনেরে ভালোবাসিলাম'। গীতাঞ্জলি-পরবর্তী পর্বে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ হৃদয়ঙ্গম করলেন এই ঈশ্বরপ্রেম স্বভাবত, অনিবার্যত অপ্রতিরক্ত এবং অপ্রতিরঞ্জিতব্য (**unrequitted and unrequitable**); আশ্চর্য এই যে এই কথাটা গীতাঞ্জলি-পর্বের গোড়ার দিকে একটি মূর্খ গ্রাম্য বালিকা জেনেছিল, দেখেছিল যে তার বক্ষের মণিহারের মধ্যমণিটিকে গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল রাজার দুলালের স্বর্ণরথ; রক্তবর্ণ মধ্যমণিটি তো তার হৃৎপিণ্ডেরই প্রতীক।

বিকাশ ডস্টয়েভস্কির দোহাই পেড়ে একটা শিশুর কান্নার প্রশ্ন তুলেছেন। আমিও ***Brothers Karamazov***-এর কথা স্মরণ না-করেই একই প্রকার প্রশ্ন করেছিলাম। একটি শিশু যদি রোগযন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে এবং তার বিধবা মা-র কোনোরূপ চিকিৎসা করাবার সম্বলমাত্র না-থাকে অথবা থাকলেও সে-রোগের নিরাময় যদি চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাধ্যাতীত হয়—তবে এ নিদারুণ সমস্যা আমাদের সকলের মনকে আলোড়িত করে। এর কি কোনো সমাধান, কোনো উত্তর নেই? আমরা কি বিরাট নিরুত্তরের সম্মুখীন? একটি উত্তর অবশ্য দেওয়া যায়—আমরা মঙ্গলবিধানের (**moral order**) আশ্রয়ে বাস করছি না, কোনো মঙ্গলবিধাতার অস্তিত্বে আস্থা রাখতে পারি না।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই একটা পাল্টা প্রশ্ন মনে জাগে। প্রশ্ন ঠিক নয়, বরং পরম বিস্ময়। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক, মূলত পদার্থবৈজ্ঞানিক নিয়মে চালিত এই বিশ্বজগতে মানুষের—যুক্তিনির্ভর, ধর্মাধর্ম-জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের—অস্তিত্ব সম্ভব হলো কী করে? শতকরা ৯৫জন মানুষ যদি মূঢ় দুর্বৃত্ত হিংসাপরায়ণ হয় তবে সেটা খুব বেশি আশ্চর্যের ব্যাপার নয়, মাত্র কয়েক লক্ষ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো গরিলা শিম্পাঞ্জি প্রভৃতির নিকট আত্মীয় ছিল। কিন্তু একজন সক্রেটিস, যীশুখৃষ্ট, গৌতমবুদ্ধ, শোয়াইট্জার, শেক্সপীয়র, বেটোফেন, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবটাই, শৃঙ্খলার পরিধির মধ্যে প্রাকৃতিক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। শুধু একজন কেন, মাত্র তিন-চার দশক পূর্বেই কি আমরা লক্ষ-লক্ষ সাধারণ মানুষের প্রাণ-তুচ্ছ-করা বীরোচিত আচরণের বিবরণ শুনিনি? তার ফলেই তো নাৎসী দানবিক শক্তি মানবিক শক্তির কাছে নতিস্বীকার করল এবং মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে ধুলিবিলীন হলো।

যিনি এমনতরো প্রশ্ন তুলছেন এবং উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি কি প্রাকৃতিক নিয়মের রাজ্যের ভেতরেই রয়েছেন, নাকি অন্তত খানিকক্ষণের জন্য উপরে উঠতে পেরেছেন? আমাদের অক্ষম মনোবিজ্ঞান যে-মনের চর্চা করে তার পিছনে কি আরেকটা মন আছে? একজন শিশুর রোগযন্ত্রণাজনিত কান্না যেমন মঙ্গলবিধানে আমাদের বিশ্বাসকে তছনছ করে দেয়, তেমনি একজন মহামানবের আবির্ভাব কি প্রাকৃতিক নিয়মের জালকে ছিঁড়ে ফেলে না? প্রাকৃতের আড়ালে অতিপ্রাকৃতের ইঙ্গিত বহন করে আনে না? অন্তত আমাদের মনের গভীর তলকে বিস্ময়ে অবাক করে দেয় না কি?

স্বল্পকালীন এই অবাক্যতার গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে শাশ্বতকালীন জ্ঞানীরা শিল্পীরা বাঙ্ময় হয়ে ওঠেন। বস্তুতপক্ষে আমাদের সকলের মনে জ্ঞান ও শিল্পের অঙ্কুর জন্মায়। কিন্তু সেই পর্যন্ত। সেই অঙ্কুরটিকে মহীরুহ করে তুলতে পারেন প্রতিভাবানেরাই। শুধু দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং শিল্পকলা কেন, আমাদের যাবতীয় আধ্যাত্মিক সৃষ্টির জন্মভূমি এমনতরো দুর্লভ মানুষী পরিস্থিতিতেই। এমন-কি প্রেমেরও। জান্তব যৌনবৃত্তিকে তো সুন্দর ও মহান প্রেমে উন্নীত করলেন বাল্মীকি থেকে য়েটস্ এবং রবীন্দ্রনাথের মতন মহাকবিরাই।

হ্যাঁ, ট্র্যাজিক চেতনা একটি ক্রমোচ্চ সোপানের প্রথম পদক্ষেপ। ঘোরানো সিঁড়ি বললে উপমাটা আরো লাগসই হতো। জীবন ও জগতের সঙ্গে এমনতরো নিদারুণ মোকাবেলায় যাঁর কবিহৃদয় পোড় খায়নি তাঁকে সৎ কবি বলি কেমন করে, মহৎ কবির পর্যায়ে তো তিনি গণ্য হতেই পারেন না—আঙ্গিকসিদ্ধি, ছন্দমিলের কারসাজি, শব্দচয়নের কারচুপি, অলংকারের চারুতা, তাঁর লেখায় যতই চমকপ্রদ হোক-না কেন?

স্পিনোজা ছিলেন মূলত দার্শনিক, যে-উপলব্ধিতে তিনি স্থিতিলাভ করলেন নিজের সব সুখদুঃখের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেখানে নিজের পথের শেষ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁর মনে মানবপ্রেম অতিশয় প্রবল ছিল—মানবজাতির উত্থান-পতনের কথা যে তাঁকে বিচলিত করত শুধু তাই নয়, ব্যক্তি মানুষের আত্মস্ফুরণের অনবকাশ তাঁর কবিহৃদয়কে ব্যথিত করত। এই ব্যথিত হৃদয় থেকে যে বিরাট প্রশ্ন আকাশপানে উত্থিত হলো, তার কোনো উত্তর মিলল না শূন্য আকাশে—

বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর
ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের মনের গভীর তলে আলোড়িত ছিল 'গীতাঞ্জলি'র প্রেমময় আনন্দময় পরানবঁধুর প্রতি পিছুটান। এরই সঙ্গে আর-একটি বিক্ষোভ ছিল তাঁর মনে—কবিরূপে তবু তিনি নিজেকে বিকশিত করতে পেরেছিলেন কিন্তু কর্মীরূপে পারেননি।

এই বিবিধপ্রকার হারিয়ে যাওয়া অথবা না-পাওয়া লক্ষ্যগুলির মধ্যে টানা-পোড়েন তাঁর শেষ পর্বের কবিতাকে অত্যাশ্চর্য ঐশ্বর্য দান করেছে আমার চোখে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ-বিষয়ে অনবগত ছিলেন না। 'গীতবিতান'-এর প্রথম গানটি অনেকেরই পরিচিত। তবু তার প্রায় সবটাই এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

কান্নাহাসির-দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা—
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা।
তাই কি আমার ঘুম ছুটেছে, বাঁধ টুটেছে মনে,
খ্যাপা হাওয়ার ঢেউ উঠেছে চিরব্যথার বনে,
কাঁপে আমার দিবা নিশার সকল আঁধার আলা।
শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে,
অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে।
নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা,
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা॥

মা গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করে নবজাতকের মিষ্টিমুখ দেখবে বলে। সর্বপ্রকার সৃষ্টির নিয়মই তাই। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন আনন্দের মধ্যে, এ-কথা শাস্ত্রে বললেও আমি মানতে পারি না। সৃষ্টি করেছিলেন যন্ত্রণার মধ্যেই। তাঁর সৃষ্টি এখনো অপূর্ণ, তাই তো সে-যন্ত্রণা অশ্রুকণা, সে-বেদনা দিকে-দিকে জাগে। সৃষ্টি কোনোদিন কি পূর্ণ হবে? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও তার উত্তর জানেন না; অথবা জানেন। বিষ্ণুরূপে তিনি জগৎ পালন করছেন। জগতের দিকে চেয়ে কেউ বলবে না খুব সুষ্ঠুভাবে পালন করছেন। তাই তো খ্যাপা শিবরূপে তিনি জগতকে নৃত্যের তালে-তালে ধ্বংস-ভ্রংশ করে দিচ্ছেন: এমনি করে ধ্বংস হতে ধ্বংসে চলবে সৃষ্টির পালা।

এই প্রাচীন যুগের পৌরাণিক উপদেশবাণীকে কবিকল্পনা মিশ্রিত বলে একটু হাল্‌কাভাবে নেওয়া যায়, অন্তত তাতে খুব বেশি বিচলিত না-হলেও চলে। কিন্তু নবযুগের আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীরাও অনুরূপ কথা বলেন। তাঁদের বিশ্বনিরীক্ষাতেও ধরা পড়েছে উক্তপ্রকার চক্রগতি—chaos থেকে cosmos-এ বিবর্তন এবং cosmos থেকে chaos-এ প্রত্যাবর্তন। অবশ্য দুয়েকজন সাম্প্রতিক মহাবিজ্ঞানী সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন—অতি-অতি দূর অতীত বা দূর ভবিষ্যৎ বিষয়ে কিছু বলা নাকি পদার্থবিজ্ঞানীর পক্ষে স্বাধিকার-প্রমত্ততা। সে যাই হোক, এরই মধ্যে মানুষ রচনা করেছে আনন্দের কণিকাগুলি, কুড়িয়েছে আনন্দভরা মুহূর্তগুলি—জ্ঞানে, শিল্পসাহিত্যে, চারিত্রমাহাত্ম্যে, প্রেমে।

প্রথম পর্বেও ঈশ্বর-ভক্তি এবং মানবপ্রেমের মধ্যে বিপরীতমুখী টান রবীন্দ্র-চিত্তকে বিষণ্ণ ও বিচলিত করে রেখেছে। আমার ধারণা যে কবি রবীন্দ্রনাথ-এর ভাবে ও ভঙ্গিতে পরিণতি টিমে লয়ে ঘটেছিল। বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি তখনই তিনি উভয় দিক থেকে পরিপূর্ণতা লাভ করলেন। কাজেই ঐ-সময়ে রচিত 'কল্পনা' কাব্যে উক্ত বিষাদ এবং বিচলতার প্রকাশ এমন রসোত্তীর্ণ হয়ে দেখা দিল, 'কল্পনা'র পরে প্রকাশিত হলো 'নৈবেদ্য', 'ক্ষণিকা' এবং 'খেয়া'। 'ক্ষণিকা'তে দেখা যায় ট্র্যাজিক পরিস্থিতি থেকে সাময়িক উত্তরণ। 'নৈবেদ্য'কে আমি বলব পদস্খলন, ঐ-কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই হয় প্রচারধর্মী, নয় অত্যন্ত উপনিষদ-আশ্রিত। 'খেয়া'তে আমরা আবার দেখতে পাই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা। তবে 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা' এবং 'খেয়া' আমার অতিশয় প্রিয় ; আমার বিশ্বাস আমার রুচি অনেক সুধী পাঠকের সমর্থন লাভ করবে। শেষ পর্বে তাঁর ট্র্যাজিক চেতনা অনেক বেশি গভীর ও পরিব্যাপ্ত হলো, বিপরীতমুখী টানাটানি আরো জটিল হয়ে উঠল, বিবিধমুখী টানাপোড়েনে তাঁর আন্তরিক বিষাদ ও যন্ত্রণাকে তীব্রতর করে তুলল।

স্পিনোজা শান্তিলাভ করেছিলেন নান্দনিক উপলব্ধিতে পৌঁছবার সফল সাধনায়। তাই তিনি হলেন ঔপনিষদিক অর্থে কবি, বিশ্ববরেণ্য (আমার ধারণা তো বটেই) দার্শনিক। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত, বিশেষত শেষ পর্বে, অশান্তির আঘাতে বিক্ষত হৃদয়ে পৌষ-ফাগুনের পালায় দুলতেই থাকলেন, তা-ই তিনি হলেন বিশ্ববরেণ্য কবি, আধুনিক অর্থে কবি। এখানে কবির অভিধায় কাহিনীকার এবং নাট্যকারও অন্তর্ভুক্ত।

তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ কবিতায় আপন বিশিষ্ট গায়কীতে সুরসংযোজনা করে যা সৃষ্টি করলেন তার তুলনা নেই। প্রতিভার এমনতরো যুগ্মতা:

অত্যন্ত বিরল। শেকস্‌পীয়রীয় নাটকের কয়েকটি গান অবলম্বন করে প্রায় দু'শো বছর পরে মহৎ সংগীত রচনা করলেন বিখ্যাত জার্মান সুরকার শুবের্ট, ইয়েটসের কবিতাকে গান করে তুললেন বেঞ্জামিন ব্রিটন। বিখ্যাত গীতিনাট্য বা অপেরাগুলিতে বিপরীত অনুক্রমটাই রীতি। মোৎসার্ট বা হ্বাগনার (Wagner) মহৎ সংগীত রচনা করলেন তাতে libretto বা কথার জোগান দিলেন যাঁরা তাঁরা অখ্যাতির আড়ালেই রইলেন. খ্যাতিমান হবার মতন কবিপ্রতিভা তাঁদের ছিল না। আজি হতে শতবর্ষ পরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা হয়তো খানিকটা নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, যেমন আমাদের আজকের চোখে হয়েছে মাইকেল মধুসূদনের রচনাবলী। সেটাই স্বাভাবিক। তবে চণ্ডিদাসের পদাবলী (আমি সুরের কথা বাদ দিয়ে শুধু কবিতার কথাই বলছি এখানে) এখনো আমাদের মন কাড়ে। দূর অতীতের প্রতি আমাদের একপ্রকার মমতা জন্মায়, সে-কালের প্রতিভাবানরা যতটা মহৎ ছিলেন তার চেয়ে তাঁদের মহত্তর বোধ করা এবং প্রতিপন্ন করার প্রবৃত্তি জাগে। নিকট অতীতকে নিয়েই বিড়ম্বনা, অবহেলা এবং অবজ্ঞা। রবীন্দ্রনাথের বেলাও তাই ঘটেছিল। কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন শক্তিমান কবি ভাবলেন তাঁদের কীর্তি এবং স্বকীয়তাকে উজ্জ্বলতর করে দেখাবার জন্য প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের সূর্যপ্রতিম দীপ্তিচ্ছটাকে কতকটা ছায়াচ্ছন্ন করা। কিন্তু এ-প্রয়োজনবোধ অলীক; তাঁরা রসিক পাঠকের রুচির ও হৃদয়বৃত্তির বিস্তারের উপর ভরসা রাখতেই পারতেন। আমার কিন্তু মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রতি, বিশেষত শেষ পর্বের কাব্যের প্রতি এ-অবিচার এখন যাওয়ার পথে।

রবীন্দ্রকাব্য যখন কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে শতবর্ষ পরে, তখনো রবীন্দ্রসংগীত সমানে জ্যোতিষ্মান থাকবে। কারণ আগেই বলেছি, একই ব্যক্তির মধ্যে মহৎ কবি এবং মহৎ সুরকারের এমন বিস্ময়কর যুগ্মতা এক শতাব্দীর মধ্যে কেন অর্ধ-সহস্রাব্দীর মধ্যেও একাধিকবার ঘটবে বলে তো মনে হয় না; কোথাও ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।

আমি তোমায় ভালোবাসি

বলো বীর, বলো উন্নত মম শির
শির নেহারি আমার নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির।

এতদিন নিজেকে প্রশ্ন করেছি—এই বীররা কোথায়, তারা কি কেবল স্বপ্নলোকবাসী, কবির কল্পনাতেই তাদের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়? দু-চারজন যুবকের কথা মাঝে-মধ্যে শোনা যেত অবশ্য যাদের আমরা বিপ্লবী বলে জানতাম, নিন্দুকরা আখ্যা দিতেন 'সন্ত্রাসিক'। সবচেয়ে বড়ো বিপ্লবী-বীর যিনি তিনি প্রাণত্যাগ করলেন এক ধর্মান্ধের গুলিতে ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে। দূর দেশ থেকে বড়ো আকারের বীরত্বের কাহিনী ভেসে আসত—১৯৪১-৪২ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে, সোভিয়েট রাশিয়া থেকে, কয়েক বছর পরে য়েনান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে, আরো সম্প্রতিকালে আলজিরিয়া থেকে, উত্তর ভিয়েতনাম থেকে। কে জানত বীরত্বের এমন জাজ্বল্য, এমন সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধেয় রূপ দেখা দেবে আমাদেরই বাড়ির পাশে, তাদেরই মধ্যে যাদের সঙ্গে এক মধুর ভাষা ও মহৎ সাহিত্যের সোনালি সূত্রে আমাদের রাখীবন্ধন সুদৃঢ়। সবচেয়ে নিবিড়ভাবে এপার বাংলার সঙ্গে ওপার বাংলা মিলেছে রবীন্দ্র-প্রেমে। দুই বাংলা এক নয়, তবু তাদের ঐক্য বড়ো সুন্দর।

ঐক্য প্রধানত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। সে-ঐক্য আজ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি কর্মীদের পক্ষে যেমন মর্মান্তিক বেদনার কারণ হয়েছে তেমনি অভূতপূর্ব গর্বের। যার নাম করতেও ঘৃণা বোধ হয় সেই টিক্কা খাঁর আদেশে ২৬ মার্চ রাত্রে ঢাকা শহরে প্রথম হামলার সবচেয়ে হিংস্র আঘাত পড়ল প্রখ্যাত অধ্যাপক ও সাহিত্যিকদের উপর এবং দেশপ্রেমে নিবেদিতপ্রাণ ছাত্রদের উপর। চূড়ান্ত বর্বরতা সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঐ-বর্বরদের মগজে কিছু বুদ্ধি ছিল যেমন চিতাবাঘের মগজেও থাকে। তারা খোঁজখবর নিয়ে ঠিকই জানতে পেরেছিল যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলে ছিল ওখানকার জ্ঞানী, স্রষ্টা ও ছাত্রদের জাগ্রত বুদ্ধি এবং উদ্দীপনাময় কর্মশক্তি। এতে আমরা স্বভাবতই গর্বিত। কিন্তু মার্শাল ল-এর ঐ মূঢ় অধিকর্তা বুঝতে পারেনি যে, চিত্তের আলো একবার জ্বলে উঠলে তাকে ফুঁ দিয়ে নেভানো যায় না; প্রাগৈতিহাসিক বিরাটকায় জন্তুদের মতন বড়ো-বড়ো

নিশ্বাস টেনে যতই ফুঁ দেওয়া হয় ততই সে আলো ছড়িয়ে পড়ে। জ্ঞানী এবং স্রষ্টার বুকে গুলি বসিয়ে দিলে তাঁরা মরেন না অমর হয়ে থাকেন এই পৃথিবীতেই। মধ্যযুগের ধর্মান্ধ পাদ্রিরা এ-কথা জেনেছিলেন বহু শত প্রতিভাবানকে পুড়িয়ে ফেলে —পাকিস্তানের হিংস্র জেনেরালরাও এ-কথা জানবেন শীঘ্রই। তবে সভ্যজগতের মনে (যদিও ভূতলের কতটুকু অংশ আজ সভ্য তা মানচিত্রে খুঁজে বার করতে হলে আতশ কাচ লাগে) এবং ভাবী ইতিহাসের পাতায় ঐসব জেনেরালদের কলঙ্কিত নাম বেশ-কিছুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হুলাগু খাঁকে, নাদির শাহকে, হিটলরকে কি আমরা সহজে ভুলতে পারব ?

কয়েক মাস আগে আমার এক মামাতো বোনের সতেরো বছরের নাতনী নায়লা এল ঢাকা থেকে, কলকাতা হয়ে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার জন্য। আমার ঘরে বসে এক সন্ধ্যায় গেয়ে শোনালো 'ওহে জীবনবল্লভ'। কলানৈপুণ্য খুব উঁচুদরের ছিল না, কিন্তু সমস্ত দেহমনপ্রাণ ঢেলে গাইল সে। তার গভীর নিষ্ঠা ও ভালোবাসা আমার মনকে স্পর্শ করল। আমি নীলিমা সেনের দুটি রেকর্ড বাজালাম। তার চোখে জল এল। বুঝলাম সে সত্যিই আমার আত্মীয়, রক্তের সম্পর্ক তো বাইরের জিনিস, দৈহিক ব্যাপার। সন্‌জীদা, ফ্যাহ্‌মীদা, রাখী, বিল্‌কীসের পরিশীলিত কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শুনবার পর তো আমি ভাবতে পারি না এরা ভিনদেশের মেয়ে। পার্টিশনের দেওয়াল মজবুত করে, উঁচু করে তোলা থাক্, থাকাই ভালো ; নানা ঐতিহাসিক, রাজনীতিক এবং সম্ভবত অর্থনৈতিক কারণে তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু কী এসে যায় তাতে। সে-দেওয়াল ভেদ করে আমরা মিলেছি যার ডাকে (মুজীব হয়তো বলবেন মায়ের ডাকে) তার স্থান সমস্ত রাজনীতির অনেক উপরে। নায়লা কি এখন বেঁচে আছে ?

আমার রক্ত-সম্পর্কিত কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানেও আছেন, পূর্ব বাংলাতেও আছেন। তাঁদের কথা আমি ভাবছি না। আমি সর্বক্ষণ ভাবছি আমার সেই লক্ষ-লক্ষ আত্মীয়ের কথা যাঁরা অনমনীয় বীর্যে ও অকুণ্ঠ আত্মদানে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তুলছেন—সেই বাংলাদেশ যার জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা'। কেবল একই সাহিত্যানুরাগ নয়, একই প্রকার সমাজচেতনা ও ধর্মচেতনা পদ্মার দুই পারের বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করে। সে-সমাজচেতনা সহিষ্ণু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং ডিক্টেটর্‌শিপ মাত্রকে ঘৃণা করে। তফাৎ এই যে তেমন ডিক্টেটর্‌শিপের বিকট হিটলরি চেহারা তাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং না-জানি কত লক্ষ মানুষের রক্তের অক্ষরে চিনেছেন : আমরা এখনো পর্যন্ত একটু দূর থেকে শুধু তার গর্জন শুনেছি।

যেহেতু ইসলামের নামে বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তান এতদিন বলপূর্বক শোষণ করে এসেছে এবং আজ লক্ষ-লক্ষ বাঙালি মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করছে, নগর-গ্রাম পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে, তাই তাঁদের চিত্ত আজ মধ্যযুগীয় ধর্মভাবনা থেকে মুক্ত। বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের পিছনে সংস্কারমুক্ত যুক্তিনির্ভর বুদ্ধির প্রেরণা প্রথম থেকেই ছিল। সে-বুদ্ধিমুক্তিকে খানিকটা বিভ্রমী ইংরেজি পরিভাষা প্রয়োগ ক'রে আমরা secularism বলে থাকি, কিন্তু তা স্থূল জড়বাদ বা বালকোচিত কালাপাহাড়ি নয়। জীবনের কঠোরতম অভিজ্ঞতায় ও আকুল বেদনায় সেই অধ্যাত্মবোধ লাভ করতে হয় যা শাস্ত্রশাসিত নয়, অনুষ্ঠান চালিত নয়, মোল্লাপুরোহিত-কলুষিত নয়। আমার বিশ্বাস এই আত্মনির্ভর আত্মজিজ্ঞাসু মানবতান্ত্রিক জীবনবোধই (রবীন্দ্রনাথ তার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতীক) ওপার বাংলার এতবড়ো প্রাণতুচ্ছ-করা সংগ্রামের শক্তি যোগাচ্ছে। নইলে তাদের হাতে আর কী হাতিয়ার আছে ? একে শুধুমাত্র স্বদেশপ্রেম বললে ছোটো করে বলা হয়। অথবা স্বদেশ বলতে তাঁরা কেবল একটি ভৌগোলিক খণ্ড বা সীমিত মানবগোষ্ঠী বোঝেন না।

তাঁরা এবং আমরা একই সোনার বাংলাকে ভালোবাসি। কিন্তু সে তো শুধু বিগত যুগের বা সম্প্রতিকালের সোনার বাংলা নয়। তাতে যে অনেক খাদ মেশানো, আসলের চেয়ে নকল অনেক বেশি। খাঁটি সোনার বাংলা পদ্মার ওপারেও নেই, এপারেও নেই। আমাদেরই সক্ষম হাতে তা গড়তে হবে—অনেক দুর্বিষহ দুঃখের, অনেক লক্ষ মৃত্যুর মূল্যে। এই গড়বার কাজটা ওপারে অনেক দূর এগিয়েছে, এপারে আমরা বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছি।

পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক দলাদলি ও খুনোখুনির ঘনতমসার পরপারে হঠাৎ আলো দেখা গেল পূর্ব বাংলার আকাশে। সেই আলোয় দেখতে পেলাম এক মহান পুরুষকে যাঁর নাম আজ দুই পারের বাঙালির মুখে এবং বঙ্গভূমির বাইরেও কত সমাদরে, কত আদরে উচ্চারিত হয়। দিব্যধামবাসীদিগকে চিৎকার ক'রে শুনিয়ে দিতে ইচ্ছা করে—এই মর্ত্যধামেও কচিৎ-কখনো অমৃতের পুত্র জন্মলাভ করেন, অমৃতশক্তি ছড়িয়ে দেন লক্ষ-লক্ষ যুবক-যুবতী ছেলে-বুড়োর বুকে। সেই অমৃতশক্তিকে গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে এসেছে এক বিরাট জল স্থল ও বিমান বাহিনী—প্রাচীনতম বর্বরতায় উন্মত্ত এবং আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। কোথায় পেল তারা এই প্রচণ্ড অস্ত্রবল ? প্রধানত বর্তমান কালের তিন মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের কাছ থেকে—ইংরেজিতে যাদের বলে Super Powers। এই পরাবিক্রম স্বল্পবুদ্ধি

রাষ্ট্রাধিনায়করা কি জানতেন না যে, কোনো দুর্বল মিলিটারি শাসকগোষ্ঠীকে সর্বপ্রকার দুর্ধর্ষ মারণাস্ত্রে বলীয়ান করে তুললে উত্তমর্ণের স্বার্থসিদ্ধির অনেক আগেই অধমর্ণ মিলিটারি জুণ্টা ঐসব অস্ত্র খরচ করবে নিজের গদী অটল রাখবার জন্য, অর্থাৎ নিজের দেশে বা কলোনিতে মুক্তিকামী জনতাকে কেটে ফেলার জন্য। গত ২৪ বছর পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনি ছাড়া আর কী ছিল? দশ-বিশ লক্ষ নিরস্ত্র মানুষের প্রাণের দাম ইয়াহ্ইয়া নামক জঙ্গী লাটের গদীর দামের চেয়ে অনেক কম—এই হিসাব ছাড়া আর-কোনো হিসাব তিনি বোঝেন কি? পঁচিশ বছর আগে য়ুরোপীয় শক্তিবর্গ এবং জাপান নিজ-নিজ কলোনি থেকে সরে আসতে বাধ্য হলো। আর আজ colonial empire বজায় থাকবে শুধু পাকিস্তানের? পাকিস্তানের লুটেরা শাসকরা তাদের কলোনির ঐক্যবদ্ধ সাত কোটি স্ত্রী-পুরুষকে শায়েস্তা করবার জন্য কী বীভৎস কী অমানুষিক কাণ্ড করছেন তা কি কারও অজানা আছে?

কিন্তু কেন এই ভয়ংকর শাস্তি? কী অপরাধ করেছেন বাংলাদেশের সাত কোটি সাধারণ মানুষ একমাত্র আওয়ামী লীগকে নির্বাচন করে, কী অপরাধ করেছেন আওয়ামী লীগের অসাধারণ নেতা কেবল স্বায়ত্তশাসন দাবি করে? সংখ্যাধিক্যের অজুহাতে তিনি অনায়াসে পশ্চিম পাকিস্তানের উপর রাজত্ব করার গণতান্ত্রিক অধিকারও দাবি করতে পারতেন। কিন্তু তেমন দাবি তিনি করেননি, কারণ মুজীবুর রহমান ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, ন্যায়-অন্যায়ের ভেদ বোঝেন। তিনি বোঝেন যে পশ্চিম পাকিস্তান আর বাংলাদেশ এক দেশ নয়। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই যদি এক জাতি গঠন করতে পারত তবে আফগানিস্তান আর পাকিস্তান এক রাষ্ট্র হলো-না কেন? শুধু ইসলাম ধর্মে নয়, ভূগোলে ভাষায় সংস্কৃতিতে তারা পরস্পর-সংলগ্ন। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের ভৌগোলিক দূরত্ব যেমন দুর্লঙ্ঘ্য, ভাষা ও সংস্কৃতির দূরত্ব তেমনি বা ততোধিক দুর্লঙ্ঘ্য। এইসব বিবেচনা করে মুজীব কেবল বাংলাদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন চেয়েছিলেন।

এ তো বড়ো অমার্জনীয় অপরাধ! অতএব মুজীবুর রহমানকে এবং তাঁর সকল সমর্থনকারীকে অর্থাৎ বাংলাদেশের সকল নাগরিককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। মানুষকে কি এতই মূল্য দিতে হয় মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্য? আজ বাংলা-দেশ একাই লড়ছে, প্রায় বিনা অস্ত্রেই লড়ছে। সামরিক সাহায্য দূরের কথা, আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের প্লেনকে পর্যন্ত ফিরিয়ে দেওয়া হয় করাচী থেকে। অথচ বাংলাদেশে হতাহতের সংখ্যা কত লক্ষে পৌঁচেছে তা কেউ জানে না। ইয়াহ্ইয়ার

জঙ্গী সরকারের একমাত্র তুলনা হিটলারের নাৎসী গবর্নমেণ্ট। কিন্তু হিটলরকে পর্যদুস্ত করবার জন্য পৃথিবীর অধিকাংশ ছোটো-বড়ো দেশ জোট বেঁধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। মুজীবুর রহমানের অত্যন্ত বৈধ সরকারের পাশে দাঁড়াবার মতো নৈতিক সাহস কিন্তু কারো নেই। বোঝাই যাচ্ছে গত তিরিশ বছরে প্রায় সারা পৃথিবীর নীতিবোধ আরো ম্লান হয়ে গেছে, মনুষ্যত্বের আদর্শ আরো ধূলিমলিন। হিটলরকে সমর্থন করে চেম্বরলেন ধিকৃকৃত হয়েছিলেন ; আজ যেসব ছোটো-বড়ো রাষ্ট্রপতিরা পাকিস্তানের খুদে হিটলরের সমর্থনে সোচ্চার বা নীরব, তাঁদের ধিক্কার দেবারও কেউ নেই। যাঁদের দরাজ হাতে দেওয়া অতি জঘন্য-সব অস্ত্র নিয়ে ইয়াহ্ইয়া একটি নিরস্ত্র দেশে ব্যাপক গণহত্যায় বদ্ধপরিকর, তাঁরা অস্ত্রদান বন্ধ করবেন এমন কোনো ইচ্ছা ঘুণাক্ষরেও এখনো প্রকাশ করেননি। তার মানে বাংলাদেশে অগণিত লোকের নিহত বা বিকলাঙ্গ হওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনও পরোক্ষত দায়ী। ইয়াহ্ইয়া নাকি স্কুলে পাটিগণিত ভালো শিখেছিলেন। বোধহয় তাই তিনি স্থির করেছেন যে বাংলাদেশের অন্তত দেড় কোটি লোককে দ্রুত হাত চালিয়ে মেরে ফেললে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাধিক্য প্রমাণ হয়ে যাবে। তখন নতুন করে নির্বাচিত গণপরিষৎ ডাকা হবে। কে বলে তিনি খাঁটি গণতন্ত্রের ধ্বজাধর নন।

তবু আকাশের সব আলো নিভে যায়নি। আমরা জেনেছি, প্রায় চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, সত্যিকার মনুষ্যত্ব কাকে বলে। দেখেছি শুধু দু-একজনের মধ্যে নয়, লক্ষ-লক্ষ মানুষের মধ্যে। দু-একজন মহাপুরুষকে পূজা করে জীবনের উপর, ভগবানের উপর, বিশ্বাস রাখা কঠিন। কিন্তু লক্ষ মানুষ যখন দেবত্বের অভিজ্ঞান নিয়ে আসেন আমাদের মাঝখানে তখন আমরাও মানুষ হয়ে উঠবার প্রেরণা পাই। জন্মসূত্রে কেউ আর মানুষ হয় না, দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তুই হয়। অনেক তপস্যায় মানুষকে মানুষ হতে হয়। সেই তপস্যার মন্ত্র দিয়েছেন শেখ মুজীবুর রহমান। তাঁর বাংলাদেশের অবর্ণনীয় দুঃখে আমাদের বেদনা সত্য কিন্তু যথেষ্ট নয়। তবু আমাদের গভীর বেদনা তাঁদের দুঃখকে সহনীয় করুক, সফল করুক ; তাঁদের বীরোচিত মৃত্যু আমাদের জীর্ণ জীবনকে প্রাণিত করুক, পবিত্র করুক।

৭ এপ্রিল ১৯৭১

সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য

নির্জনতা-বিলাসী শিল্পীর দিন গিয়েছে। পুণ্যোদক নির্ঝরিণীর তীরে স্নিগ্ধছায়া তরুতলে বসে মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহগাথা রচনা করে আধিক্ষামা বলিব্যাকুলা দয়িতার উদ্দেশে পাঠানো এ-যুগের কবির কাজ নয়। পুরাতন সমাজের পাড় ভাঙছে একদিকে, নতুন সমাজের পলি জমছে আর-একদিকে। এই ভাঙাগড়ার মহাযজ্ঞশালায় ডাক পড়েছে সমস্ত শিল্পীর। সংগীতকার বাঁশি হাতে করে, সাহিত্যিক লেখনী ধরে, চিত্রকর তাঁর তুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন তাঁদের গজদন্তের মিনার-চূড়া থেকে। তাঁদের স্থান আজ জনতার মাঝখানে, যেখানে—

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।

সমাজজীবনের ভাঙাগড়ার মাঝখান দিয়ে চলেছে ইতিহাসের যে-ধারা, কোনো শিল্পী যদি তাঁর সৃষ্টিক্ষেত্রকে তার তরঙ্গাঘাত থেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখেন তবে তার উর্বরতা যাবে নষ্ট হয়ে, তা আর শস্যশ্যামল থাকবে না, হবে ধুসর মরুভূমি—আধুনিক কৃষ্টিতে যে-মরুভূমি দেখতে পেয়ে বিলাপ করেছেন এলিয়ট তাঁর ক্ষুদ্রকায় মহাকাব্যে।

জর্মানি জাপান ইতালির ফ্যাসিজ্‌ম্‌ মরেছে কিন্তু তার প্রেতাত্মার দাপট এখনো থামেনি। সে-প্রেতাত্মা নানা মুখোশ পরে নানা দেশে দেখা দিয়েছে, কোথাও-বা ফোঁটা-তিলক কেটে, আবা-কাবা পরে, কোথাও-বা স্বাধীনতার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রস্তরমূর্তি ধারণ করে—এক হাতে এটম্‌ বোমা, অপর হাতে ডলারের থলি। অন্যদিকে জেগে উঠেছে নতুন সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ে তুলবার অপরাজেয় সংকল্প। এই নবজাতকের সঙ্গে নরঘাতকের শক্তিপরীক্ষা চলছে পৃথিবীব্যাপী যে-রণরঙ্গভূমিতে সেখানে শিল্পী-সাহিত্যিককে আসতেই হবে, নিতে হবে তাঁদের স্থান—শুধু নয়, শীর্ষস্থান। কারণ, প্রথমত তাঁরা শিল্পী হলেও নীহারিকাবাসী নন, এই

পৃথিবীরই মানুষ, এবং সর্বমানুষের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে গাঁথা। দ্বিতীয়ত, সর্বমানুষের নিবিড়তম শক্তির চাবিকাঠি যে গুপ্ত গুহায় লুকানো সে-গুহার সন্ধান তাঁদের জানা আছে। তাঁরা হাজারো লোকের মতন হাজারো লোকের মাঝখানে কাজ করতে পারেন। কিন্তু তার চেয়ে যেটা বড়ো কথা, তাঁরা হাজারো লোককে দিয়ে কাজ করাতে পারেন তাদের অনুভূতির গভীরতম স্তবকে মায়াকাঠি বুলিয়ে।

তাই তো লেনিন বলেছিলেন, 'Down with non-party writers! Down with literary supermen! Literature must become *a part* of the proletarian cause as a whole, part and parcel of a single whole, of the entire social mechanism set in motion by the whole conscious vanguard of the entire working class. Literature must become an integral part of an organised, planned, united social-democratic party work.' লেনিনের আধুনিক ভাষ্যকার লুনাচারস্কি জানিয়েছেন, 'উক্ত নিবন্ধটি ১৯০৫ সালে লিখিত হলেও it has not lost an iota of its profound significance.' লেনিনের রচনার ত্রিশ বছর পরে কমিনটার্নের বিশ্ববরেণ্য নেতা ডিমিট্রিয়ফ সাহিত্যিকদের কাছে আবেদন করেছেন, 'Help us, help the party of the working class, the Comintern—give us a keen weapon in artistic form—in poetry, novels and short stories—to use in this struggle.' এই মহৎ আবেদনে সাড়া দিয়েছেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত এবং ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহু শক্তিমান সাহিত্যিক ও শিল্পী। সে-সাড়ার ঢেউ এসে আমাদের দেশেও লেগেছে। বাংলা সাহিত্য নতুন প্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়েছে, বেগবান হয়েছে। এত বড়ো কাজে আমাদের শিল্পীরা তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়ে এসে দাঁড়াবেন দেশকর্মী ও সমাজসেবীর পাশে, তাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগুবেন এবং তাঁদের এগিয়ে নিয়ে যাবেন, সে তো সর্বৈব আনন্দ ও গর্বের কথা। কিন্তু আশঙ্কার কারণ হচ্ছে এই যে, এইটেকেই শিল্প-সাহিত্যের সর্বপ্রধান, এমনকি তার একমাত্র, সার্থকতা বলে ঘোষণা করা হচ্ছে।

বহু তথ্য ও যুক্তি বিস্তার-পূর্বক মার্কস্ এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছিলেন যে ধনতন্ত্রের ডায়ালেকটিকধর্মী বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে তার অভ্যন্তরীণ বিরোধ ক্রমশ তীব্রতর হবে, ফলে তার ধ্বংস অনিবার্য। 'বুর্জোয়া সমাজের সমুন্নত উৎপাদিকা শক্তি হরেকরকমের জিনিস তৈরি করেছে, সঙ্গে-সঙ্গে যারা তাদের কবর দেবে সেই

গোরকুনের (grave diggers) দলটিকেও গড়ে তুলেছে। তাদের বিনাশ এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় দুই-ই সমান অবশ্যম্ভাবী।' কিন্তু মার্কস্‌বাদ তো কেবল ভাবী-কথন নয়, মানুষের শ্রেয়বোধের কাছে একটি গভীর আবেদনও বটে। বিজ্ঞানী যেমন নানা তথ্য পর্যালোচনা করে ভবিষ্যদ্বাণী করেন অমুক দিন নৈঋত কোণ থেকে ঘূর্ণিবায়ু উঠবে, মার্কস্‌বাদীর কাছে সমাজ-বিপ্লব তেমন একটি সম্ভাব্য ঘটনা মাত্র নয়। সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তা চায়, প্রাণপাত করেও তা ঘটিয়ে তুলতে প্রস্তুত। এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থানে আর-এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কতখানি অনিবার্য সেটা জানলে তার সুবিধে হতে পারে, কিন্তু তার পক্ষে আসল যে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার সেটা এই যে, নতুন ব্যবস্থাটি পুরানো ব্যবস্থার চেয়ে কতখানি বাঞ্ছনীয়। মার্কস্‌ এবং তাঁর অনুবর্তীরা বড়ো সহজে মেনে নেন, পরের অবস্থাটা আগের চেয়ে উন্নত হবেই, কারণ ডায়েলেক্‌টিক শাস্ত্রে বলে যেটা সিন্‌থিসিস সেটা থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিসের উচ্চতর পর্যায়। দুটোর আংশিক সমাবেশে যা তৈরি তা যে-কোনো একটার চেয়ে স্বভাবতই জটিলতর হবে, কিন্তু উৎকৃষ্টতর হবেই যে তার কী মানে আছে। অর্থাৎ ডায়েলেক্‌টিকের মূল নীতি মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় ডায়েলেক্‌টিক-গতি সব ক্ষেত্রে উন্নতির দিকে, শ্রেয়সের দিকে, হবেই কেন। এমনও তো হতে পারে যে থিসিস ও অ্যান্টিথিসিসের মধ্যে যা দুষ্ট, সিন্‌থিসিস হবে সেই গুণগুলির সমন্বয়ে তৈরি, সুতরাং দুটোর চেয়েই নিকৃষ্ট। অবশ্য আমরা যদি 'উৎকৃষ্ট' এবং 'জটিল' শব্দদুটিকে সমার্থবাচক বলে ধরে নিতে রাজি থাকি তাহলে অন্য কথা। এমনতরো অর্থবিভ্রাট ঘটানোর পক্ষে কি কোনো সুযুক্তি আছে? হেগেলের আধ্যাত্মিক দর্শনে ডায়েলেক্‌টিকের গতি অনিবার্যরূপে নির্গুণ সত্তা থেকে সর্বগুণময় ব্রহ্মের দিকে, অতএব পরোৎকর্ষের দিকে। কিন্তু মার্কসের জড়বাদী ডায়েলেক্‌টিকে তো এ-হেন বিশ্বাসের অবকাশ নেই; জড়প্রকৃতির মধ্যে এমন কোনো অন্তর্নিহিত এষণা থাকতে পারে না যা তাকে শ্রেয়সের দিকেই নিয়ে যাবে। অবশ্য আমরা প্রত্যেক ক্ষেত্রে পৃথক্‌-পৃথক্‌ভাবে বিচার করে দেখাতে পারি যে যদিও এটা নৈয়ায়িক যুক্তিতে অনিবার্য ছিল না, তবু ইতিহাস পদে-পদে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ডায়েলেক্‌টিক গতির ফলে উন্নতি ঘটেছে, উৎকর্ষই সাধিত হয়েছে। তবে তার জন্য আমাদের জানতে হবে উন্নতি বলতে কী বোঝায়, মনের মধ্যে একটি প্রতিমান খাড়া করতে হবে যা দিয়ে আমরা পরখ করে বলতে পারি কোন্‌টা উৎকৃষ্ট কোন্‌টা অপকৃষ্ট। তেমন কোনো নৈতিক প্রতিমান কিংবা শ্রেয়সের ধারণা (idea of the Good) মার্কসীয় দর্শনে খুঁজে পাওয়া যায় না। বরঞ্চ এমনতরো প্রতিমানের

অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে সেটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল, এবং একই ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীতে হবে বিভিন্ন প্রকারের। সমাজমানসের ক্রমবিকাশে শ্রেয়বোধের উত্থান-পতন, শ্রেয়জ্ঞানে ভুলভ্রান্তি ঘটে থাকতে পারে—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে—কিন্তু আমরা যদি শ্রেয়সের কোনো যুগ ও শ্রেণী-নিরপেক্ষ প্রতিমানের অস্তিত্ব না-মানি তবে কোন্ ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে বলব ধনতন্ত্রের চেয়ে সমাজতন্ত্র উৎকৃষ্ট, এবং কিসের জোরে সাধু সংকল্পের কাছে দোহাই পাড়ব ধনপ্রাণ বিসর্জন দিয়ে সমাজবিপ্লবের প্রচেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করতে?

কাজেই দেখা যাচ্ছে শুধু ঐতিহাসিক প্রাগুক্তির উপর ভর করে কোনো বিপ্লবীদল দাঁড়াতে পারে না, শ্রেয়সের আদর্শ সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও সর্বগ্রাহ্য প্রত্যয় তার একান্ত আবশ্যক। সাম্যবাদীরা বলতে পারেন যে তাঁদের আবেদনের পেছনে একটি নৈতিক আদর্শ তো আছেই, তাঁদের দলের নামেই সেটা প্রকট, অর্থাৎ সাম্যের আদর্শ। বর্তমান সমাজের অসমবণ্টনের চেয়ে তাঁদের অভিপ্রেত সমবণ্টন ব্যবস্থার নৈতিক শ্রেয়তা কে না স্বীকার করবে। কথাটা ঠিক। কিন্তু কেবল সাম্যের আদর্শ আমাদের নৈতিক বিচারের চরম আদর্শ হতে পারে না, কারণ তা নিরপেক্ষ নয়। যে-কোনো জিনিসের সমবণ্টন হলেই কি আমরা আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার দিকে এগোবো? আফিমের গুলি, সিফিলিসের বীজাণু, পকেটমারের দক্ষতা—এগুলির সমবণ্টন কি খুব ঘটা করে স্থাপন করবার মতো ব্যাপার? তবেই প্রশ্ন ওঠে কিসের সমবণ্টন আমাদের শ্রেয়বোধকে তৃপ্ত করতে পারে। কী সে আদর্শ বস্তু? মার্কস্‌বাদী সাহিত্য পড়লে অনেক সময় ধোঁকা লাগে তাঁরা শুধু আর্থিক সাম্যের কথাই ভেবেছেন। সকলের আয় যদি সমান হয়ে যায় কিংবা শ্রমের অনুপাতে হয়, তাহলে কি সমাজ-বিপ্লবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? সকলকে যে খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে এবং আজকের মুনাফাভোগীর দলকে বিলুপ্ত করে দেশ-বাসীমাত্রকে দেশের সম্পদের অধিকারী করতে হবে—এ তো একেবারে গোড়ার কথা, বিতর্কের কোনো অবকাশ এতে থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, ততঃ কিম্? অর্থের সম্ভোগ—তা সে যত প্রচুরই হোক্ এবং যত সমভাবেই বণ্টন করা হোক্—আমাদের ব্যক্তিক বা সামাজিক জীবনের শেষ কথা, চরম উদ্দেশ্য হতেই পারে না।

মার্কস্‌বাদী বলবেন, শেষ কথা নাই হলো, এটা যখন গোড়ার কথা, তখন এইটুকু তো হোক্ আগে, পরের কথা পরে ভাবা যাবে। তা হয় না, বিপ্লবের পর তো আমরা শূন্যে ঝুলে থাকতে পারি না, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ও সমাজতন্ত্রের

পত্তন একই ঐতিহাসিক ঘটনার এপিঠ-ওপিঠ। অনাগত সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি গবেষণা নিয়ে ব্যাপৃত থাকাকে Utopian Socialism বলে উপহাস করা চলে কিন্তু সে-সমাজপ্রতিষ্ঠার চরিতার্থতা বা ব্যর্থতা যে-আদর্শের মাপকাঠি দিয়ে আমরা মাপব, অন্তত সেই আদর্শের ধারণা যদি আমাদের মনে স্পষ্ট না-থাকে তাহলে তার সাধনার মার্গও আমরা ঠাহর করতে পারব না। ব্যক্তিগত-ভাবে দু-দশজনের উপকার করতে চাইলে তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে দিয়ে বা তাদের রোজগারের পথ সুগম করে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি। কিন্তু লেনিন বিপ্লবীদলের নাম দিয়েছেন Social Engineers। সমাজের পুরানো ইমারতটাকে ভেঙেচুরে তার জায়গায় নূতন আদর্শে নূতন পরিকল্পনায় ঘর তোলবার দায়িত্ব তাঁদের। কেবল ভাত-কাপড়ের, এমনকি কেবল পোলাও কোর্মা কারচুপি কিংখাবের কথা ভাবলে তো তাঁদের চলবে না। সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করতে গেলে রাষ্ট্রব্যবস্থা কেমন হওয়া চাই, ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে কতখানি মূল্য দেওয়া যাবে, শিক্ষাদীক্ষা শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী সাময়িক এবং কোন্‌টার স্থায়ী গুরুত্ব কতখানি—এসব বিষয়ে তাঁদের চিন্তা পরিষ্কার পরিব্যাপ্ত ও মোহমুক্ত না-থাকলে কাজের চেয়ে অকাজ হবে বেশি। শুধু কাজের আনন্দে বা উন্মাদনায় যাঁরা কাজ করে যান তাঁরা কর্মী নন, কর্মবিলাসী। ভাববিলাসীকে আমরা উপহাস করতে শিখেছি, কর্মবিলাসীকে ভয় করতে শিখিনি। ভগবৎনিষ্ঠা বা গুরুভক্তি যাঁদের মনে প্রবল তাঁদের জন্য অবশ্য আছে One step is enough for me বলবার সান্ত্বনা।

মার্কস্‌বাদীরা আরেকটি উত্তর দিতে পারেন: তাঁরা বলতে পারেন যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সামাজিক উৎকর্ষের চরম অভিব্যক্তি নয় বটে কিন্তু সেটাই সর্বপ্রকার উন্নতির একমাত্র পাকা বুনিয়াদ। এর দুটো অর্থ সম্ভব। একটা এই যে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর থেকে পরশ্রমজীবীদের মালিকানা তুলে না-দিলে সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ রুদ্ধ থাকবে। এই অর্থে কথাটা সত্য, অন্তত আমার মেনে নিতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু সেটা মেনে নিলেও সামাজিক উৎকর্ষের আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করবার গুরুত্ব কিছুমাত্র কমে না, কারণ এদিক থেকে দেখতে গেলে সমাজতন্ত্র একটি বাধার অপসারণ মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। খুব সম্ভব মার্কস্‌বাদীরা পূর্বোক্ত বাক্যের এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন, নইলে ব্যক্তি ও সমাজজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তা এত কৃপণ এবং দেউলে কেন, তার হদিস মেলে না। তাঁদের কাছে অর্থনীতি শুধু নঙর্থকভাবে সামাজিক উন্নতির বাধা অপসারণ নয়, সদর্থকভাবে সামাজিক উন্নতির রূপনির্ধারকও বটে। অর্থাৎ সমাজের অর্থনীতিই তার যাবতীয়

মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর্থিক ব্যবস্থাকে মনের মতো ছাঁচে ঢেলে সাজাতে পারলে সমাজের আর সমস্ত স্তর আপনা থেকেই আদর্শ রূপ পরিগ্রহ করবে। গোড়ার দিককার লেখায় মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ তাঁদের ঐতিহাসিক জড়বাদকে এই আত্যন্তিক ভাষায় ব্যক্ত করলেও শেষের দিকে তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, অর্থনীতি সমাজজীবনের একমাত্র নিয়ামক নয়, অন্যতম (যদিচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ) নিয়ামক মাত্র। 'Marx and I are partly responsible for the fact that at times our disciples have laid more weight upon the economic factor than belongs to it. We were compelled to emphasise its central character in opposition to our opponents who denied it, and there wasn't time, place or occasion to do justice to the other factors in the reciprocal interaction of the historical process.' (এঙ্গেল্সের পত্র) তার মানে দাঁড়ায় এই যে, অর্থনীতির কোনো একটি কাঠামো, অন্যান্য সামাজিক উপাদানের হেরফেরে, সমাজের মনন ও চারিত্রের একাধিক অভিব্যঞ্জনাকে বহন করতে পারে ; এবং পক্ষান্তরে, আর্থনীতিক সংস্থানও ঠিক কী রূপ গ্রহণ ও ধারণ করবে সেটা অন্তত অংশত নির্ভর করে সমাজমনের গতি ও আদর্শের প্রেরণার উপর। সুতরাং কেবলমাত্র অর্থনীতির বাটখারা দিয়ে আমরা সমাজের সামগ্রিক উন্নতির পরিমাপ করতে পারি না। তার চেয়ে আরো ব্যাপক আরো গভীর কোনো আদর্শের ধারণা আমাদের মনে থাকা চাই।

পূর্বেই বলেছি যে, আর্থিক সাম্য আদর্শ সমাজ গঠনের পক্ষে অপরিহার্য হলেও সেটাকেই চরম আদর্শ বলে মেনে নিতে আমাদের শ্রেয়বোধ রাজি নয়। মার্কস্‌পন্থীরা বলতে পারেন তাঁদের সামাজিক আদর্শ অর্থের সমবণ্টন নয়, সামর্থ্যের সমবণ্টন, অর্থাৎ এমন সমাজ গড়ে তোলা যেখানে সকলেই সমান সুযোগের অধিকারী হবে। কিসের সুযোগ? তার স্পষ্ট উত্তর মেলে না। 'সব কিছুর সুযোগ' বলে প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে খুনোখুনি করবার প্রাক্‌সভ্য সুযোগ বা শেয়ার বাজারে তেজিমন্দি খেলবার অতিসভ্য সুযোগের পরিব্যাপ্তি ঘটলে আদর্শ সমাজ স্থাপিত হবে এমন দাবি কেউ করবেন না আশা করি। ঠিক কিসের সুযোগ সে-প্রশ্নের খুচরো উত্তর না-দিয়ে যদি পাইকারি-ভাবে বলা হয় সুখী হবার সুযোগ, তাহলে কি সমস্যার নিরাকরণ হয়? শুধু সাম্যবাদী নয়, মার্কসের আগে এবং পরে বহু দার্শনিক ও ধর্মনীতিবিৎ সামাজিক

উন্নতির এই আদর্শই নিরূপণ করে গিয়েছেন। **Utilitarian**-দের সূত্রটি সর্বজনবিদিত—বৃহত্তম সংখ্যার প্রচুরতম সুখ। মুশকিল বাধে ঐ প্রচুরতম কথাটা নিয়ে। সবসময়ে কি আমরা প্রচুরতম সুখকেই বরণীয় মনে করতে পারি? সক্রাতিস-সুলভ অতৃপ্তি কি শূকরজাতীয় প্রচুরতম সম্ভোগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়? মনে করুন এক সমাজের লোকেরা শিল্প-সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় তৎপর (যেমন ছিল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর এথেন্স্), এবং আরেক সমাজের লোকেরা অত্যন্ত শিশ্নোদরপরায়ণ, আর অবস্থার গতিকে শিশ্নোদর-পরিচর্যায় সক্ষম (যেমন, সম্ভবত, বর্তমান আমেরিকার বিত্তবান সম্প্রদায়)। সে-ক্ষেত্রে কি আমরা প্রথম সমাজকে দ্বিতীয়টার চাইতে অধিক উন্নত বলব না, এবং বলবার আগে কি কোন্ সমাজের সামগ্রিক সুখের মাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি কোন্‌টার কম, নিক্তি দিয়ে ওজন করে দেখবার প্রয়োজন বোধ করব? যেনতেন প্রকারের সুখ যে আমাদের কাছে বরণীয় ঠেকে না তার আরেকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। বিদ্বেষ বলতে অনেক কিছু বোঝায়, আপাতত পরের অমঙ্গলে সুখানুভবকেই বিদ্বেষ নামে অভিহিত করছি। এই সুখের অনুভূতিকে নির্ব্যতিরেকে আমরা নিন্দার্হ জ্ঞান করি এবং সুখের বলেই সেটাকে নিন্দার্হ বলি, নইলে পরের অমঙ্গল-জ্ঞানের সঙ্গে যদি অন্যবিধ অনুভূতি সংশ্লিষ্ট থাকে—যথা বিস্ময় বা বিরক্তি—তাহলে সমগ্র অনুভূতিটাতে দোষের কিছু নেই। বিদ্বেষের দ্বারা পরিচালিত হলে অপর পক্ষের মনেও পাল্টা বিদ্বেষ জাগবে, ফলে তাতে সুখের চেয়ে দুঃখের ভাগটাই অধিক হবে—সে-কথা ঠিক। কিন্তু ভবিষ্যতে দুর্ভোগের আশঙ্কা আছে বলেই কি বিদ্বেষের আনন্দ নিন্দিত? অব্যক্ত, সুতরাং নিরাপদ বিদ্বেষ কি বরেণ্য হবে?—এইসমস্ত আপত্তির চাপে পড়ে মিল্ তাঁর সূত্রটিকে কিছু বদল করতে বাধ্য হলেন, বললেন, আমাদের কাম্য প্রচুরতম আনন্দ নয়, উচ্চতম আনন্দ।

আনন্দের মাত্রাভেদ অবশ্য আছে, কিন্তু তার জাতিভেদটা কেমনতরো ব্যাপার? আনন্দের কি উঁচু-নিচু হতে পারে? তার চেয়ে গোড়ার প্রশ্ন: আনন্দ কি একটা নিরালম্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থা? মনের এমন-কোনো ব্যাপার কি আমরা ভাবতে পারি যেটা আর কোনো-কিছুর উপলব্ধি নয়, কেবলমাত্র আনন্দ বা দুঃখেরই অনুভূতি? একটু তলিয়ে দেখলেই ধরা পড়বে যে আমাদের অনুভূতি মাত্রেরই একটা কোনো বিষয় আছে—সে-বিষয়টা প্রাকৃতিক হতে পারে, আধ্যাত্মিক হতে পারে, ইঁদুরের লাফ থেকে আরম্ভ করে ভগবানের লীলা পর্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে-কোনো জিনিস হতে পারে, কিন্তু একটা কোনো অবলম্বন তার চাই-ই। সুখ-দুঃখের অনুভব হচ্ছে

পরজীবী (parasitic), কোনো-একটি বিষয়ের উপলব্ধি বা চেতনাকে আশ্রয় করে থাকা ছাড়া তার উপায় নেই। ঠাণ্ডা দক্ষিণে হাওয়া লাগল গায়ে—এই স্পর্শানুভূতিটা সুখময়; চোখে পড়ল হিমালয়ের শুভ্র শান্ত মহিমা—এই চাক্ষুষ পরিচয়ে আছে আনন্দের আমেজ; মা জানালেন তার ছেলের সান্নিপাতিক, সেই অবগতিটা বেদনায় ভরা।—এই মতটা মেনে নিলে আনন্দের জাতিভেদ বলতে কী বোঝায় আমরা তার হদিস পাই। আনন্দবোধ যে-কালে আরেকটি উপলব্ধির tone মাত্র (বাঙলায় আমেজ বলা যাক্), তখন উঁচু-নিচু বিশেষণটা স্বভাবতই সেই মূল উপলব্ধি বা উপলব্ধ-বিষয়ের উপর বর্তায়। আমরা যখন বলি কাব্যপাঠের আনন্দ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হলেও উঁচুদরের, এবং রিরংসাতৃপ্তির সুখ তীব্রতর হলেও নিচুদরের (এখানে প্রেমের সংশ্রব বিবর্জিত বিশুদ্ধ রিরংসার কথাই হচ্ছে) তখন আমরা আসলে যা বলতে চাই তা এই যে, আমাদের মূল্যজ্ঞানের স্কেলে কাব্যের স্থান উপরে এবং শৃঙ্গারের স্থান নিচে। সে-মূল্যবিচার কোন্ নীতি অনুযায়ী তার মাপকাঠি তৈরি করে, কোন্ যুক্তি মেনে আমরা একটা বিষয়কে আরেকটার চেয়ে উঁচুদরের সাব্যস্ত করি—এমনতরো প্রশ্নের কোনো সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। যায় না যেহেতু যুক্তি ও প্রমাণের ক্ষেত্র সংকীর্ণ, বিজ্ঞানের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ—সে-সীমানার মধ্যে বিজ্ঞানের মৌল প্রত্যয় কার্যকারণবিধি প্রভৃতিকে আমরা প্রমাণ-নিরপেক্ষভাবেই মেনে নিতে অভ্যস্ত। জীবনের বহু ব্যাপারের মতো মূল্যজ্ঞানও বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণের এলাকার বাইরে পড়ে। এইটুকু বলা যেতে পারে যে, সে এক অপরোক্ষ এবং নিরপেক্ষ উপলব্ধি, খানিকটা ঝাপসা বা অপরিণত হলেও প্রত্যেক মানুষের মনে বিদ্যমান। বলা বাহুল্য, এখানে চরম মূল্যের কথাই হচ্ছে। বেশিরভাগ জিনিসের মূল্য কিন্তু চরম নয়, উপকরণীয় (instrumental); সে-সব ক্ষেত্রে যুক্তি-তর্কের অবকাশ অবশ্যই আছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনিন খাওয়া ভালো। কেন ভালো, এ-প্রশ্ন ন্যায়সঙ্গত এবং তার ডাক্তারিশাস্ত্র-সম্মত উত্তর দেওয়া যায়। কিন্তু সে-উত্তর নির্ভর করে আরেকটি জিনিসের (আরোগ্যের) মূল্যস্বীকৃতির উপর। আরোগ্য কাম্য, কেন তারও জবাব আছে। বলতে পারি, যদি জীবনে সুখ চাও তবে আরোগ্যলাভের জন্য চেষ্টা করো, রুগ্‌ণ শরীরে কোনো সুখ নেই। কিন্তু সুখ চাইব কেন এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। সুখ একটি চরম মূল্য। যদি কোনো বেয়াড়া লোক বলে বসে যে আমি সুখ চাই না, তবে সুখ চাওয়া তার উচিত—এ-কথা কোনো যুক্তি-তর্কের দ্বারা তার কাছে প্রমাণ করা যাবে না। বড়োজোর আমরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে তখনকার মতো তার মুখ বন্ধ করতে পারি।

মূল্যজ্ঞানে কিছু হেরফের পাওয়া গেলেও মোটের উপর তাতে খুব বেশি গরমিল দেখা যায় না। মানবসমাজে যাঁরা গুণী-জ্ঞানী বলে যুগে-যুগে মান পেয়েছেন তাঁরা প্রায় একবাক্যে শারীরিক সুখের স্থান নিচের দিকে নির্দেশ করেছেন। আজীবন অভিজ্ঞতা ও সাধনার ফলে যে তিনটি মূল্যকে তাঁরা সকলের উপর মর্যাদা দান করেছেন সেগুলি আমাদের দেশে সত্য-শিব-সুন্দর নামে বিদিত। তবে শুধু এই-গুলিকে চরম মূল্য বলা ভুল হবে। সুখময় ইন্দ্রিয়ানুভূতিও একটি চরম মূল্য, উপ-করণীয় নয়, কারণ তা অন্য-নিরপেক্ষ। মূল্যবিচারে স্থান তার নিচের দিকে হলেও সেটিকে চরমই বলতে হবে—যদি চরম (ultimate) শব্দটা উপকরণীয় (instru-mental) শব্দের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটু উপরে আমরা সুখমাত্রকেই চরম মূল্য বলে স্বীকার করেছি। তবে একজাতীয় সুখের সঙ্গে আরেক জাতীয় সুখের উচ্চ-নিচের বৈষম্য নির্ভর করে যে মূল-উপলব্ধিকে সে-সুখানুভূতি আবেষ্টন করে রয়েছে তার উপর। পূর্বোক্ত মূল্যবিচার অনুসারে শিল্প-সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান এবং চারিত্রের যে-আনন্দ সেইটেই আমাদের উচ্চতম আনন্দ। এইপ্রকারের আনন্দ যে-সমাজে বৃহত্তম সংখ্যার মধ্যে পরিব্যাপ্ত সেই সমাজকে আমরা বলব আদর্শ সমাজ। অবশ্য সে-সমাজের আর্থনীতিক ব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাতে প্রত্যেকের পক্ষে সচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন-পূর্বক এমনতরো আনন্দের স্তরে উঠে আসা সম্ভবপর। কিন্তু সে আর্থিক ব্যবস্থা সোপানের ধাপ মাত্র, উন্নতির চরম বিনির্ণায়ক (criterion) নয়।

এই মূল্যত্রয়কে সর্বোচ্চ মূল্য বলবার জন্য কি আমরা কেবল শব্দপ্রমাণের উপর নির্ভর করেছি? পাঁচজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন বলেই কি আমরা তা মানতে বাধ্য? তা নয়। আমরা কেবল বলতে চেয়েছি যে মূল্যজ্ঞানের ভিত্তি সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে, যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তাকে প্রতিষ্ঠিত বা বরখাস্ত করা যায় না। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্র্য সব ক্ষেত্রে সমান নয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের চেয়ে সাক্ষাৎ (direct) আরো কোনো অভিজ্ঞতা হতে পারে, কিন্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞানের প্রমাত্ব (validity) যুক্তি-নিরপেক্ষ নয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সঙ্গে যখন বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত কোনো তত্ত্বের বিরোধ ঘটে তখন অনেক ক্ষেত্রে আমরা সে-তত্ত্বকে রদ বা তার বদল করি; কখনো-বা তত্ত্বের মায়া কাটিয়ে সেই বিসংবাদী ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর কাঁচি চালাই, প্রাতিভাসিক (illusory) নাম দিয়ে সেটাকে ছেঁটে ফেলি। পৃথিবীসুদ্ধ লোক প্রতিদিন দেখে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, সমস্ত আকাশ ঘুরে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়। কিন্তু এই সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে চলিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের সৌরতন্ত্র-

বাদকে অস্বীকার করবার কথা কেউ ভাবে না। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বাতিল করব কখন এবং কখন ইন্দ্রিয়জ্ঞানের তথ্যকে ছাঁটাই করব সেটা নির্ভর করে দুটোর মধ্যে কোন্‌টা আমাদের জ্ঞেয় জগতের পক্ষে কম বিপ্লবকারী তার উপর। পাঁড় কমিউনিস্টও বিজ্ঞানাগারের চতুঃসীমানায় ঘোরতর রক্ষণশীল। ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্য-সম্ভারের এক বৃহৎ অংশকে (সবটা নয়) বৈজ্ঞানিক যুক্তিজালে আবদ্ধ করে আমরা এক বহুব্যাপী তত্ত্বশৃঙ্খলা রচনা করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু সেটা সর্বব্যাপী নয়। মূল্যজ্ঞান তার এলাকায় পড়ে না। তাই যুক্তির বিধান সেখানে অচল, অভিজ্ঞতাই চরম সাক্ষী। পরের, বিশেষত যাঁদের আমরা মহাপুরুষ বলে শ্রদ্ধা করি তাঁদের, অভিজ্ঞতা আমাদের অভিজ্ঞতাকে পথনির্দেশ করতে পারে; কিন্তু আমাদের নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে যদি তার সাড়া না-পাই তবে পরের অভিজ্ঞতালব্ধ কোনো আপ্তবাক্য আমরা মানতে বাধ্য নই। সর্বোচ্চ মূল্যের বেলাতেও এ-কথা খাটে। তার সন্ধান আমাদের প্রত্যেককে নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যেই করতে হবে। তবে কিনা সে-অভিজ্ঞতা খাঁটি হওয়া চাই, এবং তা বহুদিনের একাগ্র স্থিতপ্রাজ্ঞ সাধনার অপেক্ষা রাখে।

সত্য-শিব-সুন্দরের পরিপূর্ণ বিকাশ ও বিকীরণই যখন সামাজিক উন্নতির আদর্শ, তখন রাষ্ট্রিক বিপ্লব বা আর্থনীতিক ব্যবস্থান্তর ঘটানোর প্রচেষ্টায় ধারালো অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হওয়াকেই শিল্প-সাহিত্যের চরম সার্থকতা বলে নির্দেশ করা, non-party লেখকদের ধ্বংস কামনা করা, ঘোষণা করা যে সাহিত্যকে সুনিয়ন্ত্রিত সুসংবদ্ধ বিপ্লবী দলের অংশবিশেষ হতেই হবে—এসব কি চরম উদ্দেশ্যকে উপস্থিত উপায়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলার মতো উল্‌টো বুদ্ধির লক্ষণ নয়? অবশ্য একই বস্তু একাধারে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যসাধনের উপকরণ দুই-ই হতে পারে। যেমন বিজ্ঞান। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানও আছে—আর কোনো-কিছুর জন্য নয়, মানুষের জ্ঞানবৃত্তির পরম আনন্দময় প্রকাশ বলেই যার মূল্য। আবার ফলিত বিজ্ঞানও রয়েছে, বিজ্ঞান যেখানে নিজেকে নিয়োজিত করেছে জীবিকানির্বাহের যাবতীয় ব্যবস্থায়, ব্যক্তিক ও সামাজিক উদ্‌বর্তনের সহায়তায়। কিন্তু তাই বলে যদি কেউ দাবি করেন যে আজ যখন সামাজিক ক্রমবিকাশের প্রত্যেক শাখায়-প্রশাখায় বিজ্ঞানের ডাক পড়েছে, তখন technology-ই হচ্ছে বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, যাঁরা ফলিত বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন কেবল তাঁরাই প্রগতিশীল, শিল্পোন্নতির পথ যিনি যত সুগম করবেন তিনি তত বড়ো বৈজ্ঞানিক—তাহলে কেমনতরো শোনায়? শিল্প-সাহিত্যের বেলায় ঠিক অনুরূপ কথাগুলি শোনা যাচ্ছে। এত জোরে শোনা যাচ্ছে

যে আর-কোনো কথা কানে ওঠবার জো নেই। এডিসন মার্কনির কাছে মানব-সমাজ অশেষ ঋণী, কিন্তু তাঁদের মহত্ত্ব স্বীকার করতে গিয়ে তো আইনস্টাইন হাইসেনবের্গকে খাটো করবার দরকার করে না। তবে কেন আমরা ভাবি যে এরেনবুর্গের কীর্তির কাছে টমাস মানের প্রতিভা ম্লান হয়ে গিয়েছে, কেন লুই আরাগঁর জয়গান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা ভুলে যাই, কিংবা ভুলে না-গেলেও তাঁর তিন হাজার কবিতার মধ্যে যে আধা ডজন তথাকথিত প্রগতিশীল কবিতা আছে সেগুলির কথাই স্মরণ করি?

দশ-পনেরো হাজার বৎসব পূর্বে আল্টামিরার গুহাগাত্রে নানা জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি খোদাই করা হয়েছিল। পাথরের গায়ে এমন আশ্চর্য সজীব মূর্তি যে আদিম কারিগররা রেখে গেছেন তাঁদের কলাকৌশলের তারিফ না-করে আমরা পারি না। কিন্তু বিজ্ঞজনেরা বলেন এগুলির উদ্দেশ্য দর্শককে আনন্দ দেওয়া ছিল না, কারণ সেসব গুহা অত্যন্ত দুরধিগম্য এবং ঘুটঘুটে অন্ধকার। এগুলি একান্তভাবে তাদের ম্যাজিকের অঙ্গীভূত ছিল—উদ্দেশ্য, বধ্য জন্তুর উপর অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করা। কড্‌ওয়েল দেখিয়েছেন যে, বর্বর জাতিগুলির নৃত্যও প্রধানত ব্যবহারিক, চাষবাস শিকার প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কর্মের সঙ্গে সর্বদা জড়িত। সভ্যতার গোড়াতে শিল্পকলার মূল্য ছিল নিতান্ত প্রয়োগসিদ্ধ। সভ্যতার শেষ পর্যায়ে আবার তার উপকরণ-মূল্যকে সর্বেসর্বা ঘোষণা করে কি আমরা ইতিহাসের চক্রগতির প্রমাণ দিতে চাই? সাহিত্য সাম্যবাদী বিপ্লবীদলের 'integral part' হোক, তাঁদের হাতে 'keen weapon' হবার গৌরব অর্জন করুক—মানবদরদী কোনো সাহিত্যরসিক তাতে আপত্তি করবেন না। কিন্তু আমরা যেন ভুলে না-যাই যে বিপ্লব যে-লক্ষ্যের দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে, সেখানেও সাহিত্যের আছে স্বীয় এবং সর্বোচ্চ স্থান। ফলিত সাহিত্যের ভূয়সী প্রচারকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাব, কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রতি আমাদের যে অন্তরতম অনুরাগ আছে সেটাকে যেন ব্যাহত হতে না-দিই। তার জন্য বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল, ডেকেডেণ্ট—যত গালাগালি দেওয়া হোক্ সমস্ত সহ্য করবার মতো মহৎ বেহায়াপনা যেন আমাদের থাকে।

বিশুদ্ধ ও ফলিত সাহিত্য

আর্ট সম্বন্ধে সাম্যবাদী মহলে দু-রকমের উক্তি প্রচলিত আছে : (১) আর্টকে হতে হবে সমাজবিপ্লবের বা নিম্নশ্রেণীক সমাজ-প্রতিষ্ঠার ধারালো অস্ত্র, (২) আর্ট হচ্ছে একটি সংবেদনশীল ইতিহাস-সচেতন চিত্তের উপর সমাজজীবনের অন্তর্গূঢ় সত্তার যথার্থ প্রতিফলন। প্রথম মতের অধিবক্তাদের মধ্যে লেনিন ও ডিমিট্রিয়ফের লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি আমার আলোচ্য* প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় মতটি ইদানীং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজবাদী বস্তুতন্ত্র (Socialist Realism) নামে সুপ্রতিষ্ঠিত। দুইমতের মধ্যে সম্পূর্ণ গরমিল আছে আমি তা বলছি না। কিন্তু তাদের সমীকরণও আংশিক এবং আপতিক (accidental)। সামারভিল অবশ্য বলেছেন, স্বধর্মরক্ষায় যে-শিল্পকর্ম যত সার্থক, রাজনৈতিক বিচারেও তা তত উঁচুদরের বলে গণ্য হবে। মানবধর্মী কোনো শিল্পীর রচনায় সমাজগত ও শিল্পগত মূল্যের সাযুজ্য ঘটতে পারে ; যদি ঘটে তবে তেমন রচনা আমাদের কাছে অত্যধিক সমাদরের বস্তু হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাই বলে আমি মানতে প্রস্তুত নই যে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক মূল্যবিচার একই জিনিস। সমাজ সম্বন্ধে গভীর ও সহৃদয় অন্তর্দৃষ্টি যে-লেখায় শিল্পসম্মত রূপ গ্রহণ করেনি তার রাজনৈতিক মূল্যও শূন্যে গিয়ে ঠেকবে, এ-কথা জোর করে বলা যায় না। সে-লেখা যদি ছন্দেবন্ধে উপমায়-উৎপ্রেক্ষায় নাটকীয় সমাবেশে একটি রাজনৈতিক মতের তেজোদীপ্ত প্রকাশ বা একটি রাজনৈতিক পথের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারে তবে সে-লেখার মূল্য আমার কাছে কম নয়। বিশুদ্ধ সাহিত্যরসিক হিসাবে আমি তাতে পীড়িত হব যদি সাহিত্যের বিশিষ্ট মূল্য সে দাবি করে। এই মূল্য তার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে বলে বুদ্ধদেব বসুর মতো যাঁরা সাহিত্যের একনিষ্ঠ উপাসক, তাঁরা তার কোনো মূল্যই স্বীকার করতে রাজি নন ; সাহিত্য-

* "সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হ'লে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র ও সীতাংশু মৈত্র বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। বর্তমান প্রবন্ধ তাঁদেরই উত্থাপিত তর্কের উত্তর। এই প্রবন্ধেরও বিরূপ আলোচনা করেন নীরেন্দ্রনাথ রায় ও ত্রিদিব চৌধুরী। এই ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রবন্ধগুলির জন্য দ্রষ্টব্য ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত 'বস্তুবাদী সাহিত্য বিচার ও অন্যমত' (কলিকাতা : নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, ১৩৮৩)।

নামধারী তেমন রচনা সাহিত্যের পক্ষে বর্জনীয় বলে তাকে একেবারে আবর্জনা স্তূপে ফেলে দিতে চান। উক্ত প্রবন্ধে তাঁদের কাছে আমার নিবেদন উহ্য ছিল যে সেরকম রচনা তাঁদের বিশুদ্ধ সাহিত্যরস পিপাসা মেটাতে না-পারলেও আজকের দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক আদর্শসিদ্ধির সহায় হিসাবে তার মূল্য অনস্বীকার্য। সে-সব রচনা সাহিত্যরূপেই আমাদের কাছে পরিবেশিত হয়—যদিও উদ্দেশ্য তার রস-সম্ভোগের নির্ভেজাল আনন্দদান নয়। তাই আমি একটি কম্প্রমাইজ গোছের প্রস্তাব করেছিলাম যে 'ফলিত সাহিত্য' নাম দিয়ে (ফলিত বিজ্ঞান এ-ক্ষেত্রে উপমেয়) তাদের জন্য সম্মানের আসন ছেড়ে দেওয়া উচিত, যদি বিশুদ্ধ সাহিত্যের যে শাশ্বত আসনটা আমাদের হৃদয়ে পাতা আছে তা নিয়ে সে কাড়াকাড়ি না-করে। সেইসঙ্গে মার্কস্‌পন্থী সাহিত্য-সমালোচকদের কাছে আমার আবেদন ছিল যে তাঁরা যেন সাহিত্যমাত্রকে রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারালো হাতিয়ারে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর না-হন এবং যে-সাহিত্য তাঁদের কাজে—সে যত বড়ো কাজই হোক্—না-লাগে তাকে বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল প্রভৃতি নাম দিয়ে একেবারে খারিজ না-করে দেন। ফলে কোনো পক্ষই আমার লেখায় সন্তুষ্ট হননি। সেটা অপ্রত্যাশিত নয়।

বিশুদ্ধ সাহিত্যের অনুরাগীরা শেষপর্যন্ত ফলিত সাহিত্যের (উপকরণ) মূল্য স্বীকার করে নেবেন বলেই আমার বিশ্বাস। তবে হয়তো তাঁরা সাহিত্য নামে তাকে অভিহিত করতে রাজি হবেন না—'ফলিত' বিশেষণ দ্বারা গণ্ডিবদ্ধ করা সত্ত্বেও। এতে আমার আপত্তির কারণ নেই, অধিকাংশের সম্মতি আছে এমন-একটি নাম বাছাই করে নিলেই হবে। মার্কস্‌পন্থী সাহিত্যবিচারকদের কাছে আমি দুটি কথা নিবেদন করতে চাই। প্রথমত, আগেই বলেছি যে সামাজিক সত্তাকে সাহিত্যের রসে অভিষিক্ত করতে চরিতার্থ না-হলেও সে-সাহিত্য বা সাহিত্য-প্রতিম সে-রচনা সঠিক রাজনীতির পথে মানুষের মনকে আলোড়িত করতে পারে, বিপ্লবের প্রেরণা যোগাতে পারে, ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-স্পৃহাকে বেগবান করতে পারে। যুদ্ধকালীন অনেক সোভিয়েত গল্পে এবং আমাদের দেশের অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ও মন্বন্তরী সাহিত্যে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। রসের বিচারে এগুলির মূল্য অল্পই, অথচ তাদের গুণগানে সাম্প্রতিক সাহিত্য-সমালোচনা মুখরিত। আমি বলছি না যে, তাদের পক্ষে যাঁরা ওকালতি করেছেন তাঁরা অন্যায় করেছেন। ওকালতি করবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সে-প্রয়োজন সমাজকর্মীর, সাহিত্যানুরাগীর নয়—অন্তত অনেক ক্ষেত্রে নয়। তাছাড়া এই ধরনের সাহিত্যের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে অন্যবিধ সমস্ত সাহিত্যের উপর খড়্গহস্ত হওয়ার দরকার ছিল না। সেটা সমাজসেবীর পক্ষেও দূরদৃষ্টির

পরিচায়ক নয়, কারণ সমাজে সাহিত্যের স্থান কেবল উপকরণ হিসাবে নয়। সামাজিক উন্নতির চরম আদর্শের মধ্যেও সাহিত্যের বিশুদ্ধ আনন্দ-সম্ভোগ অন্যতম বলে স্বীকৃত হবেই। সুতরাং সাহিত্যের আদর্শকে আমরা সামাজিক সংকটের আশু প্রয়োজনের খাতিরেও চিরকালের মতন খাটো করতে পারি না। খাটো যে করা হয়েছে অমরেন্দ্রবাবুও তাঁর প্রতিবাদের শেষ অনুচ্ছেদে সে-কথা স্বীকার করেছেন।

অথবা ব্যাপারটিকে অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে। সব যুগেই সাহিত্য-যশ-প্রার্থীরা 'সস্তায় কিস্তিমাত করতে চান'। কিন্তু সমঝদার পাঠকের কাছে তাঁদের সস্তা চাল ধরা পড়ে, বাজি তাঁরা নিয়ে যেতে পারেন না। আজকের দিনে তাঁরা পারছেন কেন? কারণ সাহিত্যের বিচারে রচনাটি সস্তা হলেও তার অন্য-একটি মূল্য সকলের চোখে ধরা দেয়। সভ্যতার সংকটকালে সে-মূল্যটি স্বভাবতই আর-সব মূল্য ছাপিয়ে ওঠে, রাজনীতির দাবির কাছে সাহিত্যের দাবি হার মানে, অথবা দুয়ের পার্থক্য ঝাপসা হয়ে আসে।

মার্কস্‌পন্থী সাহিত্যবিচারকদের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় মতভেদ হচ্ছে সাহিত্য-সম্বন্ধে তাঁদের অন্য সংজ্ঞাটি নিয়ে। সাহিত্যের কাজ হচ্ছে সামাজিক সত্তাকে আর্টের মাধ্যমে প্রতিফলিত করা—এ-কথা ঠিক। কিন্তু এটুকু বললে সাহিত্যের সংজ্ঞা হয় না। বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে সাহিত্যে এবং শিল্পকলা মাত্রে আমরা পাই বাস্তবসত্তার রূপায়ণিক অভিব্যঞ্জনা। সমাজই একমাত্র বাস্তবসত্তা নয়। ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের রহস্যঘন প্রকৃতি, চেখভ কিংবা হেন্‌রী জেম্‌সের কথাসাহিত্যে ব্যক্তি-চেতনার যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তা অভিব্যক্ত—রসের বিচারে এদের বাস্তবতাও অগ্রাহ্য নয়। হতে পারে যে-আঙ্গিকে তাঁদের রূপায়ণ আমাদের মনোহরণ করেছিল এত-দিন, আজ তা একঘেয়ে হয়ে গেছে, সেই পুরনো আঙ্গিকের পুনরাবৃত্তিতে আমাদের মন আজ সাড়া দিচ্ছে না। কিন্তু সেটা হলো আঙ্গিকগত ডেকেডেন্স। সমাজকে একমাত্র বাস্তবসত্তা বলে প্রকৃতির লীলাকে কিংবা ব্যক্তিচৈতন্যের সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাতকে সাহিত্য থেকে বিতাড়িত করা প্রগতিশীলতার লক্ষণ নয়। শিল্পের প্রগতি সৃজনীপ্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীরাই আনবেন, রাষ্ট্রনেতারা তার পথনির্দেশ করতে গিয়ে শিল্পীর সৃজনীশক্তিকে ব্যাহতই করছেন, উন্মুক্ত নয়।

নিঠুর গরজী

তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে,
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে।

সোভিয়েত রাশিয়ার 'নামগন্ধ পর্যন্ত' আমার প্রবন্ধে না-থাকলেও সোভিয়েত

রাশিয়াই আমার 'যুক্তিমৃগয়ার আসল শিকার'—অমরেন্দ্রবাবুর এই অনুমানটি বড়ো অদ্ভুত ঠেকল। আমার বক্তব্যের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সাহিত্য সম্বন্ধে একটি বিশেষ মতবাদ, সমস্ত প্রবন্ধে কি সে-কথা প্রস্ফুট নয়? সেই মতবাদ যদি কোনো দেশের প্রায় সমস্ত সাহিত্যামোদীর মনে বলবৎ থাকে তবে সে-দেশকে আমি সেই পরিমাণ নিন্দার্হ মনে করব, এটা সত্যি; এবং আমার প্রবন্ধের মধ্যে পরোক্ষে তা ব্যক্ত হয়েছে ভাবা অযৌক্তিক হবে না। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ায় সেই মতবাদ সরাসরি-ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে, এমন কথা বলবার মতো যথেষ্ট তথ্যাদি তো আমার জানা নেই। অমরেন্দ্রবাবু সেরকম নির্ভরযোগ্য সংবাদ পেয়েছেন কি? তাই কি তিনি আমার 'আসল শিকার' সম্বন্ধে পূর্বোক্ত অব্যর্থ অনুমানটি করে বসলেন। আমার তো যতদূর জানা আছে সোভিয়েত রাশিয়ার সাম্প্রতিক সাহিত্যে তা নিয়ে বিতর্ক চলছে, সাহিত্যের চরম ও চিরন্তন মূল্যের পক্ষে ওকালতি করেছেন লিয়েফনিট্‌স, কেমেনেভ প্রভৃতি বিশিষ্ট সমালোচকেরা (*Literature and Marxism* দ্রষ্টব্য)। আমাদের দেশের সাহিত্য-সমালোচনার ধারা কিছুকাল যাবৎ যে-খাদে বইছে সেটা দেখে আমার মনে হয়েছিল যে সাহিত্যকে কেবলমাত্র রাজ-নৈতিক আন্দোলনের উপকরণরূপে গণ্য করবার অভ্যাসটা এখানে মজ্জাগত হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। তাই আমি প্রতিবাদ জানাবার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়িনি।

অমরেন্দ্রবাবু বলেছেন: 'আইয়ুব সাহেব অবশ্য অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন, সোভিয়েত রাশিয়ার কাল্‌চার ও শিল্প অধঃপাতে গেছে।' এ-ধরনের মন্তব্য উক্ত প্রবন্ধে বা অন্য কোথাও আমি কখনো করিনি, এবং অন্তত সজ্ঞান মনে এরূপ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছইনি। আমার অজ্ঞাত মনের নিগূঢ় গ্রন্থিগুলির সন্ধান আমাকে না-চিনেই অমরেন্দ্রবাবু পেলেন কেমন করে? ফ্রয়েডের শিষ্যেরা সামনা-সামনি বসে বিস্তর জিজ্ঞাসাবাদ করে মনোবিকলন করেন, অমরেন্দ্রবাবু কি **Tele-psychiatrist**? আমি যে-কথা আদৌ বিশ্বাস করি না, আমার কাছে তারই প্রমাণ চেয়ে বড়ো লজ্জায় ফেলেছেন। উপরন্তু তিনি 'অত্যন্ত স্পষ্টভাবে' জবাব দিচ্ছেন যে, যে-অভিযোগগুলি আমি কুত্রাপি করিনি আমার 'সে অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক। সোভিয়েত রাশিয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাই হলো কালচারের অভাবনীয় অভিব্যক্তি, প্রগতি ও ব্যাপ্তি।' আরেকজন বিশিষ্ট লেখকও (আঁদ্রে জীদ) অনুরূপ ভাবপ্রকাশ করেছেন, কিন্তু তার সঙ্গে আরো কয়েকটি কথা বলেছেন: **'We admire in the U.S.S.R. the extraordinary elan towards education**

and towards culture ; but the only objects of this education are those which induce the mind to find satisfaction in its present circumstances and exclaim : Oh ! USSR—Avc, Spes Unica ! And culture is entirely directed along a single track. There is nothing disinterested in it ; it is merely cumulative and (inspite of Marxism) almost entirely lacks the critical faculty. Of course, I know that what is called "self-criticism" is highly thought of. When at a distance, I admired this, I still think it might have produced the most wonderful results if only it had been seriously and sincerely applied. But I was soon obliged to realise that apart from denunciations and complaints ("The canteen soup is badly cooked" or "the club reading room badly swept")—criticism merely consists in asking oneself if this, that or the other is in the "right line". The line itself is never discussed. What is discussed is whether such and such a work, gesture or theory conforms to this sacrosanct line. And woe to him who seeks to cross it ! As much criticism as you like—up to a point. Beyond the point criticism is not allowed. There are examples of this kind of thing in history. And nothing is a greater danger to culture than such a frame of mind.'

অমরেন্দ্রবাবু বলেছেন, 'আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ জানে এবং জেনে আতঙ্কিত হয় যে সোভিয়েত রাশিয়ার অ্যাটম বোমার চেয়েও একটি সাংঘাতিক অস্ত্র আছে। সেটা হলো সেখানকার মুক্ত, স্বাধীন, আত্মনির্ভরশীল, শিক্ষিত, আনন্দময় মানুষ।' রবীন্দ্রনাথও 'রাশিয়ার চিঠি'তে সেই কথা লিখেছেন : 'শোনা যায় ইউরোপের কোনো তীর্থস্থানে দৈব কৃপায় এক মুহূর্তে চিরপঙ্গু তার লাঠি ফেলে এসেছে—এখানে তাই হলো ; দেখতে-দেখতে খুঁড়িয়ে চলবার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চলবার রথ বানিয়ে নিচ্ছে—পদাতিকের অধম যারা ছিল তারা বছর-দশকের মধ্যে হয়ে উঠেছে রথী। মানব সমাজে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত-হাতিয়ার স্ববশ।' কিন্তু সেই 'রাশিয়ার চিঠি'র উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ যোগ করলেন : 'সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক

ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ; সেই জেদের মুখে এ-সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি··· ধর্মতন্ত্রের বেলায় যে-জননায়কেরা শাস্ত্রবাক্য মানে না, তারাই দেখি অর্থতন্ত্রের দিকে শাস্ত্র মেনে অচল হয়ে বসে আছে সেই শাস্ত্রের সঙ্গে যেমন করে হোক্ মানুষকে টুঁটি চেপে ঝুঁটি ধরে মেলাতে চায়।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আঁদ্রে জীদ ও অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, তিনজনের কথাই আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনি এবং ধৈর্যের সঙ্গে বিচার করতে চেষ্টা করি। কিন্তু কোনোটিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। বরঞ্চ আমার মন অমরেন্দ্রবাবুর দিকেই ঝোঁকে, কারণ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যত লেখা এ-পর্যন্ত বেরিয়েছে আমার বিবেচনায় সিডনী ও বিয়েট্রিস ওয়েবের *Soviet Communism* বইখানাই তার মধ্যে সবচেয়ে স্থিরবুদ্ধি ও গভীর গবেষণাপূর্ণ। আজকের দুনিয়ায় সে-বই না-পড়া অপরাধ এবং পড়ে—নিন্দুকের সমস্ত অভিযোগ, সন্দেহ, আশাভঙ্গ ও আশঙ্কা সত্ত্বেও—সোভিয়েত দেশের নতুন সভ্যতা সম্বন্ধে অনেকখানি আস্থাবান না-হওয়া অসম্ভব।

অমরেন্দ্রবাবু লিখছেন, 'চরম মূল্যের অর্থ যদি অনড় অচল শাশ্বত মূল্য হয়, সেরূপ কোনো মূল্য নেই বলেই তাকে স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না।' এর উত্তরে আবার সেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়: আমি কোথায় এবং কবে অনড অচল চরম মূল্যের কথা বললাম? অমরেন্দ্রবাবু কেন অনর্থক এক কাল্পনিক শত্রুপক্ষ খাড়া করে তাঁর বহু যত্নে শানানো অস্ত্রগুলির অপচয় ঘটাচ্ছেন? পূর্বোদ্ধৃত তাঁর **qualified** অস্বীকৃতি থেকে অনুমান করা যায় বোধহয় যে, পরিবর্তনীয় গতিধর্মী চরম মূল্যের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন। তা না-হলে তো সোজাসুজি চরম মূল্য তিনি আদৌ মানেন না বললেই চুকে যেত, বিশেষ করে অনড় এবং অচল চরম মূল্যের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করবার কোনো কথাই উঠত না। আমার প্রবন্ধের যা বক্তব্য তার পক্ষে চরম ও উপকরণ মূল্যের পার্থক্য নির্দেশ করাই প্রাসঙ্গিক ছিল, চরম মূল্য অচল কি চলিষ্ণু সে-প্রশ্ন তুলবার দরকার বোধ করিনি। নইলে আমিও তাঁর সঙ্গে একমত, অর্থাৎ চরম মূল্যকে পরিবর্তমান এবং উৎকর্ষশীল বলেই বিশ্বাস করি। উদাহরণত বলতে পারি যে, মধ্যযুগ পর্যন্ত অধিকাংশ মনীষী একমাত্র ধর্ম-সাধনার মধ্যেই সমস্ত চরম মূল্যের প্রকাশ দেখতেন। রেনেসাঁস-এর চিত্ত জাগরণের ফলে ধর্মের সংহতি ভেঙে গেল, বিবিধ পথে চরম মূল্যের সন্ধান মিলল—শিল্প বিজ্ঞান ও চারিত্র তার মধ্যে প্রধান। এই মূল্যত্রয়ের অস্তিত্ব মধ্যযুগেও প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু উপকরণরূপে, ভগবৎ-সাধনার উপায় হিসাবে। রেনেসাঁসের পর এরা

চরম মূল্যের আসনে অধিষ্ঠিত হলো। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আর-একদিক থেকে পরিবর্তন দেখা গেল। তখন পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আধিপত্য ছিল অটুট, সমস্ত সমাজের কথা কেউ বড়ো একটা ভাবত না। কেউ ভাবত না যে, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দর তাকে সমাজের সর্বস্তরে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে অধিগম্য করে তুলতে হবে, নইলে আমাদের সাধনাই ব্যর্থ। আজ আমরা তাই ভাবছি।

আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি না—অমরেন্দ্রবাবু কোন্ যুক্তি বলে এই আজব সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন? মূল্যবোধ বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণের এলাকার বাইরে পড়ে বলা মানেই কি বিজ্ঞানকে স্বক্ষেত্রেও অস্বীকার করা?

'মার্কসিস্ট সাহিত্য=ফলিত সাহিত্য=অসত্য-অশিব-অসুন্দর সাহিত্য, এই **equation**টা কাগজে-কলমে লিখে ফেললেই কি স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে?' হয়ে ওঠে না-বলেই তো আমি এমন-কোনো ইকুয়েশন লিখিনি; অমরেন্দ্রবাবু কার লেখা থেকে সেটা উদ্ধার করলেন? আমার প্রবন্ধে যা বলা হয়েছে কোনো ব্যঙ্গরসিক সেখান থেকে ইকুয়েশনের দ্বিতীয় পর্বটা আহরণ করলেও করতে পারেন, এবং ব্যঙ্গ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করবার অধিকার অমরেন্দ্রবাবুর অবশ্যই আছে। কিন্তু ইকুয়েশনের প্রথম পর্ব (মার্কসিস্ট সাহিত্য=ফলিত সাহিত্য) স্বতঃসিদ্ধ পরতঃসিদ্ধ কিছুই নয়। তবে মার্কসিস্ট সাহিত্যের পটভূমিকায় ফলিত সাহিত্যের আলোচনা করতে চেয়েছিলাম, সুতরাং আমি ঐ দুটি বস্তুর সমীকরণ করতে চেয়েছি এমনতরো ভুল বোঝার সম্ভাবনা ছিল। তাছাড়া আমার লেখা সম্বন্ধে পূর্বোল্লিখিত যে কয়টি উক্তি অমরেন্দ্রবাবু করেছেন এটা সেরকম সম্পূর্ণ অমূলক ও অসহিষ্ণুতা-প্রসূত নয়। তাই আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে আমার মতে মার্কসিস্ট সাহিত্যমাত্রই ফলিত সাহিত্য নয়। আগেই বলেছি যে মার্কসপন্থীরা সাহিত্যের দুরকম সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন। সংজ্ঞাদুটি অংশত সমপাতী (**overlapping**) হলেও এক নয়। যে-সাহিত্য কেবলমাত্র সমাজবিপ্লবের ধারালো অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যেই তৈরি তাকেই আমি 'ফলিত সাহিত্য' নামে অভিহিত করেছি। (বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন বা পানাসক্তি নিবারণের উদ্দেশ্যে যে-সাহিত্য রচিত, তাও ফলিত সাহিত্য, যদিও তা সংগত অর্থে মার্কসিস্ট নয়। পঞ্চাশ বছর আগেকার বাঙলাভাষায় এবং এখনো হিন্দিতে এমন গল্প-উপন্যাস-নাটক বিরল নয়।) সমাজের সজীব সত্তা যে-সাহিত্যে সার্থকরূপে রূপায়িত হয়েছে সে-সাহিত্য মার্কসিস্ট হলেও বিশুদ্ধ সাহিত্য এবং চরম মূল্যের অধিকারী। তাতে যদি সমাজের কোনো আশু প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তবে তাকে একাধারে ফলিত সাহিত্য বলতেও বাধা নেই। এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে

বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, সামাজিক সত্তার রূপায়ণে রসোত্তীর্ণ না-হওয়া সত্ত্বেও কোনো-কোনো সাহিত্য-প্রচেষ্টা সাম্যবাদী আন্দোলনের হাতিয়ার হতে পারে। সেই মার্কসিস্ট সাহিত্যই হবে একান্ত অর্থে (exclusively) 'ফলিত সাহিত্য'। যদি মার্কস্‌পন্থীরা বলেন যে তাঁরা এমন সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বা তার পক্ষপাতী নন, তাহলে আমি শুধু গত কয়েক বছরের প্রগতি, পরিচয়, অরণি, স্বাধীনতা, চতুরঙ্গ প্রভৃতি বামপন্থী ও অর্ধবামপন্থী পত্রিকায় প্রকাশিত বহু গল্প-কবিতা ও সাহিত্য-সমালোচনার কথা আর-একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

অমরেন্দ্রবাবু আমার বক্তব্যটি এক কথায় নাকচ করে দিতে চেয়েছেন এই বলে যে, চরম মূল্য ও উপকরণ মূল্য একই জিনিস। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে যার মূল্য চরম তাকে আমরা উপকরণরূপেও ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু যা কেবল উপকরণ-রূপেই মূল্যবান তাকে আমরা চরম মূল্যের মর্যাদা দিই কেমন করে? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ও-দুটির পার্থক্য এতই সুস্পষ্ট যে বুঝিয়ে বলতে আমার সংকোচ হচ্ছে। বসন্তরোগের মরসুম এলে টিকে নেওয়ার একটি উপকরণ বা instrumental মূল্য আছে রোগের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য—এ-কথা কি অমরেন্দ্রবাবু স্বীকার করেন না? হাতের চামড়া ফুঁড়ে শরীরের মধ্যে গো-বসন্ত গুটিকার পুঁজ ঢুকিয়ে দেওয়া ব্যাপারটা সাহিত্য-সংগীতের মতন চরম মূল্যের আধার—এই কি তাঁর দাবি? তবে কেমন করে তিনি সরাসরি বললেন, 'চরম মূল্য ও উপকরণ মূল্য একই মূল্যের এপিঠ এবং ওপিঠ?'

আমি বলতে চাই যে সাহিত্য যদি শুধু বিপ্লবের ধারালো অস্ত্রই হয় তবে কেবল উপকরণরূপেই তা মূল্যবান। এবং যে-সাহিত্যের চরম মূল্য আছে তা বিপ্লবী দলের হাতে হাতিয়ার হতে পারে, না-ও হতে পারে। না-হলেও তার যে-মূল্যটি চরম তার কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না।

যেসব কথা আমি কস্মিনকালেও বলিনি তারই বিস্তারিত জবাব না-দিয়ে যে মূল সমস্যাটি আমি উত্থাপন করেছিলাম সে-বিষয়ে অমরেন্দ্রবাবু কিছু আলোকপাত করলে উপকৃত হতাম। মার্কস্‌পন্থীরা যখন বর্তমান সমাজকে ভেঙেচুরে এক নতুন সমাজের ভিৎ গড়তে চান, তখন সে-সমাজকে তাঁরা নিশ্চয়ই বর্তমান সমাজের চেয়ে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করেন। সামাজিক উৎকর্ষের প্রতিমান সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা কী? নিশ্চয়ই সেটা কেবল অর্থনৈতিক নয়। সাহিত্যের স্বাশ্রয়ী মূল্য কি তাতে স্বীকৃত হয়েছে? সামারভিল লিখছেন: 'Individualised means of production stands in the way of the utilisation of that abundance of goods

the availability of which to the individual is the precondition of normal participation in the "higher" cultural, scientific and aesthetic life.' (*Soviet Philosophy.*) এখানে আর্থিক প্রাচুর্যকে উপকরণ এবং বিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্যচর্চাকে চরম মূল্য দান করা হয়েছে। এ-কথা যদি সাম্যবাদীরা স্বীকার করেন, তবে তাঁদের মানতে বাধা কেন যে কোনো সার্থক শিল্পরচনা শ্রেণীসংগ্রামে সাম্যবাদী দলের কাজে লাগল কি না? রাজনৈতিক বিচারে তার প্রাধান্য থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের বিচারে সেটা গৌণ।

চম্পাকলি ও পূষন্

এই প্রথা-অসম্মত পাঠ লেখার পেছনে একটি ছোটোখাটো ইতিহাস আছে। দিন-কতক আগে আমি চায়ের টেবিলে বললাম, তোমাদের বিয়ের আসরে যদি কেউ আমার হয়ে এ-গানটা করত তা হলে বেশ ভালো হতো—'তোমায়, সাজাব যতনে কুসুমে বচনে' (রতনের বদলে আমি বচন শব্দটি প্রয়োগ করেছি কারণ আমি নিষ্কপর্দক মানুষ, রতন কোথায় পাব, তবে বচন তৈরি করার শক্তি এখনো লোপ পায়নি)। আরতি টিপ্পনী কাটল, 'আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকে বচন দিয়ে সাজাবার যোগ্যতা যে আপনার অসাধারণ সে-কথা মানতে হবে।' গানের পরবর্তী দুটি পঙ্‌ক্তি বিষয়ে ('সখীরে সাজাব সখার প্রেমে / অলক্ষ্য প্রেমের অমূল্য হেমে') গৌরী মন্তব্য করল যে 'আপনার পুত্রকে সখা বানিয়ে ফেলাটা কি একটু বেখাপ শোনাচ্ছে না?' আমি উত্তর দিলাম, 'মোটেই না, আমি শাস্ত্রসম্মত কথাই বলেছি', 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' বচনটি সম্পূর্ণ করে দিল চম্পাকলি, 'পুত্রম্ মিত্রম্ ইব আচরেৎ'। আচরণের মধ্যে নিশ্চয়ই ভাষণ ও পাঠলিখন অন্তর্ভুক্ত।

... ...

'কোরান শরীফে'র মধ্যে "সুরা-এ ফাতেহা" সবচেয়ে সুপরিচিত অঙ্গ, স্বল্প-শিক্ষিত মুসলিম পরিবারেও এটি প্রত্যেক বালক-বালিকাকে মুখস্থ করানো হয়, এটি কণ্ঠস্থ না-থাকলে নমাজ অদা করা যায় না। 'কোরান শরীফে'র মধ্যেই একে বলা হয়েছে উম্মুল কুরান (কোরানের জননী), অন্যত্র একে বলা হয়েছে কোরানের সারাৎসার। তারই প্রথম অংশ পড়ে শোনাচ্ছি :

আল্ হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আল্ আমিন।

আর রহমানির রহিম, মালিক-এ ইওমুদ্দিন, ইয়াকা নাওবুদু ও ইয়াকা নাসতায়িন, ইহ দিনাস সিরাতাল মুস্তাকিন।

অর্থাৎ,

বন্দনা প্রকৃত অর্থে আল্লারই প্রাপ্য, যিনি করুণাময়, যাঁর স্বভাবই করুণা। যিনি শেষ-বিচারের দিনে পরম দণ্ড ও পুরস্কার বিধাতা। আমরা তোমারই

উপাসনা করি এবং প্রার্থনা করি তোমারই সাহায্য। তুমি সৎপথে আমাদের চালিত করো।

প্রথমত, এটি সমিল গদ্যে লেখা, সমস্তটা কোরানই সমিল গদ্যে লেখা। সাহিত্য-বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনেছি মিত্রাক্ষর ছন্দের এইখানেই উৎপত্তি। দ্বিতীয়ত, চরম বিচারের দিনের কথা এখানে বলা হয়েছে। সেটাই সমস্ত শাস্ত্রভিত্তিক এবং সাম্প্রদায়িক ধর্মের বৈশিষ্ট্য। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান খ্রিস্টানের মধ্যে বিভেদ প্রচুর—কেউ ঈশ্বরবাদী, কেউ অনীশ্বরবাদী, কোথাও-বা যুক্তির স্থান অনেকখানি, কোথাও-বা বলা হয়েছে মানুষের যুক্তি অতিশয় সীমাবদ্ধ। ('কোরান শরীফে' বলা হয়েছে, 'আমি তোমাকে বুদ্ধি দিইনি, কিন্তু অত্যল্প মাত্রায় দিয়েছি।') কিন্তু সবাই হয় জন্মান্তরবাদ, নয় পরকালে নব জন্মলাভে বিশ্বাস স্থাপন করেন। আমাদের আজকের মনের কাছে এই সেকেলে বিশ্বাস অলীক বলে ঠেকে। তার মানে এই নয় যে আজকে আমাদের মনের গভীরতম স্তরে জড়বাদ বা দেহাত্মবাদ ছাড়া আর কিছুর স্থান নেই।

'গীতাঞ্জলি'র ভগবান স্পষ্টতই অর্ধেক সত্য এবং অর্ধেক কল্পনা। শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ কল্পনার ভাগটা বর্জন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। যে-সত্য অবশিষ্ট থাকে তাকে তিনি বড়ো কঠিন বলেছেন। 'সত্য যে কঠিন / কঠিনেরে ভালোবাসিলাম / সে কখনো করে না বঞ্চনা।' যার কাছ থেকে আমরা কিছুই প্রত্যাশা করি না সে বঞ্চনা করবে কেমন করে? শাস্ত্রভিত্তিক ধর্মমতে ভগবানের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। 'গীতাঞ্জলি'র পরানসখা বন্ধু ভগবানের কাছ থেকেও আমাদের প্রত্যাশা কম নয়। ন্যূনপক্ষে আমরা প্রত্যাশা করব দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। বৃহত্তর মানবসমাজের দিকে চাইলে আমরা অনেক ক্ষেত্রে উল্টোটাই ঘটতে দেখি; এবং সে-জাতীয় ঘটনা ব্যতিক্রম নয়। তা সংখ্যায় এত বিপুল যে কোন্‌টা নিয়ম কোন্‌টা ব্যতিক্রম—এমনতরো ভেদরক্ষা করা যায় না। তাহলে সব কল্পনাবর্জিত এবং পরজন্মে কিংবা পরকালে বিশ্বাস বর্জন করেও কঠিন সত্যকে আমরা ভালোবাসব কেমন করে?

রবীন্দ্রনাথ তার উত্তর দিয়েছেন তাঁর একটি প্রিয় বেদবাক্য উদ্ধৃত করে—দেবস্য পশ্য কাব্যম্। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে দুঃখ দৈন্য দুর্দশা, তা সে সামাজিক দুর্ব্যবস্থা-ঘটিতই হোক কিংবা প্রাকৃতিক কারণ ঘটিতই হোক, সমগ্র বিশ্বজাগতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে তার একটি কাব্যরূপ ধরা পড়ে। মনে রাখা ভালো যে আমাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যরচনায় ট্র্যাজিডির স্থান বড়ো কম নয়। কখনো বিশ্বকে তিনি দেখেছেন সংগীতরূপে: 'যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে মিলাব তাই জীবন-গানে।'

যে কঠিন সত্য বা কঠিন ভগবানের কাছ থেকে আমরা কিছুই প্রত্যাশা করতে পারি না, সেখানে বঞ্চনার কথা ওঠে না। একেবারে কিছুই কি প্রত্যাশা করি না আমরা? একটি বড়োরকমের প্রত্যাশা অবশ্যই করি। সে-প্রত্যাশাটি হচ্ছে যে যেখানে সবকিছুই চলমান, ঘূর্ণ্যমান, চংক্রমনশীল সেইখানে একটি জিনিস অচল, অপরিবর্তনীয়—সেটি হচ্ছে প্রকৃতির মৌল নিয়মগুলি। এটিকে বলা হয়ে থাকে **belief in the uniformity of nature**—সমূহ আধুনিক বিজ্ঞান এই ***faith***-এর উপরে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকের ধারণা নিউটন যে-মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, আইনস্টাইন সেটাকে বাতিল করে নতুন এক মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেন। ব্যাপারটা অত সহজ নয়, তবু বলা যায় যে নিউটনের গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা বিষয়ে যে-সমস্ত তথ্য জানা ছিল তাঁর গতিতত্ত্বের তিনটি বিধি এবং মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের দ্বারা তারই একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নিউটন দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরে আরো অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রত্যক্ষগোচর হলো, আইনস্টাইন সেইসমস্ত তথ্যের এক নতুন—বৈপ্লবিকভাবে নতুন—ব্যাখ্যা রচনা করলেন। কিন্তু এমন বলা যায় না যে নিউটনের প্রদত্ত মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব নিউটনের সময়ে সত্য ছিল এবং আইনস্টাইনের সময়ে অন্য-এক মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব সত্য হয়ে উঠল। আসলে জড়-জগতের মৌল নিয়মে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আমাদের ধারণাটাই নতুনতর এবং পূর্ণতর হয়ে উঠল—**with retroactive effect**! নিউটনের সময়েও আইনস্টাইন প্রদত্ত নীতি বলবৎ ছিল, কিন্তু আমাদের ধারণা অপূর্ণ ছিল। প্রতিতুলনায় এক ভিন্ন ক্ষেত্রে অনুরূপ পরিস্থিতি ধরা যাক। ধরুন, আমি বললাম,—'দেবদত্তকে আমি অসৎ লোক বলে জানতাম কিন্তু সম্প্রতি বুঝতে পারলাম যে সত্যি সে সৎ লোক।' এর দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথমত, দেবদত্ত অসৎ ছিল কিন্তু ইদানীং কোনো কারণে তার চিত্তশুদ্ধি হয়েছে এবং সে প্রকৃতই সৎ লোক হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় অর্থ, দেবদত্ত বরাবরই সৎ ছিল, আমি এতদিন ভুল বুঝে তাকে অসৎ বলে ভেবেছি। আমার সে-ভুল ভেঙে গেছে এবং আমি বুঝতে পেরেছি সে বরাবরই সৎ লোক।

জড়-জগতের মধ্যে এই দ্ব্যর্থ সূচনার অবকাশ নেই। অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞানে জ্ঞানের প্রসার সর্বত্রই **retrospective**। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের জগৎ যে-নিয়মের দ্বারা চালিত হয়েছে অদ্যাবধি, কাল থেকে যদি তার পরিবর্তন আরম্ভ হয় তাহলে আমাদের দশাটা কী হবে? এতদিন যে-নিয়ম ও নিয়মাবলী বলবৎ ছিল তা চির-কাল বলবৎ থাকবে এমন বিশ্বাসের কোনো যুক্তিসংগত ভিত্তি নেই। **Uniformity of nature**-এ বিশ্বাস অনেকটা ধর্মবিশ্বাসের মতন। অথচ এই **faith**-এর উপরই

আমাদের সমস্ত বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে। উদাহরণত মাধ্যাকর্ষণের **inverse square law** যে কাল থেকে **inverse cube law** হয়ে যাবে না তার কোনো **guarantee** নেই কোথাও।

আজকের দিনে মহাবিজ্ঞানীরা ঘূর্ণ্যমান **gaseous nebula** থেকে তারকাখচিত **galactic system**-এর গ্রহ পরিবেষ্টিত তারকা পর্যন্ত অনুমান করতে পারেন। কিন্তু কোথাও-কোথাও কোনো-কোনো গ্রহে জীবের উৎপত্তি অনুমান করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব বলে আমি মনে করি না। জড় থেকে জীবের উৎপত্তি যদি-বা কোনোদিন **predict** করা যায়, মনের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা একেবারেই অসম্ভব।

বেকন বলেছিলেন, **knowledge is power**—সেদিক থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল্য আছে অবশ্যই কিন্তু জ্ঞান একটি স্বাশ্রয়ী মূল্য। স্বাশ্রয়ী না বলে, আমার বলা উচিত বিজ্ঞান হচ্ছে নিয়মবদ্ধ ও বহুলাংশে রহস্যাবৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছায়াপাত, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উপর। যেমন আমাদের হৃদয়বৃত্তির উপর তার ছায়া পড়লে সৃষ্ট হয় কাব্য এবং যাবতীয় শিল্পকলা।

প্রেমকেও আমি চরমমূল্যের স্থান দিতে চাই। **Sex** বা যৌনকামনার মূল্য উপকরণিক। তাতে করে বংশবৃদ্ধি ও জাতিরক্ষা হয়। প্রেম **sex** ছাড়া না-হলেও **sex**-কে ছাড়িয়ে যায় অনেক দূরে। **Sex** প্রকৃতির সৃষ্টি, কিন্তু **sex**-এর ভিত্তির উপরে প্রেমের সুন্দর উজ্জ্বল বহুকক্ষ বিশিষ্ট বহুতলবর্তী বর্ণাঢ্য ইমারৎ রচনা করেছে সভ্য ও সংস্কৃতিবান মানুষ, বিশেষত কবিরা, চিত্রকরেরা, মূর্তিকারেরা।

প্রেমকে আমি মানবজীবনের অন্যতম চরমমূল্য বলেছি। প্রেম চিরজীবন বেঁচে থাকে না; তবু যতদিন এই অমূল্য রত্নকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, উজ্জ্বল রাখা যায় ততই আমাদের মঙ্গল ও আনন্দ। নারী-পুরুষের প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতি বিবাহে। কিন্তু অবিবাহিত জীবনের অনিবার্য দূরত্বের আশ্রয় পেয়ে যে-প্রেম সহজেই উদ্দীপ্ত থাকে, তাকে বিবাহিত জীবনের অষ্টপ্রাহরিক নৈকট্যে রক্ষা করা একটু শক্ত। প্রেমের অবক্ষয় অনিবার্য, কিন্তু সবদিক থেকে যত্নবান ও সচেষ্ট হলে প্রেমের পরমায়ু বেশ খানিকটা বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব। দেহ ও মনের যৌগিক সত্তা মানুষ, তেমনি মানুষের প্রেমে দেহের টান এবং মানসিক আকর্ষণের যুগ্মতা থাকে এবং থাকাই সংগত।

তোমরা দুজনেই সুরূপ, **objectivly** সুরূপ, অর্থাৎ আর দশজনের অভিজ্ঞতায় এর সমর্থন পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের মধ্যে রূপের ভাগটাকে বড়ো বেশি তাচ্ছিল্য করেছেন, সবচেয়ে জোরালো ভাষায় করেছেন 'শাপমোচন' গীতিনাট্যে।

যেন রূপের অভাবটাকে সম্পূর্ণতই গুণগ্রহণের দ্বারা ঢেকে ফেলা যায়। যায় না কিন্তু। তবে রূপমুগ্ধতার অত্যাধিক্য থাকে যদি, সেটাও প্রেমের স্থায়িত্বের পক্ষে হানিকর—রূপের প্রতি টান বেশি থাকলে একই রূপে তৃপ্তি বোধ করে না। ইংরিজিতে একটা কথা আছে, **jaded palate**! যে-প্রেমে রূপের মাত্রা শূন্যের দিকে তলিয়ে যায় সে-প্রেমও খণ্ডিত।

এর আর-একটা দিক আছে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসার ছবিখানি প্রথম দর্শনে বেশ রিয়ালিস্টিক মনে হয়। দৃষ্টিতে আরো মনোযোগ সঞ্চারিত করলে প্রতিভাত হয় যে সামান্য একটু রিয়ালিজম থেকে এদিক-ওদিক সরে গিয়ে (যথা ভুরু যুগল বর্জন করে) যে-নারীচিত্র তিনি এঁকেছেন তাতে আভাসিত হয়েছে এক অনন্ত রহস্যলোক। এমন নারীর সঙ্গে ঠিক প্রেমে পড়া চলে না। প্রেমের চেয়ে আরো ব্যাপক, আরো সূক্ষ্ম, আরো গভীর কোনো অনুভূতি মনে জাগে। তার সঙ্গে বরঞ্চ তুলনা করা যায় সেই অনুভূতিকে যাতে আমাদের মন ভরে ওঠে, প্রথম সূর্যের রশ্মিপাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে। যদি ক্বচিৎ-কখনো আমাদের রক্তমাংসের প্রিয়ার দিকে তাকিয়ে মোনালিসার সঙ্গে অল্পাধিক-সাদৃশ্য-বোধ মুহূর্তের জন্য জেগে ওঠে, সেটা প্রেমকে গভীরতর ও প্রশস্ততর করে তুলবে।

আর-একটি কথা। একপক্ষের মনে প্রবল অনুরাগ জাগতে পারে অন্যপক্ষের মনে সাড়া না-জাগিয়েই। কিন্তু অপ্রতিরক্ত (**unreciprocated**) প্রেম বেশিদিন টেঁকে না, আপনিই শুকিয়ে ঝরে যায়; যদি না-যায় তবে সেটা একদিকে বড়োই যন্ত্রণাদায়ক এবং অন্যদিকে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। যতদূর জানি এবং অনুভব করি, তোমাদের প্রেমে রাগ-প্রতিরাগের লীলা বড়ো মধুর। একেবারে সমানে-সমানে কিনা কে বলতে পারে এবং কোন্ নিক্তিতেই বা ওজন করে?

তোমাদের প্রেমের স্থায়িত্বের পক্ষে আরো-একটি অনুকূল উপাদান হচ্ছে এই যে দুজনের আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুব কাছাকাছি হলেও একেবারে এক নয়। এক হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব মনের গভীর তল থেকে অঙ্কুরিত হয়ে উপরিতল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতো। হতো-ই যে এমন কথা আমি বলছি না, তবে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। অপরপক্ষে কাছাকাছি হওয়ার সুবিধা এই যে একজনের কাজের মূল্যায়ন ও রসগ্রহণ অপরজনের পক্ষে সহজ। দুজনেই বিশুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা করছ কিন্তু একজনের কাজ জীববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত না-হলেও নিকটবর্তী; অন্যজনের কাজ জড়প্রকৃতির সীমানা ছাড়িয়ে নয়।

অবশ্য তোমাদের গবেষণা-ক্ষেত্রও যদি স্বীয় গতিবেগে চালিত হয়ে খুব

কাছাকাছি পৌঁছয় অথচ একেবারে মিলে না-যায় যাতে পরস্পরের প্রতিযোগিতার ভাব সৃষ্টি না করে সহযোগিতার অবকাশ তৈরি করে দেয় তাহলে সে অন্য কথা এবং অনেক ভালো কথা। যে-প্রেম দৈহিক মিলন থেকে আধ্যাত্মিক সাধনার মিলন পর্যন্ত বিস্তৃত সেই প্রেমই তো প্রেমের পরাকাষ্ঠা, পরমাগতি। এখানে বলে রাখা ভালো যে আমি আধ্যাত্মিক সাধনা বলতে বুঝি সাহিত্য-সংগীত-দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-জনসেবা ইত্যাদির সাধনা, পর্বতগুহায় নিশ্চল বসে তপস্যা নয়। যারা আধ্যাত্মিক সাধনার শক্তি অর্জন করেনি কিংবা জন্মসূত্রে পায়নি তাদের জীবনেও প্রেমের মূল্য আছে বৈকি, কিন্তু সে-মূল্যের স্বরূপ বা চিত্র আমার মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না ; সেটা আমারই অক্ষমতা। তাদের প্রেমের অমর্যাদা নয়।

তোমাদের প্রেমের স্থায়িত্বের পক্ষে একটি প্রতিকূল factor বা উপাদানের উল্লেখ করতে চাই সর্বশেষে। তোমাদের একজনকে বিয়ের আসরে বসবার জন্য অনেকখানি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। সেটা আমাদের সকলের পক্ষে দুঃখের কারণ। এবং আমরা সকলেই আশা করছি যেন এই ত্যাগের মেয়াদ দীর্ঘ না-হয়। সে যাই হোক অন্যপক্ষ যেন এই ত্যাগের মূল্য এবং মহিমা হৃদয়ঙ্গম করে, করে যেন কায়মনোবাক্যে।

কায়মনোবাক্যে শব্দবন্ধটি প্রয়োগ করেছি বিশেষত এই কারণে যে, আমার অভিজ্ঞতায় এবং দু-চারজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে শোনা তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর আমার মনে এই মতটি দানা বেঁধে উঠেছে যে স্নেহ-ভালোবাসা-প্রেমের মতন সূক্ষ্ম সুকুমার অনুভূতিগুলিকে বুকের মধ্যে ব্রীড়াবগুণ্ঠিত করে রাখার চেয়ে বচনে স্পর্শনে অথবা যে-কোনো প্রকাশের মাধ্যমে ব্যক্ত করাই ভালো। নইলে অন্যপক্ষে মনের মধ্যে এক পীড়াদায়ক সন্দেহ জাগরূক থাকতে পারে যে আমি যা উজাড় করে দিলাম তার বদলে কী শুধুই নিরুত্তাপ আত্মসমর্পণই পেলাম ? উচ্ছ্বাস এবং উত্তাপ যেখানে সংগত সেখানে লজ্জা যেন আবরণ রচনা না করে। আমি সমস্ত হৃদয় মনপ্রাণ দিয়ে যা দিলাম তার পরিবর্তে কি সমমাত্রায় উচ্ছ্বাস ও উত্তাপ জাগাতে পারলাম—এই সন্দেহ প্রেমনীতিশাস্ত্রে অপরাধ বলে গণ্য হবে। আবেগ-প্রকাশের বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন—উর্দু প্রেমের কবিতায় যা প্রায়ই দেখা যায়—সমর্থন করছি না আমি। আমার বক্তব্য নঞর্থক। লজ্জা-সংকোচ বা দ্বিধা যেন প্রকাশকে দাবিয়ে না-রাখে ; তাতে করে আনন্দানুভূতিকে অনেকটা দমিয়ে দেওয়া হবে। 'গভীর হবে নিবিড় রাতি / জ্বালিয়ে দেব প্রেমের বাতি।' রবীন্দ্রনাথের মনে নিশ্চয়ই দুটি প্রদীপের চিত্রকল্প ছিল।

মাতৃস্নেহ থেকে আমি বঞ্চিত হইনি, কিন্তু তার প্রকাশ থেকে নিদারুণভাবে হয়েছিলাম। তার সম্ভবত একটিমাত্র ব্যতিক্রম আমার মনে এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে। ক্লাস সেভেনের শেষের দিকে পুজোর ছুটির পরে দিদি ও দুল্হাভাইয়ের সঙ্গে সিলেট যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। ছমাস পরে আবার ফিরে আসতে বাধ্য হলাম ম্যালেরিয়ায় ভুগে। রাত দশটার পর যখন বাড়ি পৌঁছলাম তখন দেখি মা তাঁর দোতলার ঘর থেকে নীচে নেমে এসে প্রায় অন্ধকার প্যাসেজের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে তিনি আমাকে বুকের কাছে তুলে ধরে চুমু খেলেন কপালে। এইটাই তাঁর স্নেহনীতি থেকে একটিমাত্র বিচ্যুতি। স্নেহনীতি বলছি এইজন্য যে একদিন আমি খাটে শুয়ে একটা উর্দু মাসিক পত্রিকা হাতে নিয়ে পাতা উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম। অদূরে একটি তক্তপোশের উপর বসে হাত-পাখা নাড়তে-নাড়তে মা মেজোকাকিমাকে বলছিলেন, মায়ের মনে নিজের সন্তানের প্রতি স্নেহ তো থাকবেই, কিন্তু তার প্রকাশ খুবই সংযত করা উচিত। নইলে ছেলেমেয়েরা নষ্ট হয়ে যায়। বাইরে সবসময় কড়া শাসন থাকা দরকার। এই স্নেহনীতির ফলে চিরকালের মতন আমার অনুভূতির কাঠামো দুর্বল হয়ে রইল। আমি আজও স্নেহের কাঙাল, যদিও বুঝি যে এই বয়সে আমার কারুর কাছ থেকে স্নেহ বা ঐজাতীয় কোমল কোনো প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করা হাস্যকর।

একটু আগে আমি বলেছি, মৌল প্রাকৃতিক নিয়মগুলি যদি কাল থেকে বদলাতে শুরু করে তাহলে আমাদের দশাটা কী হবে! হয় আমাদের মধ্য থেকে super superman-এর উদ্ভব হবে, নয় আমরা বনের হনুমানের স্তরে নেমে যাব। বর্তমান বিজ্ঞান ও সভ্যতা উচ্ছন্নে যাবে। নাকি আমরা প্রকৃতিদেবীর পায়ে মাথা কুটে বলব, মা আমার, সোনামানিক আমার, লক্ষ্মীটি, তুমি আবার ভ্রষ্টা হোয়ো না। এতদিন যে-আচারনিষ্ঠা দেখিয়েছ, যে-নিয়মগুলি পালন করে এসেছ, তা আরো কিছুকাল—বেশিকাল নয়, মাত্র দু-তিন কোটি বছর পালন করে চলো। তারপরের কথা ভাববার দরকার নেই, তখন তো সবকিছুই একাকার হয়ে যাবে।

আবু সয়ীদ আইয়ুব ও ট্র্যাজিক চেতনা

বিকাশ চক্রবর্তী

তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'পথের শেষ কোথায়'-এর মুখবন্ধে আইয়ুব লিখেছেন, '…কয়েকজন সুধী পাঠক-পাঠিকাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও নাটক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে, এবং রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে জগৎ ও জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করতে আমি সহায়তা করেছি। হয়তো আমার চোখ দিয়েও।' অত্যন্ত সংগত এই উক্তি, বরং একটু বেশি বিনীত এবং নির্বিশেষ। আসলে অনেক কারণে আইয়ুব রবীন্দ্র-সমালোচনার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু যে-কারণটির কথা আমি ভাবছি সেটি এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতার নৈশতা, যন্ত্রণা, সংশয় ও অমঙ্গলবোধের কথা প্রথম বললেন তিনি। এ-কাজটি বুদ্ধদেব বসুও করেছেন অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে, অবশ্য 'গীতাঞ্জলি' পর্ব পর্যন্ত। অথবা, রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যের ঐশ্বর্যের দিকে তিনিই প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তাও নয়। এই পথেও তাঁর একজন পূর্বসূরীর নাম আইয়ুব নিজেই স্মরণ করেছেন। কিন্তু যে-কাজটি আইয়ুবের আগে কোনো রবীন্দ্র-সমালোচক করেননি বললেই চলে, সেটি এই যে, তিনিই প্রথম রবীন্দ্র-সমালোচনায় একটি পূর্ণাবয়ব সাহিত্যতত্ত্ব (theory of literature) ও একটি সুচিন্তিত **methodology** উপহার দিলেন। মোহিতলাল মজুমদার আক্ষেপ করেছিলেন, 'এই দীর্ঘকালেও রবীন্দ্র-কাব্যের একটি সুসংগত আলোচনা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইল না; এ-পর্যন্ত যাহা-কিছু হইয়াছে তাহাতে কোনো সাহিত্যিক আদর্শের সন্ধান নাই, তাহা ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস—সমালোচনা নয়, সুখালোচনা মাত্র।' এই লক্ষণীয় অভাব আইয়ুব পূরণ করেছেন, সন্দেহ নেই। মোহিতলাল যাকে 'সাহিত্যিক আদর্শ' বলেছেন, তারই অপর নাম সাহিত্যতত্ত্ব। আইয়ুবের সাহিত্যতত্ত্ব কতখানি রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে প্রাপ্ত অথবা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে আইয়ুবের অভিমত কতখানি তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব প্রয়োগের প্রত্যক্ষ ফল —সমস্যাটি জটিল ও তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু এ-প্রশ্ন না-তুলেও বলা যায় যে, আইয়ুবের রবীন্দ্রচিন্তা শুধু, সাহিত্যতত্ত্ব হিসেবেই, পূর্ণ মনোযোগ ও আলোচনার যোগ্য।

অবশ্য আইয়ুবের সাহিত্যতত্ত্বের কোনো পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই নিবন্ধের মূল প্রসঙ্গ নয়। আমার প্রধান আগ্রহ 'ট্র্যাজিক' সম্পর্কে আইয়ুবের বক্তব্যে। কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত, আইয়ুবের সাহিত্যতত্ত্বে 'ট্র্যাজিক' একটি মৌল প্রত্যয়। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কবিতার আলোচনায় এবং সাধারণভাবে, আধুনিক সাহিত্যের একটি বিরাট অংশের আলোচনায় বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আইয়ুব নিজে 'ট্র্যাজিক চেতনা' কথাটি বহুবার ব্যবহার করেছেন, বিশেষত 'পান্থজনের সখা'য়। কথাটি ইঙ্গিতপূর্ণ। 'চেতনা' শব্দের দ্বারা আইয়ুব কি এই বোঝাতে চাইছেন যে, 'ট্র্যাজিক' ব্যাপারটি কোনো বিন্যস্ত জীবনদর্শন নয়, আসলে কোনো যুক্তিনির্ভর দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে একে ফেলা যাবে না ? এই অর্থে 'ট্র্যাজিক' প্রাক্‌তাত্ত্বিক (pre-theoretical) অথবা উত্তরতাত্ত্বিক (post-theoretical) এবং এই অভিজ্ঞতাকে জীবনদর্শন না-বলে জীবনবোধ (sense of life) বা জীবনচেতনা বলাই বেশি সংগত। কিন্তু 'ট্র্যাজিক' বলতে আমরা কী বুঝি ? শব্দটি কি ট্র্যাজেডির বিশেষণ, নাকি ট্যাজেডি থেকে স্বতন্ত্র কোনো ধারণা ? আধুনিক ইংরেজি সমালোচনায় শব্দটি আপন স্বাতন্ত্র্যে গৃহীত হয়েছে ; কিন্তু এর কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা তৈরি হয়েছে বলে জানি না। অতএব শব্দটির সঠিক ব্যঞ্জনা একটু অনিশ্চিত। অথচ ট্র্যাজেডি কথাটার চারধারে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। যে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ট্র্যাজেডির প্রথম সংজ্ঞা রচনা করেছিলেন তিনি আজও ট্র্যাজেডির যে কোনো আলোচনায় প্রধান পথপ্রদর্শক। লক্ষণীয়, আইয়ুবের রচনায় 'ট্র্যাজেডি' শব্দটি বিরল এবং অ্যারিস্টটল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ট্র্যাজিক চেতনার উদাহরণ হিসেবে যে অল্প কয়েকটি শিল্পকর্মের উল্লেখ বা আলোচনা তিনি করেন, তাদের মধ্যে গ্রীক ট্র্যাজেডির স্থান নেই। শেক্সপীয়র ইতস্ততভাবে উদ্ধৃত। যে বিদেশি কবি আইয়ুবের আলোচনায় সবচেয়ে বেশি জায়গা পেয়েছেন তিনি ইয়েট্‌স। এবং রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর প্রথম ও শেষ অবলম্বন। মনে হয় আইয়ুব বলতে চাইছেন যে 'ট্র্যাজেডি' তাঁর আলোচ্য নয়, তাঁর আলোচনার বিষয় 'ট্র্যাজিক চেতনা'।

অনুরূপ একটি পার্থক্যের কথা বলেছেন জনৈক আধুনিক সমালোচক : **'The most obvious difference I would mark between the two is also a crucial one : "tragedy" refers to an object's literary form, the "tragic vision" to a subject's psychology, his view and version of reality. ...Perhaps it was not for the Greek theoretical consciousness—even in as late a repersentative as Aristotle—to be self-**

consciously aware of the disturbing implications of the tragic mentality as it was of the formal requirements which transcended, or rather absorbed, this mentality and restored order...to the universe threatened by it.'

পার্থক্যটি আমাদের আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক। অ্যারিস্টটল 'ট্র্যাজেডি' বলতে প্রধানত সাহিত্যের একটি বিশেষ শিল্পরূপ (ফর্ম)-এর কথা বুঝতেন। আদি, মধ্য ও অন্তের একটি নিয়মিত বিন্যাসের মধ্যে এই শিল্পরূপের স্থিতি ও বিস্তৃতি। নায়কের ট্র্যাজিক চেতনাও এই নান্দনিক বিন্যাসের মধ্যে সংযুক্ত, শৃঙ্খলিত এবং শেষ পর্যন্ত শান্ত। এইভাবেই প্রাচীনেরা কাহিনীর মর্মান্তিক পরিণতি সত্ত্বেও জগৎ ও জীবনের সুস্থতা রক্ষা করেছিলেন। বিশ্ববিধানের প্রতি তাঁদের গভীর আস্থা ট্র্যাজেডির নান্দনিক বিন্যাসের দ্বারা সমর্থিত ও সুরক্ষিত। শেক্সপীয়র সম্বন্ধেও মোটামুটি এই কথা বলা চলে। কিন্তু বিশ্ববিধানের এই সুশৃঙ্খল কাঠামোটি পরবর্তীকালে ধীরে-ধীরে ভেঙে পড়ল। কেন ভেঙে পড়ল, সে-আলোচনা আমাদের প্রসঙ্গের বাইরে। আমরা যা লক্ষ করি তা এই যে আধুনিক সাহিত্যে অ্যারিস্টটলের অর্থে ট্র্যাজেডি ও তার নান্দনিক বিন্যাস আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে আধুনিকদের সাহিত্য-কর্মে (সকলের নিশ্চয়ই নয়) বিশ্ববিধানের প্রতি একটা গভীর সংশয় অথবা অবিশ্বাস ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাপী মঙ্গলবিধানের আশ্রয় হারিয়ে ডস্টয়েভস্কি ও কাফ্‌কার রচনায় ট্র্যাজিক চেতনা করাল মূর্তিতে প্রকাশিত। এই দুই ঔপন্যাসিকের সঙ্গে মেলভিল, কনরাড ও কামুর নাম অনায়াসে যুক্ত হতে পারে। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য ডস্টয়েভস্কি ও কাফ্‌কাকে—বিশেষত কাফ্‌কাকে—আধুনিক ট্র্যাজিক চেতনার প্রধান প্রতিভা বলে ধরে নিচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কবিতায় এই ট্র্যাজিক চেতনার প্রকাশ খুঁজেছেন আইয়ুব। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে এই চেতনার স্বরূপ কী তা বোঝার আগে আরো দু-একটি বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া দরকার। 'ট্র্যাজিক' শব্দটিকে যদি একটি সাহিত্যিক পরিভাষা (term) বলে ধরে নিই, তবে সাহিত্যকর্মের প্রসঙ্গেই শব্দটির অর্থ আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু আইয়ুবের ব্যবহারে শব্দটি একাধিক ব্যঞ্জনা পায়, 'রূপনারানের কূলে জেগে উঠিলাম' যে-অর্থে ট্র্যাজিক, নিঃসহায় বিধবার একমাত্র তরুণ পুত্রের মৃত্যুযন্ত্রণা কি সেই অর্থে ট্র্যাজিক? 'ট্র্যাজিক' বলতে পারি, যদি উক্ত ঘটনাটি কোনো শিল্পীর মননে জারিত হয়ে শিল্পিত হয়ে ওঠে। তা না-হলে ঘটনাটি শোকাবহ এবং মর্মন্তুদ, সন্দেহ নেই; কিন্তু 'ট্র্যাজিক' অভিধাযুক্ত বোধহয় হতে

পারে না। অনেক সময়ে মনে হয়, ট্র্যাজিকের আলোচনা প্রসঙ্গে আইয়ুব মাঝে-মাঝেই তাঁর আলোচ্য শিল্পকর্ম থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছেন। কখনো-বা ট্র্যাজিক চেতনা থেকে উদ্‌গত মৌল প্রশ্নটি তিনি নাটক বা কবিতার শরীর থেকে বিশ্লিষ্ট করে নেন বিস্তৃত আলোচনার জন্য। এরই সঙ্গে জড়িত রয়েছে আর-একটি সমস্যা। 'ট্র্যাজিক চেতনা' ছাড়া আইয়ুব আরো দুটি কথা ব্যবহার করেছেন তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে— 'ট্র্যাজিক উপলব্ধি' ও 'ট্র্যাজিক আনন্দ'। কথা-তিনটি কি সমার্থক? নাকি আইয়ুব যাদের ট্র্যাজিক উপলব্ধি ও ট্র্যাজিক আনন্দ বলছেন সেগুলি 'ট্র্যাজিক চেতনা'র পরবর্তী কোনো অভিজ্ঞতার স্তর? যদি দ্বিতীয় অর্থটি আইয়ুবের অভিপ্রেত হয়, তবে প্রশ্ন ওঠে ট্র্যাজিক চেতনা কি কোনো ক্রমোচ্চ সোপানের একটি পদক্ষেপ মাত্র?

'রাজা' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে আইয়ুব লিখেছিলেন, 'সুরঙ্গমার প্রতি রাজা নিষ্ঠুর হয়েছিলেন তাকে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পথ থেকে ফেরাবার জন্য। কিন্তু ঠাকুরদা তো নষ্ট হতে যাচ্ছিলেন না। একে-একে তাঁর পাঁচটি ছেলে কেড়ে নেওয়া তবে কেন? কিসের জন্য? তার কোনো উত্তর নেই। কী হেতু, হয়তো বলা যায়; কী উদ্দেশ্যে, বলা যায় না।' যেভাবে প্রশ্নটি আইয়ুব তুলছেন তাতে ট্র্যাজিক চেতনার তাৎপর্য হঠাৎ উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। বস্তুত যেসব প্রান্তিক অভিজ্ঞতার (boundary situations) পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন ওঠে সেখানে কোনো হেতু-নির্ভর ব্যাখ্যা তো নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। আসলে আমরা যা জানতে চাই তা হলো—জগৎ ও জীবনের অর্থ কী? প্রশ্নটি সাধারণভাবে উঠতে পারে, যেমন অস্তিত্ববাদী দর্শনে। আবার বিশেষ-কোনো প্রান্তিক অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেও উঠতে পারে, যেমন সাহিত্যে। অবশ্য প্রশ্নটির অভিঘাত সেখানেও সামান্য (general) ও সর্বব্যাপী। কিন্তু cosmic justice-এ আস্থাবান মানুষের মনে এ-প্রশ্ন জাগে না, জাগলেও তা চূড়ান্ত নয়; কারণ প্রশ্নটির উত্তর, ব্যক্তিবিশেষের মানসিক অস্থৈর্যের দরুন সাময়িক-ভাবে কষ্টলভ্য হলেও একেবারে অলভ্য নয়। মৃত্যু যেখানে জীবনের পরিণতিরূপে আসে সেখানে এই প্রশ্নের অবকাশ নেই। কিন্তু মৃত্যু যেখানে বিনাশ, সেখানে এই প্রশ্ন বারংবার উঠবে। লক্ষণীয়, যে-প্রশ্নটি আইয়ুব তুলছেন সেটি আইয়ুবেরই, অথবা আমাদের, কিন্তু ঠাকুরদার নয়। আসলে 'রাজা' নাটকটির কোথাও ঠাকুরদা এই অর্থে কোনো প্রশ্ন করেন না, কারণ প্রশ্নটি তাঁর কাছে বোধগম্য নয়। ঠাকুরদা অভিজ্ঞতার যে-স্তরে পৌঁচেছেন সেটি ট্র্যাজিক-উত্তীর্ণ কোনো উপলব্ধি, নাকি ট্র্যাজিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, সম্পর্ক রহিত, অন্য আর-একটি জীবনবোধ (sense of

life)? প্রাচীন হিব্রু কাহিনীতে বিপুল দুঃখের শেষে জোব যে-উপলব্ধিতে পৌঁচেছিলেন তা এই যে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পর্কে কোনো সংশয় প্রকাশ বা প্রশ্ন তোলার অধিকার মানুষের নেই। পরম বিশ্বাসী তার জাগতিক দুঃখের কোনো ব্যাখ্যা খোঁজে না, ব্যাখ্যার প্রয়োজনটাই তার কাছে অর্থহীন।

বলা বাহুল্য, জোবের উপলব্ধি কোনো দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই উপলব্ধি যুক্তির অতীত। অর্থাৎ, প্রশ্ন থেকে সমাধান—জোবের এই যাত্রাপথটি যুক্তিচিহ্নিত নয়। ডস্টয়েভস্কি ও কাফ্‌কার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাটি সম্পূর্ণ অন্যরকমের, প্রশ্নটাই সেখানে চূড়ান্ত, সমাধানের পথ অত্যন্ত অনিশ্চিত। অথবা বলা যায়, কোনো পরম বিশ্বাসের অভাবে আধুনিক ট্র্যাজিক চেতনায় প্রশ্নের সমাধান নেই। জগৎ ও জীবনের কোনো সার্বিক ব্যাখ্যা নেই। এই ব্যাখ্যাটাই খুঁজছে দিমিত্রি স্বপ্নের মধ্যে, *The Brothers Karamazov* উপন্যাসে একটি ক্রন্দনরত শিশুকে কেন্দ্র করে তার মনে প্রশ্ন জাগে, শিশুটি কাঁদছে কেন এবং কোনো উত্তরই তার প্রশ্নকে শান্ত করতে পারছে না। শিশুটির অসহায় অবস্থা, তার পারিবারিক বিপর্যয়ের কাহিনী—এইজাতীয় কোনো হেতুনির্ভর ব্যাখ্যাই দিমিত্রির কাছে যথেষ্ট নয়। 'And he felt that, though his questions were unreasonable and senseless, yet he wanted to ask just that; and he had to ask just in that way.'

কাফ্‌কার জগতেও কোথাও কোনো ব্যাখ্যা নেই, কোথাও কোনো সান্ত্বনা নেই। *The Trial* উপন্যাসের নায়ক একদিন (যে-কোনো একদিন) সকালে জানতে পারল সে অভিযুক্ত, কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ কী তা সে কোনোদিন জানতে পারল না। বিচারকের সন্ধান করে-করে শেষ হলো তার জীবন। মৃত্যু এল জীবনের পূর্ণতারূপে নয়, ছেদরূপে। বুদ্ধদেব বসু কোথাও বলেছিলেন যে কাফ্‌কার নায়ক অপেক্ষাব্রতী। কিন্তু কিসের জন্য তার প্রতীক্ষা? *The Castle* উপন্যাসেও তো শেষ পর্যন্ত অপরিসীম ব্যর্থতা। যে ভীষণ অনিশ্চয়তায় মধ্যে ঐ দুটি উপন্যাস শেষ হচ্ছে, তাতে তো মনে হয় কাফ্‌কার নায়কের জীবনব্যাপী প্রতীক্ষা এমন-কিছুর জন্য যা অসম্ভব অথবা যার অস্তিত্বই নেই। কোনো পরম বিশ্বাসের পথে নিষ্ক্রমণের প্রশ্ন কাফ্‌কার ক্ষেত্রে ওঠেই না। এই অর্থেই আধুনিক ট্র্যাজিক চেতনা, ঈশ্বর ভাবনার মতো, একটি চূড়ান্ত জীবনবোধ।

জীবন ও জগতের অর্থ সম্পর্কে মৌল জিজ্ঞাসা, এটা ট্র্যাজিক চেতনার একদিক। অন্যদিকে রয়েছে এই জিজ্ঞাসার ভীষণ পরিণাম—প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই, যে

বিপুল দুঃখের ভারে মানুষের জীবন মুহ্যমান শেষ পর্যন্ত তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। বিশেষ কোনো-একটি ঘটনার অর্থ যখন আমরা জানতে চাই, তখন অন্য আর-একটি অথবা একাধিক ব্যাপকতর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তা জানতে সচেষ্ট হতে পারি। এমন হতে পারে যে প্রশ্নটির উত্তর আমাদের জানা নেই, কিন্তু উত্তর যে আছে সেটা নিশ্চিত। অর্থাৎ প্রশ্নটির বৈধতা নিয়ে কোনো সংশয় উপস্থিত হতে পারে না, যদিও উত্তরের যাথার্থ্য নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কিন্তু প্রশ্নটি যখন সমস্ত জীবন ও জগতের অর্থ সম্পর্কিত, তখন কিসের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজব? জগৎ ও জীবনের চেয়ে ব্যাপকতর কোনো ঘটনার কথা আমরা ধারণা করতে পারি কি? হয়তো পারি, যদি বলি সবকিছুর অর্থ নিহিত আছে ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট বিশ্ববিধানে। কিন্তু আধুনিক ট্র্যাজিক চেতনায় ঈশ্বর অসম্ভব অথবা অস্তিত্বহীন এবং বিশ্ববিধান ধ্বংসপ্রাপ্ত। এবং ঈশ্বরবিশ্বাস যেহেতু ট্র্যাজিকের মতো একটি চূড়ান্ত জীবনবোধ, তাই এই উপলব্ধির কোনো বিকল্প অকল্পনীয়। বিজ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত কোনো থিয়োরি একদিন ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে পারে। ইতিহাসে এমন নজিরের অভাব নেই। পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক উক্ত থিয়োরিটি ভ্রান্ত বলে জানবেন, এটিকে নাকচ করে অন্য আর-একটির সন্ধান করবেন। কিন্তু ভ্রান্ত ও পরিত্যক্ত থিয়োরিটি তাঁর কাছে অবোধ্য হয়ে যাবে না। কিন্তু যে-হতভাগ্য ঈশ্বরের প্রতি আস্থা হারিয়েছে তার কাছে বিশ্বাসের বস্তুটি যে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে তা নয়, ঈশ্বর ধারণাটিই তার কাছে আর বোধগম্য নয়। কোনো বিকল্প ও সমগোত্রীয় বিশ্বাসের প্রশ্নও এখানে ওঠে না। সমস্যাটি একটি থিয়োরির পরিবর্তে আর একটি বিকল্প থিয়োরির অনুসন্ধান নয়। সমস্যাটি হলো সেই বিশেষ জীবনবোধের সার্বিক অর্থহীনতার।

প্রসঙ্গটি আরেকটু টানা যেতে পারে। উত্তরহীন প্রশ্ন—এই ধারণাটি ন্যায়শাস্ত্রে স্বীকৃত নয়। যদি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া না-যায়, তবে বুঝতে হবে প্রশ্নটি ঠিকমতো করা হয়নি অথবা প্রশ্নটি নিরর্থক। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের বাইরে, ডস্টয়েভস্কি অথবা কাফ্‌কার উপন্যাসে কিংবা রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কয়েকটি কবিতায় যখন আমরা কোনো অমোঘ ও উত্তরহীন প্রশ্নের সম্মুখীন হই, তখন তো একবারও মনে হয় না যে প্রশ্নটি অবৈধ অথবা নিরর্থক অথবা ঠিকমতো করা হয়নি। বরং প্রশ্নটি না-উঠলে ঐ-রচনাগুলি ট্র্যাজিক চেতনার প্রতিভূ হিসেবে গণ্যই হতো না। জীবনের অর্থ কী—জগতের অর্থ কী—এই প্রশ্নগুলি আমাদের চৈতন্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। উত্তর নেই জেনেও বোধসম্পন্ন মানুষ এ-প্রশ্ন করবেই; এটা তার অপরিহার্য নৈতিক অধিকার এবং কোনো দারুণ প্রান্তিক অভিজ্ঞতার সামনে এই প্রশ্ন অপ্রতিরোধ্য

হয়ে ওঠে। দিমিত্রি জানে যে তার প্রশ্নটি অর্থহীন, তবু এই প্রশ্নের হাত থেকে তার নিস্তার নেই এবং প্রশ্নটি অন্য কোনোভাবে করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনও হয়তো বলা যায় যে এ-প্রশ্ন তোলা না-হলে মানুষ জানতেই পারে না যে জীবন লজিকের সিদ্ধান্ত নয়, জীবন ও জগতের কোনো ব্যাখ্যা নেই। এটাই ট্র্যাজিক চেতনার প্যারাডক্স।

এই কথাটা আইয়ুবও বলেছেন একটু ভিন্ন সুরে ঠাকুরদা প্রসঙ্গে : 'কিসের জন্য —তার কোনো উত্তর নেই।' ঈশ্বরকে কোনো ব্যাখ্যাধর্মী মডেল হিসেবে কল্পনা করা আইয়ুবের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় আধুনিক ট্র্যাজিক চেতনায়। তবু একটা পার্থক্য রয়েছে এবং পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন যে ঠাকুরদা প্রসঙ্গে উত্থিত প্রশ্নের একটি উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন নাটকের কেন্দ্রস্থিত গানটির মধ্যে দিয়ে। গানটি হলো : 'হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে'। আইয়ুবের ভাষায়, 'সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, জন্ম-মৃত্যুর বর্ণযোজনা এক মহান আশ্চর্য সুষম চিত্র রচনা করেছে ঠাকুরদা ও তাঁর স্রষ্টার নান্দনিক দৃষ্টির সম্মুখে।' ধরে নিতে হবে উত্তরটি আইয়ুবেরও। কিন্তু কী বলতে চাইছেন আইয়ুব? স্পষ্টতই কোনো ব্যাখ্যামূলক উত্তর এটি নয়। যে-প্রশ্নটি তোলা হয়েছে, সেই প্রশ্নের সমাধান এই উত্তরের দ্বারা হয় না ; যদিও প্রশ্নকর্তার মানসিকতার আমূল পরিবর্তন এই উত্তরের দ্বারা হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ এমন-একটি অবস্থার জন্ম হতে পারে যখন কোনো প্রশ্নেরই অবকাশ থাকবে না।

শুধু 'রাজা' নাটক প্রসঙ্গে নয়, রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কিছু কবিতা—আইয়ুব যাদের ট্র্যাজিক চেতনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলে মনে করেন—প্রসঙ্গেও এই ধরনের কোনো উত্তরের কথা বলেছেন তিনি। "পথের শেষ কোথায়"-নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'বহির্জগতের অভিঘাতে রবীন্দ্র-মানসের তথা রবীন্দ্র-কাব্যের তিনটি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে : (১) আশায় উজ্জ্বল এবং মোটের উপর প্রসন্ন ; (২) আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান, আলো-আঁধারে ব্যাকুল, (৩) গভীর তিমিরে দিশাহারা হতাশায় ভেঙে-পড়া।' সন্দেহ নেই, এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত রেসপনসের ভিতরেই ট্র্যাজিক চেতনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। আইয়ুব উদাহরণ হিসেবে বেছে নিয়েছেন দুটি গান এবং প্রবন্ধের শেষাংশে উক্ত গানদুটির সঙ্গে ম্যাকবেথের অন্তিম স্বগতোক্তির তুলনা করে মন্তব্য করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অতখানি অসম্বদ্ধ তিক্ত জীবনদর্শনের সঙ্গে তাদাত্ম্য বোধ করা একেবারে অসম্ভব। তাঁর পথক্লান্তি যতোই দুর্বহ, বিষাদ যতই ঘন, নৈরাশ্য যতই মর্মান্তিক, নাস্তিক্য যতই বেদনার্ত হোক তাঁর ভাব ও অনুভব ছিল

অন্ত্য তারে বাঁধা, তুলনায় অনেকখানি কোমল মৃদুস্বরে উচ্চারিত।' মন্তব্যটি ইঙ্গিতবহ। ট্র্যাজিক চেতনার যে-পার্থক্য আইয়ুব রবীন্দ্রনাথ ও শেক্সপীয়ারের মধ্যে দেখছেন তা কি শুধুই নান্দনিক? নাকি, আইয়ুব বলতে চাইছেন যে, শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজিক চেতনা যতখানি সান্ত্বনাহীন, রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজিক উপলব্ধি ততখানি নয়? বিচারটা যদি নিছক নান্দনিক হয়, তবে প্রশ্ন ওঠে রবীন্দ্রনাথের গানে এই সুষমা (grace) এল কোথা থেকে? এই সুষমা কি তাঁর জীবনবোধ থেকে উৎসারিত হচ্ছে না? উদ্ধৃতিটির প্রথম বাক্যে আইয়ুব দুটি ভিন্ন জীবনদর্শনের কথা বললেন : দ্বিতীয় বাক্যে বলছেন দুটি ভিন্ন নান্দনিক আদর্শের কথা। অথবা দুটি উক্তিতে আসলে হয়তো কোনো তফাত নেই।

কথাটা বিশদ করে বলেছেন আইয়ুব কয়েক বছর আগে লেখা, "শুধু ধুলি, শুধু ছাই" নামক প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের বেশ কয়েকটি কবিতার আলোচনা-শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে ট্র্যাজিক চেতনার অকুণ্ঠ প্রকাশ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় নাস্তি-চেতনার ভীষণ পরিণাম আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন ট্র্যাজিক উপলব্ধিতে। তিনটি ভিন্ন উপলব্ধির কথা এই প্রবন্ধে বলছেন আইয়ুব। (১) 'ঋষিদের কথা জানি না, কিন্তু মানতে বাধা নেই যে এমন সীমাহীন দেশ-কালে সম্প্রসারিত দৃষ্টি ও তজ্জনিত প্রশান্তি—যাকে নান্দনিক দৃষ্টি ও আনন্দ বলা যায়—মহাকবির আয়ত্তগম্য হতে পারে।' (২) 'তবু আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ শেষ অবধি এই বিশ্বাসটিকে বহু কষ্টে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন যে নানা স্খলন, পতন, বিভ্রান্তি এমন-কি মাঝে-মাঝে পশ্চাৎগতি সত্ত্বেও মানবসত্তা চলেছে কোনো-এক পরিপূর্ণ সার্থকতার তীর্থের অভিমুখে…।' (৩) 'অমৃতভরা মুহূর্তগুলি অমৃত পায় কোথা থেকে? নারীপ্রেম, মানবপ্রেম, বন্ধুত্ব, শিল্পসম্ভোগ—যে-কোনো অমূল্য অভিজ্ঞতাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়।'

উদ্ধৃতি তিনটি এক জাতের নয়। ট্র্যাজিক প্রশ্নের উত্তর হিসেবে দ্বিতীয়টি কোনো ব্যাখ্যাধর্মী মডেলের বড়ো বেশি কাছাকাছি এবং ট্র্যাজিক চেতনার আলোচনায় এই বিশ্বাসের কোনো প্রাসঙ্গিকতা আমি খুঁজে পাই না। আইয়ুব নিজেও বলেছিলেন, 'অম্লান দত্ত লিখছেন "সব সাময়িক অধঃপতন সত্ত্বেও মানবযাত্রী এগিয়ে চলেছে মঙ্গলের দিকে। এ-বিশ্বাস ছাড়া আইয়ুব নাস্তিগহ্বর পার হয়ে জগৎকে আস্তিক্যের আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন না।" না বন্ধু, না। এ বিশ্বাস ছেড়েই আমি জগৎকে গ্রহণ করতে পেরেছি—তবে "আস্তিক্যের আনন্দে" নয়, একপ্রকার ট্র্যাজিক উপলব্ধিতে।' অনুমান করা যেতে পারে যে এই উপলব্ধির

সূত্র উল্লিখিত উদ্ধৃতিদ্বয়ের প্রথম ও শেষটিতে নিহিত আছে। উদ্ধৃতিদুটির কোথাও আইয়ুব ঈশ্বর অথবা বিশ্ববিধানের কথা বলেননি। কিন্তু মনে হয়, যে-উপলব্ধির কথা তিনি বললেন, কোনো-এক গূঢ় অর্থে সেটি ঈশ্বর-ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত—এমন-এক ঈশ্বর ব্যাখ্যা করার দায় যাঁর নেই, অথচ তিনি কাফ্‌কার ঈশ্বরের মতো অসম্ভব নন। অনন্তের সঙ্গে যুক্ত না-হলে 'নান্দনিক দৃষ্টি' অথবা 'অপূর্ব মুহূর্তে'র মূল্য থাকে না। কোনো কালাতীত পটভূমি থেকে জগৎ ও জীবনকে দেখতে পারলে কালচক্রে আবর্তিত মানুষের বিপুল দুঃখ সহ্য করা যায়। বস্তুত, আমাদের কালিক চেতনাকে আইয়ুব এক সীমাহীন দৈশিক চিত্রকল্পে (**spatial metaphor**) রূপান্তরিত করে দিচ্ছেন। এই রূপান্তরের ফলে কালের সংহারকে এড়ানো নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, কিন্তু সংহারের উদ্‌বেগ অন্তত এড়ানো সম্ভব। সিমোন ওয়াইল একেই বলেছেন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখা। এইভাবে দেখলে সুখ ও দুঃখের আর-কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, বিশ্বময় প্রাকৃতিক বিধান ও ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের মধ্যে ভেদ লুপ্ত হয়ে যায়। একজন আধুনিক দার্শনিক সিমোন ওয়াইলের সূত্রটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, '**...She (Simone Weil) seems to be saying that a certain sort of recognition of the impersonality of the order of nature is itself an acknowledgement that what happens in that order is the will of God.**'

আইয়ুবের বক্তব্য আমরা যেভাবেই বোঝার চেষ্টা করি-না কেন, একটা কথা পরিষ্কার যে, আধুনিক ট্র্যাজিক চেতনা কথাটি আমি যে-অর্থে ব্যবহার করেছি আইয়ুব তাকে কোনো চূড়ান্ত জীবনবোধ বলে স্বীকার করেন না। ট্র্যাজিকের পরেও আছে উপলব্ধির প্রশান্তি। কিন্তু শুধু এইটুকু বললে সমস্যার নিরসন হয় না। ট্র্যাজিক প্রশ্নের উত্তর হিসেবেই এই উপলব্ধি কতদূর সংগত—সে-প্রশ্ন তুলে অবশ্য কোনো লাভ নেই। কারণ আইয়ুব এই উপলব্ধিকে কোনো ব্যাখ্যাধর্মী দার্শনিক উত্তর হিসেবে উপস্থিত করছেন না। কিন্তু 'সুখ-দুঃখোত্তীর্ণ প্রশান্তি' ও ট্র্যাজিকের মধ্যে ঠিক সম্পর্কটি কী, সে-প্রশ্ন নিশ্চয়ই তোলা যেতে পারে। এ-বিষয়ে আইয়ুব কখনো বিশদ হননি। ট্র্যাজিক চেতনা কি প্রশান্তির আবশ্যিক শর্ত? অর্থাৎ ট্র্যাজিক চেতনা ছাড়া কি উপলব্ধির প্রশান্তিতে পৌঁছনো যায় না? নাকি ট্র্যাজিক চেতনা থেকে কোনো শিল্পী উপলব্ধির প্রশান্তিতে পৌঁছতেও পারেন আবার নাও পারেন? অথবা এই দুটি অভিজ্ঞতা পরস্পরের সঙ্গে একটা আবশ্যিক শর্তের সূত্রে

গ্রথিত, অর্থাৎ তুল্যমূল্য (equivalent)? কী বলতে চাইছেন আইয়ুব তা বোঝা শক্ত, কিন্তু কী বলতে চাইছেন না তা অনুমান করা যেতে পারে। তিনি বলতে চাইছেন না যে ট্র্যাজিক ও 'উপলব্ধির' প্রশান্তি—এ-দুটি সম্পর্করহিত, সম্পূর্ণ ভিন্ন ও চূড়ান্ত জীবনবোধ। এবং নিকট সন্নিবেশের ফলে ট্র্যাজিক সাহিত্যে প্রায়ই এই দুটি জীবনবোধ পরস্পরের সঙ্গে বিরোধের সম্পর্কে সম্পর্কিত। কাফ্‌কার উপন্যাসে ট্র্যাজিক চেতনার জন্ম তো এই বোধেই যে মানুষ অসহায়রূপে কালের পুতুল এবং কালাতীত কোনো প্রশান্তি তার আয়ত্তাধীন নয়।

কিন্তু ট্র্যাজিকের আলোচনায় আইয়ুব কাফ্‌কাকে বর্জন করেছেন, ডস্টয়েভস্কিকেও। এর কারণ নিশ্চয়ই এই নয় যে ডস্টয়েভস্কি ও কাফ্‌কা উপন্যাস লিখেছেন এবং আইয়ুবের আলোচ্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা। আমার অনুমান কারণটি আরো গভীরে নিহিত। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ করেছি যে আইয়ুব অ্যারিস্টটলের কাব্যতত্ত্ব ও গ্রীক ট্র্যাজেডের উল্লেখ সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। কারণটি স্পষ্ট। আইয়ুব ট্র্যাজেডির আলোচনায় আগ্রহী নন, তাঁর মনোযোগ ট্র্যাজিক চেতনায়। অ্যারিস্টটলের প্রাঞ্জল ও ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিধারার সূত্রে গ্রথিত বিশদ নান্দনিক বিন্যাস আধুনিক ট্র্যাজিক চেতনার পক্ষে একটু বেশি সরল। এবং গ্রীক ট্র্যাজেডির পেছনে যে নিশ্চিন্ত বিশ্ববিধানের অস্তিত্ব ছিল তার পুনরুদ্ধার আর সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, কাফ্‌কার ভীষণ, সান্ত্বনাহীন, অসম্বদ্ধ জগৎ আইয়ুবের কাছে গ্রাহ্য নয়। অথবা, ডস্টয়েভস্কির ভূতলবাসীদের অবিরাম প্রশ্ন দারুণ সংশয় ও পরিণামে হৃদয়হীন প্রাকৃতিক নিয়মের পাথুরে দেয়ালে মাথা কুটে মরাও হয়তো আইয়ুবের কাছে একটু বেশি তিক্ত মনে হবে। অবশ্য আইয়ুবের ট্র্যাজিক উপলব্ধি অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডিতত্ত্ব থেকে যতখানি দূরে আধুনিক ট্র্যাজিক চেতনা থেকে ততখানি নয়; তবু উভয়ের মধ্যে দূরত্ব অনতিক্রম্য।

এই প্রবন্ধের শুরুতে বলেছিলাম যে আইয়ুবের সাহিত্যতত্ত্বের একটি বিশেষ দিক আমার আলোচ্য। অর্থাৎ, এই সাহিত্যতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল্যায়ন আমার প্রসঙ্গ নয়। কথাটি আরেকটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। যে-প্রেমিসটি আমার বক্তব্যের পিছনে উহ্য রয়েছে তা এই যে, ট্র্যাজিক সম্বন্ধে আইয়ুবের ধারণা—রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কবিতা থেকে আহৃত হলেও—তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে একটি স্বাবলম্বী তত্ত্বের রূপ পেয়েছে। এই তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যেমন রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজিক কবিতার বিচার করতে পারি, তেমনি অন্য কোনো সাহিত্যিকের ট্র্যাজিক রচনার আলোচনাও করতে পারি।

দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্ব শিল্পরূপ (genre) নির্ভর নয়। এর প্রয়োগ আইয়ুব যেমন কবিতার ক্ষেত্রে করেছেন, তেমনি সাহিত্যের অন্য শিল্পরূপগুলির ক্ষেত্রেও করা সম্ভব।

আইয়ুবের এই বিশেষ ট্র্যাজিক ধারণাটি বোঝার চেষ্টা করেছি এই প্রবন্ধে। সেইসঙ্গে ট্র্যাজিক চেতনার আর-একটি আধুনিক মডেলের কথা (যদিও খুবই অসম্পূর্ণভাবে) বলার চেষ্টা করেছি প্রতিতুলনার জন্য। রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কোনো-কোনো কবিতায় আধুনিক ট্র্যাজিক চেতনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিনা, আমার আলোচ্য নয়; যদিও আমি মনে করি, অন্তত একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কাফ্‌কার অর্থে ট্র্যাজিক চেতনার মুখোমুখি হয়েছিলেন। 'প্রথম দিনের সূর্য' কবিতাটিতে কোথাও সান্ত্বনার চিহ্ন নেই, কোথাও উপলব্ধির প্রশান্তি নেই। অথচ এই ভীষণ প্রলয়কারী চেতনা আশ্চর্যভাবে সংহত মাত্র বারোটি লাইনের মধ্যে। এই সংহতি—সুষমা নয়—আমরা লক্ষ করি ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে; কাফ্‌কার রচনায়। এমন-কি আইয়ুব যাকে বলেছেন 'অসম্বদ্ধ', ম্যাকবেথের সেই অন্তিম স্বগতোক্তিতেও। কোথা থেকে আসে এই সংহতি (control), জানি না। প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক কিন্তু দুরূহ। এবং এই প্রশ্ন আলোচনা করার যোগ্যতা ও অধিকার যাঁর সবচেয়ে বেশি, তিনি আবু সয়ীদ আইয়ুব স্বয়ং।